প্রচ্ছদশিল্পী :
গণেশ বসু

প্রকাশক :
ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১
৯৪ সাউথ মালাকা, এলাহাবাদ-১
১১ ওক্‌ লেন, ফোর্ট, বোম্বাই-১

মুদ্রক :
মনোতোষ পোদ্দার
শশধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৩/১ হায়াৎ খাঁ লেন
কলকাতা-৯

কৈফিয়ত

লেত্তি-বাঁধা আল-ওয়ালা লাট্টু খেলার চল কবেই উঠে গেছে। লেত্তি জিনিসটা কী, জিগ্গেস করলে অনেকেই মাথা চুলকোবেন। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সীরা কেউ যদি এই বই পড়তে উৎসাহিত হন, সেই আশায় জানাই, নামটির উৎস হল শম্ভু মিত্র পরিচালিত 'একদিন রাত্রে' নামক একদা-বিখ্যাত চলচ্চিত্রের অন্তর্গত একটি গানের লাইন: *ঘুরিয়ে দুনিয়ার লাট্টু, ভগবান হারিয়েছে লেত্তি।* গেয়েছিলেন মান্না দে, লিখেছিলেন অমিত মৈত্র, সুর দিয়েছিলেন সলিল চৌধুরী। এই এতজন গুণীর ভরসায় এবং গাঙচিল-এর আশ্বাসে বইয়ের নাম রাখলাম 'ভগবানের লেত্তি: ঈশ্বর না-ঈশ্বর বিজ্ঞান সমাজ'। বইয়ের একটি প্রবন্ধে হারানো লেত্তির তাৎপর্য বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছিল, প্রধানত লিট্ল ম্যাগাজিনে। সেইসব পত্রিকার নাছোড়বান্দা সম্পাদকদের এই সুযোগে আর একবার সেলাম ঠুকি। প্রবন্ধগুলোকে কালানুক্রমে সাজানোর চেষ্টা করিনি, যতদূর সম্ভব বিষয়ের সাযুজ্য অনুযায়ী সাজানোর চেষ্টা করেছি। সাযুজ্য বলতে যা বোঝাতে চাইছি, তা মোটামুটি এই রকম: বিজ্ঞানের তত্ত্ব এবং পদ্ধতিতন্ত্র সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা না থাকলে মানবিকভাবে বাঁচা সম্ভব নয়। মানবিকভাবে বাঁচার পথে একটা প্রধান বাধা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম। অথচ বিজ্ঞান জানলেই যে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কবল থেকে রেহাই পাওয়া যাবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই; আমাদের দেশের অধিকাংশ বিজ্ঞান-জানা লোকই ধর্ম-কবলিত। তার মানে, ধর্ম-বিমুক্ত মানবিক জীবন যাপনের পথে বিজ্ঞান এক আবশ্যিক (নেসেসারি) শর্ত, কিন্তু যথেষ্ট (সাফিশিয়েন্ট) নয়। ধর্মের কবল থেকে রেহাই পাওয়াটা স্বতন্ত্র সংগ্রামের মুখাপেক্ষী। বিজ্ঞান জেনে, সচেতন প্রয়াসে ধর্ম থেকে মুক্ত হওয়ার পরেও থাকে হরেক নতুন-পুরনো কুসংস্কারের বন্ধনমোচনের

সমস্যা। আর তা থেকে পরিত্রাণের জন্য চাই সামাজিক সচেতনতা— যার সঙ্গে, বলাই বাহুল্য, ওতপ্রোত হয়ে থাকে বড়ো অর্থে রাজনীতি, অর্থাৎ শ্রেণি-রাজনীতি। এই বইতে বিজ্ঞান-দর্শন-ধর্ম-সমাজ-রাজনীতি এই পাঁচটা স্তরে সাধ্যমতো বিচরণের প্রয়াস পেয়েছি।

তাই আইজ্যাক নিউটন কিংবা ভগৎ সিংহ, টম পেইন কিংবা রাজশেখর বসু, লেনিন কিংবা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জর্জ বার্কলি কিংবা সুব্রমনিয়ান চন্দ্রশেখর, পিটার মেডাওয়ার কিংবা অক্ষয়কুমার দত্ত একই বইতে নানান উপলক্ষে উঠে এসেছেন বারে বারে।

প্রবীন বিজ্ঞান-সাংবাদিক যুগলকান্তি রায় তাঁর অসুস্থতা অগ্রাহ্য করে সাগ্রহে এ বইয়ের পাণ্ডুলিপি পড়ে মত জানিয়েছেন। যুগলদাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোটো করব না। এ বইতে প্রকাশিত কোনো মতামতের জন্য তাঁকে দায়ীও করব না।

সদাহাস্য দায়িত্ববোধের প্রতীক, 'বই-চিত্র' প্রতিষ্ঠানের কর্ম-সঞ্চালক, সুমন্ত বিশ্বাসের প্রতি এই সুযোগে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখি।

সূচি

তিমিরদুয়ার খোলো

বিজ্ঞানের দর্শন নিয়ে আগ্রহ বেশ বেড়েছে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে। তার আগে বিজ্ঞানের দর্শনে আলোচিত প্রশ্নগুলি চর্চিত হত না তা নয়, কিন্তু তা ছিল সাধারণভাবে দর্শনচর্চারই অঙ্গীভূত, স্বতন্ত্র কোনো বিষয় নয়। মোটের ওপর দুটো প্রশ্ন বিজ্ঞানের দর্শনের বিবেচ্য। এক: কোনো কিছু, সমস্ত কিছুই, আদৌ আছে কেন? এটারই গালভরা নাম হল ontology—সত্তাতত্ত্ব। দু নম্বর প্রশ্নটি হল: জ্ঞানতত্ত্ব, যার গালভরা সুপরিচিত নামটি হল epistemology। কোনো একটা বৈজ্ঞানিক ধারণা কখন এবং কেন 'জ্ঞান' হয়ে ওঠে?— এটাই বিজ্ঞানের জ্ঞানতত্ত্বের মূল আলোচ্য। এরই সঙ্গে জড়িত পদ্ধতিতন্ত্র (methodology)-র প্রসঙ্গ: কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অর্জিত জ্ঞান মান্যতা পায়? বলা বাহুল্য, এরই মধ্যে আবার নিহিত থাকে সেই মোক্ষম প্রশ্ন, যা নিয়ে বিশ শতক আলোড়িত ছিল— বিজ্ঞান মানুষের অন্যান্য চর্চার ক্ষেত্র থেকে কীসে এবং কেন আলাদা।

মানুষ যখন থেকে প্রকৃতির নিয়মগুলোকে জেনে নিয়ে তার জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দ করতে চেয়েছে, তখন থেকেই একটা প্রশ্ন তাকে আন্দোলিত করে এসেছে— জেনে অথবা না-জেনে। সে প্রশ্নটা হল: কী জানছি এবং কে জানছে। পারিভাষিক অর্থে এরই নাম বিষয় (object) আর বিষয়ীর (subject) দ্বন্দ্ব। খুব সাদামাটাভাবে দেখলে দ্বন্দ্বটা এইরকম: আমি একটি মানুষ, আমার ইন্দ্রিয় আর মন দিয়ে বিশ্বসংসার সম্বন্ধে জানছি। অর্থাৎ বিশ্বসংসার আমার বিষয়, আর আমি বিষয়ী। বিশ্বসংসার অতি বৃহৎ এবং জটিল ব্যাপার। আর আমি ক্ষুদ্র মনুষ্য। এই এত বড়ো ব্যাপার সম্বন্ধে কী-ই বা আমি জানতে পারি? আর যেটুকু-বা জানতে পারি, সেটা ঠিক জানছি কি না, বুঝব কী করে?

অথচ দেখা যায়, আমরা অনেক কিছুই ঠিকঠাক জানতে পারি। পারি বলেই আমরা শুধু টিকে না থেকে, দুনিয়াকে বদলাতেও পারি। প্রকৃতির যে নিয়ম চারশো বছর আগে আমরা জানতে পেরেছি, তা আজও আমরা কাজে লাগিয়ে চলি। এক ব্যক্তির আবিষ্কৃত তত্ত্ব অন্য হাজার হাজার লোক বাস্তবে প্রয়োগ করে চলে এবং ঈপ্সিত ফলও পায়। তার থেকে বোঝা যায়, বিষয়ী (subject) আর বিষয়ের (object) মধ্যে একটা সত্য সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আছে। নইলে তো নিউটনের আবিষ্কৃত তত্ত্ব নিউটন ছাড়া আর কারোই বোধগম্য হত না, তা বাস্তবকে বদলানোর কাজেও লাগত না।

এই জায়গাটাতেই নানারকম দ্বন্দ্ব বাধে। যাঁরা ভাববাদী, তাঁরা মনে করেন, একটা বিশুদ্ধ এবং পরম কোনো সত্তা আগে থেকেই আছে; বস্তু বা বাস্তবজগতের যেসব পরিবর্তনমালা আমরা দেখি সেগুলি সেই পরম সত্তার (ব্রহ্ম,/Idea) বিকৃত, মায়াভরা রূপ। আরো এক ধাপ এগিয়ে অনেকে বলেন, তোমরা যে কিছু কিছু জিনিস জানতে পারছ, সেটা ঐ পরম সত্তারই প্রসাদে। তিনি আত্মা বা ওইরকম কোনো অধরা একটা মাধ্যমের মারফত তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। সেই যোগাযোগ না থাকলে কোনো কিছুই তোমরা জানতে পারতে না। অর্থাৎ বিষয় আর বিষয়ীর মাঝখানে মধ্যস্থতা করে কোনো একটা মাধ্যম। সে-ই জানিয়ে দেয়— যতটুকু তার ইচ্ছে, ততটুকুই।

এর পরের ধাপেই এসে যায় সেই বহু-আলোচিত প্রশ্ন: তা হলে এত কাণ্ড করে লাভ কী? খুচরো খুচরো করে না জেনে, একেবারে আসল জিনিসটাকে, অর্থাৎ পরম ভাবকে, ব্রহ্মকে জানতে পারলেই তো বাকি সব আপনিই জানা হয়ে যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বা শ্রীঅরবিন্দের এই মত। ভক্তিসাধনাতেই হোক আর যোগবলেই হোক, ব্যক্তিমানুষ নিজেকে এমন এক স্তরে উত্তীর্ণ করতে পারে যেখানে পরম ব্রহ্মের সঙ্গে, অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টির মূলে যা আছে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ সম্ভব

হবে। সেটা হলে'পর, যাকে আমরা প্রকৃতি বলি তার সমস্ত নিয়মাবলি আমার নখাগ্রে এসে যাবে। শুধু তাই নয়, সেই সব নিয়ম প্রয়োগ করে আমি আমার সাক্ষাৎ পরিপার্শ্বে, এমনকী সমাজে ঈপ্সিত পরিবর্তন আনতে পারব, মানুষের চরিত্রকে আমূল বদলে দিতে পারব। শ্রীঅরবিন্দ পন্ডিচেরিতে এই সাধনা করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্য ব্রহ্মকে জানার কথাই বলেছিলেন, সেই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মানুষের অবস্থা বদলানোর কথা বলেননি। কিন্তু তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ আবার ঠিক সেটাই করবার কথা বলেছিলেন। একেবারে হালে মাদার টেরিজ়াকে সন্ত টেরিজ়ায় উত্তীর্ণ করার প্রয়াসের মধ্যেও এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। টেরিজ়াকে Saint বলার কথা ভাবা হল এই কারণে যে, তিনি বা তাঁর নাম-মাহাত্ম্যযুক্ত তাবিজ, কোনো এক পরম সত্তার শক্তিতে আবিষ্ট হয়ে এমন রোগ সারিয়েছেন যাকে বিজ্ঞান সারাতে পারেনি। অর্থাৎ, ডাক্তাররা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতন্ত্র অনুসারে যে-জ্ঞান আহরণ করেছেন তা ভুল, অন্তত অসম্পূর্ণ। পক্ষান্তরে, পরম সত্তা তাঁর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মারফত যে-জ্ঞানের উদ্ভাস ঘটান তা ঠিক, তা-ই সত্য। সেই সত্যের প্রকাশ ঘটে বাস্তব পরিবর্তনের মাধ্যমে, এ ক্ষেত্রে মনিকা বেস্‌রা-র টিউমার সারিয়ে। যিশু খ্রিস্টর মধ্যেও অনুরূপ দিব্য জ্ঞানের প্রকাশ ঘটেছিল, তাই তিনি হাত দিয়ে স্পর্শ করা মাত্র কুষ্ঠরোগী সুস্থ হয়ে গিয়েছিল।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, যাঁরা খুচরো খুচরো খণ্ডজ্ঞানের বদলে একেবারে পরম জ্ঞানকে আয়ত্ত করতে চেয়েছেন তাঁদের মধ্যেও অনেকেই (অবশ্যই সবাই নয়) সমাজের বা পারিপার্শ্বিক বাস্তবতাকে বদলানোর কাজে সেই জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ বাস্তবতাকে বদলে ফেলা জ্ঞানের একটা কাজ— এ বক্তব্য তাঁরা স্বীকার করেন।

জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্ক্স উনিশ শতকে বোধ হয় এই কথাটাকেই কবিতার মতো করে গেঁথে বলেছিলেন, 'দার্শনিকরা এতকাল বিশ্বকে কেবল ব্যাখ্যাই করে এসেছেন; আসলে যা দরকার তা হল বিশ্বকে বদলানো।'

কিন্তু 'এতকাল' কেন? এমন কী ঘটল যাতে 'এতকাল'-এর চলতি ধারাকে বদলে নেওয়ার কথা উঠল? যা ঘটল তারই নাম আধুনিক বিজ্ঞান। 'এতদিনে' তা দর্শনের সঙ্গে নাড়ির বাঁধন কাটিয়ে স্বতন্ত্র একটা বিষয় হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করল (যদিও স্বাভাবিকভাবেই তার নাভিতে দর্শন-মাতৃকতার চিহ্ন রয়ে গেল)। সতেরো শতক থেকে বিজ্ঞান নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখল। অনেকে ওটাকে 'বৈজ্ঞানিক বিপ্লব' বলে অভিহিত করেন। মার্ক্সের সঙ্গে রাসেলের আর কোনো জায়গাতেই মিল না থাকলেও ওই একটা জায়গায় ওঁরা একমত: 'Almost everything that distinguishes the modern world from earlier centuries is

attributable to science, which achieved its most spectacular triumphs in the seventeenth century.' (যা কিছু আধুনিক জগৎকে পূর্ববর্তী শতকগুলির থেকে আলাদা করে দিয়েছে তার প্রায় সমস্তটারই মূলে আছে বিজ্ঞান, যা দর্শনীয় বিজয় অর্জন করে সতেরো শতকে।)[১]

সতেরো শতক থেকেই আধুনিক বিজ্ঞান তার স্বাতন্ত্র্যের অকাট্য প্রমাণ হাজির করতে লাগল। এই আধুনিক, বিশ্বজনীন বিজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্যলক্ষণগুলি কী, তা নিয়ে পণ্ডিতেরা প্রচুর বাক্‌বিতণ্ডা করেও মতৈক্যে পৌঁছতে পারেননি। এখানে আমরা জোসেফ নীড্‌হ্যামের দেওয়া একটি সংজ্ঞাকে ধরে নিয়ে কাজ চালাতে পারি: the testing by systematic experiment of mathematical hypotheses about natural phenomena (প্রণালীবদ্ধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে প্রাকৃতিক ঘটনাবলি সংক্রান্ত বিভিন্ন গাণিতিক তত্ত্বপ্রস্তাবের সত্যাসত্য বিচার করা)।

এই যে কথাটা নীড্‌হ্যাম বেশ গুছিয়ে বললেন, এটা ষোলো-সতেরো শতকে বলা সম্ভবই ছিল না। কেননা বিজ্ঞান তখনো দর্শনের সঙ্গে তার নাড়ির বাঁধন কাটানোর সংগ্রামে লিপ্ত।

বেকন ও দেকার্ত

ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬) আর রনে দেকার্ত (René Descartes, ১৫৯৬-১৬৫০) সেই লড়াইয়ের দুই পুরোধা পুরুষ। দুজনের পদ্ধতি আলাদা, কিন্তু লক্ষ্য ছিল এক। কী করলে আহরিত জ্ঞানকে একটা শক্তপোক্ত ভিত্তির ওপর স্থাপন করা যায়; কী করলে তা এলোমেলো, নিয়মহারা দূরকল্পনার সাপেক্ষে নিজের নিশ্ছিদ্র স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে; কী করলে অন্ধ কুসংস্কার কিংবা অমূলক কল্পনার বিপরীতে তা অকাট্য এবং অবশ্যগ্রাহ্য বলে প্রমাণিত হবে।

দেকার্তের কালজয়ী গ্রন্থ *পদ্ধতি বিষয়ক আলোচনা* (ফরাসি থেকে অনুবাদ: লোকনাথ ভট্টাচার্য) থেকে একটুখানি উদ্ধৃতি দিলে আপ্তবাদী দর্শনের আওতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিজ্ঞানের এই লড়াইয়ের মূল সুরটি চেনা যাবে। দেকার্ত বলছেন:

> যখন দেখি বহু শতাব্দী ধরে অসাধারণ চিন্তাবিদ্‌দের চর্চা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত (১৬৩৭) দর্শন কোনো বিষয়েই বিতর্কের অবকাশ তুলতে পারল না, অর্থাৎ দর্শনে এমন কিছুই নেই যার অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ করা চলে, তখন সে ক্ষেত্রেও কোনো সাফল্যের আশা করার মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার থাকে না। শুধু তাই নয়, যখন

> দেখি একই বিষয়ে কত মুনির কত মত, যদিও তার একটিও কখনো সত্য নয়, তখন যা কিছু সত্যবৎ প্রতীয়মান হয় মাত্র, তাকে প্রায় মিথ্যাই বলতে হবে আমাকে।[২]

বেশ চমকে দেওয়ার মতো কথা বললেন দেকার্ত। এতদিন ধরে অপ্রমাণিত কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ বলে পরিগণিত কিছু ধারণার ভিত্তিতে কাজ করে আসছিল দর্শন। ফলে, এক একটি বিষয় নিয়ে 'মঞ্চ জুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ' রচিত হলেও সত্যিকারের কোনো বিতর্ক তুলতে পারেনি দর্শন, বিশেষত খ্রিস্টিয় ধর্মতত্ত্ব প্রভাবিত মধ্যযুগের ইউরোপিয় দর্শন। সংশয় বা সন্দেহের প্রবেশ যেখানে নিষেধ, সেখানে প্রকৃত বিতর্ক উঠবে কী করে?

দেকার্ত আরো বলেন—

> অন্যান্য বিজ্ঞানগুলি যেহেতু দর্শন থেকেই তাদের তত্ত্বসমূহ আহরণ করেছে, এত দুর্বল ভিত্তি দিয়ে মজবুত কিছু খাড়া করা তাদের পক্ষেও তাই সম্ভব নয় বলে মনে করি।...
> তাই... শপথ নিলাম একমাত্র সেই বিজ্ঞানের পিছনে ছুটব এবার যার হদিস মিলতে পারে অন্যত্র নয়, আমার নিজেরই মধ্যে বা পৃথিবী নামক বৃহৎ বিরাট গ্রন্থে...[৩]

মানুষ সমেত যে কোনো প্রাণীকেই দেকার্ত নিছক মেশিন মনে করতেন। এই নির্ভেজাল যান্ত্রিক মানুষ ভৌতবিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র অনুসারে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করে। তাই বলে তিনি ঈশ্বর বা বিশ্ব-আত্মা উড়িয়ে দিলেন না। বরং এই কথাই বললেন যে, মানুষের দেহের মধ্যেই এক চেতন শক্তি বা ইচ্ছাশক্তি বিরাজ করে। মানুষের খুলির ওপরে pineal body বলে যে গ্রন্থি আছে, তারই মাধ্যমে নাকি এই বিশ্ব-আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তাঁর যুক্তি এই যে ওই গ্রন্থিটি অন্য কোনো কাজ করে না। (আজ আমরা জানি, ওই pineal body আমাদের সরীসৃপ জাতীয় পূর্বপুরুষদের অধুনা-নিষ্ক্রিয় চক্ষুর থেকে-যাওয়া চিহ্ন। অতএব দেকার্তের ওই অনুমানটি নিশ্চিতভাবেই ভুল।)

দেকার্ত আমাদের দৃষ্ট এই ব্রহ্মাণ্ডটিকে দুটি ভাগে ভাগ করলেন। এক ভাগে রাখলেন বস্তুগঠিত জগৎকে, অন্য ভাগে রাখলেন অনুভূতির জগৎকে। ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাকে তিনি বলবিজ্ঞান ও জ্যামিতির আওতায় নিয়ে এলেন। আর আবেগ, ইচ্ছাশক্তি, প্রেম এবং ভক্তির অঙ্গনটিকে 'দিব্যজ্ঞান'-এর আওতায় ফেললেন। এই যে দুটি স্বতন্ত্র বিভাগ এত স্পষ্টভাবে করে দিলেন তিনি, এরই ফলে আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা নির্বিঘ্নে ধর্মের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে কাজ চালিয়ে যেতে পারছেন। তবে এই

'দ্বৈতবাদ' নানারকম সমস্যারও সৃষ্টি করে, বলাই বাহুল্য। তবু, ওই সময়ে এই কাজটি না করলে চার্চের দৌরাত্ম্য থেকে বিজ্ঞান রেহাই পেত না, এটা নিশ্চিত। গ্যালিলিওর দশা তো তিনি নিজেই দেখে গিয়েছিলেন।

আর বেকন? ইংরেজ-সুলভ কেজো মনোভাব নিয়ে তিনি সমস্যাটার টুঁটি চেপে ধরলেন। *Novum Organum* (যে-বইটিকে ক্লাসে পাঠ্য করার জন্য লড়াই করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর) বইয়ের প্রথম বাক্যটিতেই তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

> কোনো কোনো ব্যক্তি প্রকৃতির নিয়ম এমনভাবে রচনা করেন যেন তা নিয়ে আগে অনেক অনুসন্ধান করা হয়েছে, যেন সে বিষয়ে ধারণা যথেষ্ট স্পষ্ট, ... তাঁরা দর্শনের এবং বিজ্ঞানসমূহের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছেন। কেননা, বিশ্বাস উৎপাদনে সাফল্য অর্জন করে তাঁরা অন্বেষণকে পরিতৃপ্ত ও নিরস্ত করেছেন।

আর এক দল আছেন, যাঁদের মন্ত্র হল: জানার কোনো শেষ নাই, জানার চেষ্টা বৃথা তাই। এঁদের সম্বন্ধে বেকনের অভিযোগ: এঁরা সঠিক সূত্রের ভিত্তি থেকে যুক্তি গঠন করেননি, সঠিক সিদ্ধান্তেও অবিচল থাকতে পারেননি। উদ্দীপনা আর আবেগই এঁদের টেনে নিয়ে গেছে অনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। তিনি বললেন, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ব্যাপারটা নিছক মানসিক ব্যায়াম নয়, শুধুই যুক্তির কসরত নয়। মাটিতে নেমে দু হাতে মাটি না চটকালে কখনোই মাটির মধ্যে সত্যি সত্যি কী আছে সেটা জানা সম্ভব নয়।

বেকনের সঙ্গে দেকার্তের চিন্তাভাবনার ফারাক বিস্তর। গণিত-ভিত্তিক দর্শন, যাতে দেকার্ত ছিলেন বিশেষজ্ঞ, সে বিষয়ে বেকনের আগ্রহ ছিল না। তাঁর আগ্রহের ক্ষেত্রটি ছিল প্রকৃতি বিষয়ক বিজ্ঞান। প্রাচীন দার্শনিকরা কোন কোন কারণে ভ্রান্তির বিচিত্র ছলনাজালে (যার নাম দিয়েছিলেন তিনি 'Idols') জড়িয়ে পড়েছিলেন, তা বিশ্লেষণ করেন তিনি এবং তার একটি তালিকাও উপস্থিত করেন। তিনি মনে করতেন, ওই ভ্রান্তির ছলনাজাল থেকে মুক্ত হয়ে সুশৃঙ্খলভাবে ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাগুলিকে সাজাতে পারলেই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে। সংগৃহীত তথ্য থেকে বিমূর্তীকরণের মারফত, এবং বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে সরলীকরণের মারফত তত্ত্বে উপনীত হওয়ার ব্যাপারটি তিনি সম্যক উপলব্ধি করতে পারেননি, যদিও গ্যালিলিও ইতিমধ্যেই ওই প্রণালীর অসাধারণ প্রয়োগের নমুনা হাজির করেছিলেন। বেকনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সুসংগঠিত এবং উপযুক্ত সরঞ্জামে সজ্জিত একদল গবেষকের গবেষণা থেকে যেসব তথ্য জানা যাবে, তারই সাহায্যে অবশেষে সত্যে পৌঁছনো সম্ভব হবে। এক কথায়, তিনি মূলত আরোহী (inductive) পদ্ধতিতে

বিশ্বাস করতেন। অপর দিকে, দেকার্ত বিশ্বাস করতেন অবরোহী (deductive) প্রণালীতে। তাঁর মতে, চিন্তাভাবনার ভিত যদি পরিচ্ছন্ন থাকে, তবে যা কিছু বাস্তবে জানা সম্ভব সে সমস্তই জানা যাবে। তার জন্য প্রতি পদে পরীক্ষানিরীক্ষার আশ্রয় নেওয়ার ওপর তিনি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব দিয়েছেন। সুতরাং বলা যেতেই পারে যে বেকন আর দেকার্ত ছিলেন পরস্পরের পরিপূরক। এঁদের দুজনের হাতেই আধুনিক বিজ্ঞানদর্শনের সূত্রপাত ঘটে।

নিউটনের বিশ্বমেশিন

এই সমস্ত তর্কবিতর্কের একটা সাময়িক নিরসন যেন ঘটল নিউটনের (১৬৪২-১৭২৭) কাজের মধ্যে। অনেকে দাবি করলেন, নিউটনের কর্মপদ্ধতি ও যুক্তিপ্রণালী বেকনের চিন্তাধারাকেই সঠিক বলে প্রমাণ করল। অর্থাৎ বিনা-তথ্যে কোনো রকম তত্ত্বের আমদানি করা চলবে না। পর্যবেক্ষণ-লব্ধ তথ্যের মধ্যে থেকেই তত্ত্বের উদয় হবে। পরবর্তিকালে অবশ্য প্রমাণ হয়েছে, নিউটন যে-প্রণালীতে তাঁর তত্ত্ব প্রণয়ন করেছেন, তার মধ্যে বেকনীয় আর দেকার্তীয় উভয় ধারার সমন্বয় ঘটেছে। নিউটনের অনুসৃত এই প্রণালীর নাম দেওয়া হল hypothetico-deductive পদ্ধতি। কী এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আগে— বা, বলা যাক উত্তর পাওয়ার জন্য— নিউটনের অমরকীর্তি 'প্রিন্সিপিয়া' রচনার ইতিহাসটা সংক্ষেপে একবার জেনে নেব।

প্রিন্সিপিয়ার ইতিবৃত্ত

হ্যালির ধূমকেতু-খ্যাত এডমন্ড হ্যালি (১৬৫৬-১৭৪২) জ্যোতিষ্কদের চলাফেরার সূত্র নিয়ে চর্চা করতেন। কেন্দ্রাভিগ (centripetal) বলের সঙ্গে কেপলারের তৃতীয় সূত্রের সম্পর্ক নিয়ে তখন, অর্থাৎ ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে অনেকেই [কেপলারের তৃতীয় সূত্র: যে-কোনো গ্রহবর্ষের বর্গ আর ওই গ্রহ থেকে সূর্যের গড় দূরত্বের ঘনমানের (cube) অনুপাত গ্রহ নির্বিশেষে একই] ভাবনাচিন্তা করেছিলেন। নিউটন তো বটেই, তা ছাড়াও ছিলেন রবার্ট হুক (১৬৩৫-১৭০৩) যাঁর সঙ্গে নিউটনের সম্পর্ক ছিল আদায়-কাঁচকলায়। এ ছাড়াও ছিলেন ক্রিস্টোফার রেন। ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে হ্যালি, রেন আর হুক রয়্যাল সোসাইটির সভায় এই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করেন। হুক সেখানে দাবি করেন, বর্গের বিপরীত অনুপাতের নিয়ম (inverse square law) অনুসারে জ্যোতিষ্কদের চলন কেমন হওয়া উচিত সে প্রশ্নের উত্তর তাঁর জানা হয়ে গেছে, তিনি তার প্রমাণও দিতে পারেন। হ্যালি বলেন, তিনিও সে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সফল হননি। হুক আবারও বলেন, ওই প্রশ্নের সমাধান তিনি করে ফেলেছেন, কিন্তু (কী বিচিত্র মানুষের চরিত্র!) যতক্ষণ না বাকি সবাই আপন আপন ব্যর্থতার কথা কবুল করছে, ততক্ষণ তিনি সেটা গোপন রাখবেন। এই ঘটনা জানুয়ারি ১৬৮৪-র।

এর সাত মাস পরে হ্যালি কেমব্রিজে নিউটনের সঙ্গে দেখা করতে যান। মনে মনে তিনি হয়তো জানতেন, নিউটন এ-প্রশ্নের সমাধান করেই রেখেছেন। তাঁর আশা সত্য বলে প্রমাণিত হয়। সূর্যের অভিমুখী কেন্দ্রাভিগ বল যদি সূর্য থেকে গ্রহের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক হয়, তা হলে একটি গ্রহের কক্ষপথের জ্যামিতিক আকৃতি কী হবে?— এ প্রশ্ন করা মাত্রই নিউটন উত্তর দেন, কেন, উপবৃত্ত হবে। আনন্দবিহ্বল হ্যালি জিজ্ঞেস করেন, নিউটন কী করে এটা জানলেন। নিউটন বলেন, আমি তো অঙ্কটা অনেক আগেই কষে রেখেছি। হ্যালি তৎক্ষণাৎ বলেন, তা হলে সেটা আমায় দিন, আমি রয়্যাল সোসাইটি থেকে ছাপব। নিউটন রাজি হন। কিন্তু তারপর তিনি বললেন, ওই সংক্রান্ত কাগজপত্র তিনি হারিয়ে ফেলেছেন।

এই হারিয়ে ফেলার গল্পটা একেবারেই বানানো। আসলে নিউটন যখন তাঁর পুরনো পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করেন, তখন দেখতে পান, তাঁর দেওয়া জ্যামিতিক ও গাণিতিক প্রমাণ যথেষ্ট জোরালো ও নিখুঁত নয়। তখন তিনি নতুন করে অঙ্কটা কষতে থাকেন। ১৬৮৪ সালের নভেম্বরে একটি ন-পাতার পাণ্ডুলিপি হ্যালির কাছে পৌঁছয়। এটির নাম *De motu corporum in gyrum* (কক্ষপথে বস্তুসমূহের চলন প্রসঙ্গে)।

পূর্ণতার সাধনা

ন-পাতার ওই ছোট্ট বইটি লিখতে লিখতেই কিন্তু নিউটনের মনের মধ্যে অপ্রতিরোধ্য কিছু প্রশ্ন জেগে ওঠে। হ্যালির প্রশ্নের উত্তর তিনি ওই বইতে ঠিকভাবে দিলেও, ওই উত্তরই তাঁর মধ্যে অন্য অনেক প্রশ্ন জাগিয়ে তুলল। রয়্যাল অবজার্ভেটরি-র প্রথম অধিকর্তা ফ্ল্যাম্‌স্টীড-কে একটি চিঠিতে তিনি লিখলেন, ব্যাপারটার একেবারে শেষ পর্যন্ত দেখে তবে আমার নিষ্কৃতি। আর তার জন্য চাই তথ্য— পরীক্ষালব্ধ, অকাট্য তথ্য। ফ্ল্যাম্‌স্টীডের কাছ থেকে তিনি বৃহস্পতির উপগ্রহগুলির পরিক্রমকাল (period) সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া তথ্যগুলি জানতে চাইলেন। দেখলেন, তাঁর ব্যাখ্যার সঙ্গে ওই তথ্য মিলে গেল। কয়েকদিন পরে আবার পার্সিয়ুস তারকাপুঞ্জের দুটি তারার সুনির্দিষ্ট স্থানাঙ্ক চেয়ে পাঠালেন। ফ্ল্যাম্‌স্টীড বুঝলেন, নিউটন ১৬৮০-৮১ সালের ধূমকেতুর যাত্রাপথটিকে তাঁর ভাবনার আলোকে যাচিয়ে নিচ্ছেন। তত্ত্বপ্রস্তাবকে বাস্তবে পরীক্ষিত তথ্যের আলোয় বাজিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়াটাই এখানে লক্ষণীয়। আসলে নিউটন যে-প্রশ্নের উত্তর চাইছিলেন, সেটা আরো অনেক, অনেক বড়ো প্রশ্ন। কেপ্‌লারের তৃতীয় সূত্রের খেই ধরে গ্রহদের উপবৃত্তকার কক্ষপথের কথা ইতিমধ্যেই তিনি জেনে গিয়েছিলেন, তার যথাযথ প্রমাণও দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এবার তিনি যে-প্রশ্নটা তুললেন তা এই: বৃহস্পতির সঙ্গে যতবারই শনির conjunction হয়, ততবারই শনি প্রথমে তার কক্ষপথে ধীরগতি হয়ে পড়ে; তারপর বৃহস্পতি তার conjunction পার হয়ে গেলে আবার তার গতিবেগ বেড়ে যায়। তাঁর মতে, এ থেকে বোঝা যায়, এদের মধ্যে একটা পারস্পরিক বিশ্বজনীন আকর্ষণের ক্রিয়া চলে। এই তাত্ত্বিক অনুমানটি কিন্তু ফ্ল্যাম্‌স্টীডের মনঃপূত হল না। তবু নিউটনের চাহিদা মতো তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণ-লব্ধ তথ্যাদি জানিয়ে দিলেন। এখানে দেখতে পাচ্ছি, নিউটন তথ্য থেকে নতুন কোনো তত্ত্বে পৌঁছবার চেষ্টা করছেন সম্ভাব্য তত্ত্বপ্রস্তাব গঠন করে। ইতিমধ্যে নিউটন রয়্যাল সোসাইটিকে জানিয়েছেন, *De Motu* যেন এখুনি ছাপা না হয়, কেননা তিনি 'কিছু' সংযোজন করতে চান।

ফ্ল্যাম্‌স্টীডের কাছে আবার একটা জিনিস জানতে চাইলেন নিউটন। সেটা হল, টেমস্‌ নদীর এক শাখানদীতে জোয়ারভাটা সংক্রান্ত বিশেষ কিছু পর্যবেক্ষণের ফলাফল। এখানে একটু থেমে নিউটনের কর্মপ্রক্রিয়াটা বুঝে নিই। কেপ্‌লারের সূত্র (যা নিখাদ বেকনীয় পদ্ধতিতে সঙ্কলিত টাইকো ব্রাহের পর্যবেক্ষণ-লব্ধ তথ্যের সামান্যীকরণ) থেকে তিনি গ্রহদের উপবৃত্তাকার কক্ষপথের কথা জানতে পারেন। এবার তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, গ্রহদের কক্ষপথ যদি উপবৃত্তাকার হয়, তা হলে তাদের চলনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটা কী। এর উত্তরে তাঁর মনে কতকগুলি সম্ভাব্য

সমাধানের উদয় হয়। এগুলিই হল তত্ত্বপ্রস্তাব বা hypothesis; অর্থাৎ তথ্যের আলোকে সঠিক বলে প্রমাণিত একটা ধারণা নতুন কিছু প্রশ্ন ও অনুমানের জন্ম দিচ্ছে। এই তত্ত্বপ্রস্তাবগুলি ঠিক না ভুল তা নির্ণয় করার জন্য তিনি আবার ফিরে গেলেন পর্যবেক্ষণ-লব্ধ তথ্যেরই কাছে। তা না করে, নিছক অঙ্ক কষেই ক্ষান্ত থাকতে পারতেন। এইখানেই নিউটনীয় পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। আরোহী প্রণালীতে লব্ধ তথ্যসমূহের বিশ্লেষণ থেকে তিনি কতকগুলো তত্ত্বপ্রস্তাব রচনা করেন। সেই তত্ত্বপ্রস্তাবগুলির মধ্যে যেটি বাস্তবে সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে মেলে, সেটিকে তিনি ঠিক বলে মানেন। তারপর সেই তত্ত্বের ভিত্তিতে অবরোহী প্রণালীতে আবার কতকগুলি নতুন তত্ত্বপ্রস্তাব রচনা করেন। এইভাবেই ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে প্রক্রিয়াটা। সুতরাং, এর মধ্যে একদিকে hypothesis ও deduction, অন্য দিকে বেকনীয় induction এই সব কিছুরই সমন্বয় ঘটল।

আমরা দেখেছি, শনি আর বৃহস্পতির মধ্যে একটা পারস্পরিক আকর্ষণ-বলের কথা তাঁর মনে উদয় হল। এটা একটা অনুমান, একটা তত্ত্বপ্রস্তাব। তা ঠিক কি ভুল তা নির্ণয় করার জন্য তাঁর চাই তথ্য— পর্যবেক্ষণভিত্তিক তথ্য। সেই কাজে তাঁকে সহায়তা করে চললেন ফ্ল্যামস্টীড। ফ্ল্যাম্‌স্টীডের সরবরাহ করা তথ্যের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি গতিবিজ্ঞানকে একেবারে ঢেলে সাজালেন। পুরো ছটি মাস সময় তিনি এর পেছনে ব্যয় করলেন। Centripetal— এই একটি নতুন পরিভাষা চালু করলেন, ইতিপূর্বে হাইগেন্‌সের চালু করা centrifugal-এর বিপরীতে। এইগুলি নিয়ে কাজ করতে করতেই তিনি জাড্য (inertia) সংক্রান্ত নীতিটি প্রণয়ন করলেন।

De Motu-র 'সামান্য সংযোজন' উত্তরোত্তর বিরাট আকার ধারণ করতে থাকে। জাড্য-সংক্রান্ত নীতিটি প্রণয়ন করার পর তাঁর কাজ কিছুটা সুসাধ্য হয়ে আসে। এবার তিনি 'চলনের পরিমাণ' (quantity of motion)-কে সূত্রবদ্ধ করলেন। আগে যেখানে বস্তুর 'ওজনের' কথা বলেছিলেন, সেখানে এখন বসালেন 'ভর' (mass) শব্দটি। বস্তুর অভ্যন্তরীণ (inherent) বল আর বাইরে থেকে প্রযুক্ত (impressed) বল— এই দুইয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার গাণিতিক সূত্র আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠল। এর সঙ্গে যুক্ত হল তাঁর সেই বিখ্যাত তৃতীয় সূত্র— সমান ও বিপরীত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূত্র। ১৬৮৫ সালের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে এই সব যুগান্তকারী সূত্র চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

গাণিতিক আয়োজনকে এইভাবে নিখুঁত করে তোলার মূল উদ্দেশ্য একটাই— দূর থেকে ক্রিয়াশীল (action at a distance) যে-বলের তত্ত্বপ্রস্তাব আনলেন তিনি, তার সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করা। আগেই দেখেছি, বৃহস্পতি আর শনির মধ্যে ক্রিয়াশীল ওই বলের ধারণা ফ্ল্যাম্‌স্টীডের মতো বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে সন্তুষ্ট করতে

পারেনি। নিউটনও এই নতুন বলের ধারণাটিকে এতদিন খুব সুনির্দিষ্ট গাণিতিক সূত্রে গাঁথতে পারেননি। পৃথিবী গ্রহের মাধ্যাকর্ষণের ত্বরণের সঙ্গে চাঁদের কক্ষপথ কীভাবে সম্পর্কিত, তা বলতে গিয়ে তিনি এমন এক 'মাধ্যম'-এর কথা বলেছিলেন যার বস্তু-পরিমাণ 'তার ওজনের সঙ্গে মোটামুটি আনুপাতিক'। 'মোটামুটি' 'প্রায়'... এই ধরনের শব্দ দিয়ে একটা প্রক্রিয়ার গুণগত চরিত্র কিছুটা বোঝানো গেলেও, এর দ্বারা তার গাণিতিক অর্থে সুনির্দিষ্ট ক্রিয়াটিকে ব্যাখ্যা করা যায় না, একটা বিশেষ কারণ কোন বিশেষ কার্যের জন্ম দেবে, তার ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। অথচ সেটা করাই বিজ্ঞানের অন্যতম কাজ। এতদিন নিউটন তা করতে পারেননি, যেহেতু তা করবার মতো উপযুক্ত গাণিতিক হাতিয়ার তাঁর ছিল না। এইবার সে-হাতিয়ার তাঁর করায়ত্ত। যে কোনো বস্তুই যে অবাধ অর্থাৎ রোধহীন অবস্থায় সমান ত্বরণ নিয়ে ওপর থেকে নীচে পড়ে (equal acceleration in free fall), তার গাণিতিক ব্যাখ্যা এবার দিলেন তিনি। আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, ছোট্ট দুটি পেন্ডুলামের দোলন, আর মহাকাশের বিপুলকায় জ্যোতিষ্কদের চলন একই গাণিতিক সূত্রে গাঁথা। বৃহস্পতির উপগ্রহ যেন মহাকাশের পেন্ডুলাম। তিনি আরো দেখলেন, কেপলারের তৃতীয় সূত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাদের ভর বৃহস্পতির আকর্ষণ-বলের আনুপাতিক হয়। উপরন্তু বৃহস্পতিকে ঘিরে তাদের সমকেন্দ্রিক কক্ষপথ এটাই প্রমাণ করে যে, সূর্য স্বয়ং বৃহস্পতি ও তার উপগ্রহগুলিকে আকর্ষণ করে ভরেরই আনুপাতিক বলে। নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী, বৃহস্পতির উপগ্রহগুলিও সূর্যকে ঠিক সমান বলে আকর্ষণ করে। এখান থেকে আর এক ধাপ এগোলেই আমরা পৌঁছে যাই সেই জগদ্বিখ্যাত অভিকর্ষ-তত্ত্বে: বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই সব কিছুকে আকর্ষণ করে। যতদিন না আইনস্টাইন এসে এর সর্বগ্রাহ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন, ততদিন এটিই ছিল বিজ্ঞানের ইতিহাসে সবচেয়ে বরেণ্য তত্ত্ব।

যে পদ্ধতিতে নিউটন তাঁর বিশ্বজনীন অভিকর্ষতত্ত্বে উপনীত হলেন, তার মধ্যে একদিকে যেমন বেকনীয় পর্যবেক্ষণ-সিদ্ধতার অপরিহার্যতা প্রমাণিত হল, তেমনি আবার অবরোহী গাণিতিক নিয়মে, কিছুটা দেকার্তীয় ধরনে নতুন তত্ত্বপ্রস্তাব গড়ার প্রক্রিয়াটাও অপরিহার্য বলে প্রমাণিত হল। গাণিতিক সূত্রের প্রয়োগে যে-ফল বেরিয়ে আসবে তার সত্যাসত্য বাস্তবের নিকষে নির্ণয় করার প্রয়োজন দেকার্ত অনুভব করতেন না; অপর দিকে পর্যবেক্ষণের মারফত সংগৃহীত তথ্যকে গাণিতিক বিশ্লেষণ করে সামান্যীকরণ করার বিষয়টা বেকনের কাছে গুরুত্ব পায়নি। নিউটন এসে দুটিকে মেলালেন।

৫ জুলাই, ১৬৮৭ তারিখে রয়্যাল সোসাইটির পরিচালকমণ্ডলীকে লেখা একটি চিঠিতে হ্যালি জানালেন, অবশেষে তাঁর আরব্ধ কর্ম সমাধা হয়েছে, ছাপা হয়েছে

Principia । মাত্র ন-পাতার পুস্তিকা *De Motu*-ই নিউটনের অনুসন্ধান-প্রক্রিয়ার তাগিদে বৃহদায়তন *Principia*-তে রূপ নিল। এর পরিণামে কী ঘটল তা অপরূপ ভাষায় বর্ণনা করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী: 'তিনটি laws of motion আর একটা law of gravitation-এর ভিতরে জগতের অসংখ্য তত্ত্ব যেন লুকাইয়া রহিয়াছে। আরব্য উপন্যাসের ধীবরের কুপীর ভিতর যেমন একটা প্রকাণ্ড দৈত্য নিহিত ছিল, জড় জগতের সমস্ত movement বা গতিবিধিকে যেন ঠাসিয়া পুরিয়া ওই চারিটি সূত্রের মধ্যে রাখা হইয়াছে। যে জাদুকর এই অঘটন-ঘটনায় সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি বস্তুতই জগতের নমস্য। এই সূত্র কয়টির প্রয়োগ করিবা মাত্র গুলি গোলা ক্রিকেট বল বৃষ্টিবিন্দু সমুদ্রের জল রেলগাড়ী ষ্টিমার হইতে চন্দ্র সূর্য রাহু কেতু এবং হ্যালির ধূমকেতু পর্যন্ত সকলেরই গতিবিধি যেন সেই জাদুকরের আয়ত্ত হইয়া পড়ে।' (*বিচিত্র জগৎ*, ১৯১৩, রামেন্দ্র-গ্রন্থাবলী, তৃতীয় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পৃ. ২৬৯)

এই যে মাত্র চারটি সূত্রের মধ্যে বিশ্বের যাবতীয় চলনের হিসাব মিলিয়ে দেওয়ার কথা বলা হল, বিজ্ঞানদর্শনের ওপর তার কী প্রভাব পড়ল?

জন লক: 'অযৌক্তিক, তাই সার্থক'

অ্যারিস্টটলের আঁকা বিশ্বছবিটিকে বদলে ফেলার কাজ শুরু করেছিলেন কোপার্নিকাস। নিউটনের গতিসূত্র ও মহাকর্যতত্ত্ব সেই প্রক্রিয়ারই চূড়ান্ত ধাপ। বেকন আর দেকার্তের পথ ধরে নিউটন যে বিশ্বপ্রক্রিয়ার ছবি আঁকলেন তা সরল প্রাকৃতিক নিয়মে চলে, যাতে প্রতি পদে বল প্রয়োগ করার দরকার হয় না, যাতে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়েছিল কেবল সৃষ্টির সময়ে আর গোটা ব্যবস্থাটাকে দম দিয়ে চালু করে দেওয়ার সময়। পরে লাপ্লাস বিশ্বব্যাপারে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের ওই গলিপথটিও বন্ধ করে দেন। ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে সংস্রব না রেখে স্বাধীন বিজ্ঞানচর্চা করার পথ প্রশস্ত হল এর ফলে।

নিউটনের কাজের সূত্রে এই যে বিপ্লব ঘটল, তার ফলে দার্শনিকরা নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য হলেন। এই সময় থেকে বিজ্ঞান-দর্শন মোটামুটি তিনটে খাতে প্রবাহিত হতে থাকে: এক Empiricism, দুই, Rationalism; তিন, Kantianism. এম্পিরিসিজ়ম (অভিজ্ঞতাবাদ)-এর প্রধান তিন প্রবক্তা

হলেন জন লক, ডেভিড হিউম ও জর্জ বার্ক্‌লি। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা লক সম্বন্ধে আলোচনা করব।

জন লক: অভিজ্ঞতাবাদের জনক[১]

এঁর জীবনের সংক্ষিপ্ত সময় সারণিটি এই রকম:

১৬৩২	২৯ অগস্ট জন্ম।
১৬৪২	ইংল্যান্ডে গৃহযুদ্ধের সূচনা।
১৬৪৯	৩০ জানুয়ারি রাজা প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ; হাউস অব লর্ডস-এর অবলুপ্তি; ইংল্যান্ড কমন্‌ওয়েলথ্‌ ঘোষিত।
১৬৫২	লক অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে ভর্তি।
১৬৫৮	এম এ ডিগ্রি লাভ।
১৬৫৯	রবার্ট বয়েলের সঙ্গে সারা জীবনব্যাপী বন্ধুত্বের সূত্রপাত।
১৬৫৯	দ্বিতীয় চার্লসের ইংল্যান্ড প্রত্যাবর্তন ও সিংহাসন পুনর্গ্রহণ।
১৬৬৫	দেকার্ত পড়ে লক প্রথম ধর্মশাস্ত্রীদের বিকল্প এক বিশ্বব্যবস্থার সন্ধান পেলেন।
১৬৬৬	ডাক্তার টমাস সিডেন্‌হ্যামের সঙ্গে চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণার সূত্রপাত।
১৬৬৭	লন্ডনে লর্ড অ্যাশ্‌লির নিজস্ব চিকিৎসক পদে বহাল। 'An Essay concerning Toleration' রচনা।
১৬৬৮	লকের তত্ত্বাবধানে সফল অস্ত্রোপচার করে অ্যাশ্‌লির লিভার থেকে সিস্ট অপসারণ; লক Fellow of the Royal Society নির্বাচিত।
১৬৭১	Essay Concerning Human Understanding-এর প্রথম খসড়া।
১৬৭২	অক্টোবর-নভেম্বরে পারি গমন।
১৬৭৫	এম বি ডিগ্রি লাভ।
১৬৮৩	সেপ্টেম্বর। দ্বিতীয় চার্লসকে হত্যার ষড়যন্ত্র ফাঁস। লক হল্যান্ডে পলাতক।
১৬৮৪	রাজাজ্ঞায় লক অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজ থেকে বহিষ্কৃত।
১৬৮৫	দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যু; দ্বিতীয় জেম্‌সের সিংহাসন আরোহণ।
১৬৮৬	The Bibliotheque Universelle থেকে লকের Essay Concerning Human Understanding-এর পঞ্চাশ পৃষ্ঠার সারাংশ প্রকাশ।
১৬৮৮	"Glorious Revolution of 1688."

১৬৮৯ ফেব্রুয়ারি। হল্যান্ড থেকে প্রিন্সেস অব অরেঞ্জকে (পরবর্তিকালের রানি মেরি) নিয়ে লকের ইংল্যান্ড প্রত্যাবর্তন। নিউটনের সঙ্গে আলাপ ও বন্ধুত্ব।

১৬৮৯ ডিসেম্বর। Essay Concerning Human Understanding প্রকাশিত।

১৬৯৪ Essay Concerning Human Understanding-এর দ্বিতীয় সংস্করণ।

১৭০৪ মৃত্যু।

ওপরের সারণি থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইংল্যান্ড তথা বিশ্ব ইতিহাসের এক মহা গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিপর্বে জীবন কেটেছিল তাঁর। ওই সময়ের চিহ্ন তাঁর দর্শনে খুব পরিষ্কারভাবে দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর *Essay Concerning Human Understanding* বিশ্বের দর্শনসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে গণ্য। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক, 'অলৌকিক কোনো কিছুকে মেনে নেওয়ার দায় তাঁর ছিল না, তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন নিয়মের শাসনকে— একদিকে নিউটনের বৈজ্ঞানিক নিয়ম, অন্যদিকে ১৬৮৮-র সাংবিধানিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত দেওয়ানি আইনের নিয়ম।'[২]

ব্রিটেনের সংবিধানের ওপরেও তাঁর দর্শনের বিরাট প্রভাব ছিল। শুধু তাই নয়, তাঁর রাজনৈতিক মতবাদই পরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে মূর্ত হয়। ভল্‌তেয়ার মারফত আঠারো শতকের ফরাসি দার্শনিকদের ওপর, বিশেষ করে 'প্রকৃতিবাদী দার্শনিক'দের ওপর তাঁর অসীম প্রভাব পড়েছিল। এখানেও নিউটনের প্রভাবই দেখতে পাই। "দর্শনকে গাণিতিক রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও নিউটনের ভাবধারার সবচেয়ে প্রত্যক্ষ এবং তাৎক্ষণিক ফল ফলেছিল অর্থনীতি আর রাজনীতির ক্ষেত্রে। প্রথমে বন্ধু লক, এবং পরে লকের উত্তরসূরি হিউমের দর্শনের মধ্য দিয়ে পরিস্রুত হয়ে নিউটনের ভাবধারা যে কোনো নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের প্রতি অশ্রদ্ধা জাগায় এবং অবাধ বাণিজ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলে।"[৩]

যেমন রাজনীতিতে, তেমনি বিজ্ঞানের জগতেও তাঁর ভাবনাচিন্তা ব্যবহারিক দিক থেকে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছিল। বিজ্ঞানকে তিনি একটা মানবিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্র বলে মনে করতেন। তাঁর বিজ্ঞান-দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

সহজাত ধারণা বলে কিছু নেই

দেকার্ত তাঁকে খুব প্রভাবিত করেছিলেন। সেই প্রভাবেই তিনি একটা 'সামগ্রিক' চিন্তাপ্রণালী গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। কিন্তু তা করতে গিয়ে প্রথমেই তিনি দেকার্তেরই সহজাত ধারণার (innate ideas) ভাবনাটিকে আক্রমণ করলেন। দেকার্ত মনে করতেন, আমাদের মনের গভীর সত্যের উপলব্ধিগুলি সহজাত, তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার কোনো সম্পর্ক নেই। লক বললেন, তা কী করে হবে? আমাদের যদি সহজাত ধারণাই থাকবে, তা হলে আমরা সে সম্বন্ধে সচেতন নই কেন, কেন আমরা তা টের পাই না? টের যে পাই না তার প্রমাণ তো শিশু কিংবা বর্বরদের দিকে তাকালেই পাওয়া যায়। তারা তো জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পাওয়া অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই 'মানুষ' হয়ে ওঠে, ওইভাবেই বাস্তবতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে, আপনাআপনি তো করে না। অতএব, তিনি বললেন, মন কোনো সহজাত ধারণা বা উপলব্ধি নিয়ে জন্মায় না। মন হচ্ছে tabula rasa— একেবারে ছাপহীন এক সাদা পাতা, জন্মকালে তাতে কোনো ধারণার কোনো চিহ্ন থাকে না। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতাই মনের মধ্যে ধারণা গঠনের একমাত্র উপায়। অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ (পূর্বত সিদ্ধ— a priori) ধারণা বলে কোনো কিছু হয় না। এই হল অভিজ্ঞতাবাদ-এর মূল প্রতিজ্ঞা। লক-ই অভিজ্ঞতাবাদের জনক।

অভিজ্ঞতাকে তিনি এরপর দুভাগে ভাগ করলেন: এক, বাহ্য অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি (sensation)। এই বাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে 'অনুমিত' বস্তুসমূহ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা তৈরি হয়। লক এই সব বস্তুকে 'অনুমিত' বস্তু বলেন এই জন্যে যে, এগুলির অস্তিত্ব প্রমাণিত নয়, এগুলি সম্বন্ধে অনুমান করা চলে মাত্র। দুই, অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা বা ভাবনাচিন্তা (reflection), অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলোকে মনের মধ্যে উলটেপালটে দেখা, তাদের নিয়ে ভাবা, বিচার করা, বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করা, সিদ্ধান্তে আসা।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক গুণ

তাঁর দর্শনকে অনেকে বিম্ববাদ-ও (Representationism) বলেন। কারণ তাঁর মতে বাহ্য জগতের সব কিছুই কেবল কতকগুলি *প্রাথমিক গুণ*-সম্পন্ন সত্তা দ্বারা গঠিত। আকার, আকৃতি, কঠিনত্ব, গতি বা গতিহীনতা, সংখ্যা ও স্থানব্যাপ্তি— এইগুলি হল প্রাথমিক গুণ। এগুলিকে বস্তু থেকে আলাদা করা যায় না, এগুলি বস্তুর মধ্যেই থাকে। ওই গুণগুলি দ্বারা গঠিত সত্তাগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়ের ওপর এসে পড়ে। তখন আমাদের চৈতন্যে ওই সত্তাগুলির ছায়া পড়ে, অর্থাৎ তারা বিম্বিত হয়।

লক ওই বিম্বগুলিকেই ভাব বা ধারণা বলে অভিহিত করেন। মন কেবল ওই বিম্বগুলোকেই জানতে পারে, কিন্তু যে সব বস্তুসত্তা ওই সব বিম্বের জনক, তাদের জানতে পারে না।

এই বিম্বগুলির ওপর, অর্থাৎ এই ধারণাগুলির ওপর মন কতকগুলো *মাধ্যমিক গুণ* আরোপ করে। তাপমাত্রা, রং, ধ্বনি এই সব হল মাধ্যমিক গুণ। যে অবধারণ করছে, এগুলি তার মধ্যেই থাকে। যেমন, চোখ না থাকলে রঙ নেই, কান না থাকলে ধ্বনি নেই, ইত্যাদি। রঙিন চশমার ভিতর দিয়ে দেখলে জিনিসপত্রের রং বদলে যায়।

প্রাথমিক গুণের ওপর মাধ্যমিক গুণ আরোপ করে মন এবার বিম্বগুলিকে বাইরের বস্তুজগতে প্রক্ষেপ করে। ব্যাপারটাকে এইভাবে বোঝা যেতে পারে। ধরা যাক, একটা অন্ধকার আলমারি। সেই আলমারির মধ্যে আছে এক উজ্জ্বল পরদা, যাকে আলো জোগাচ্ছে চৈতন্য। আমাদের মনের বাইরে অবস্থিত বস্তুগুলিকে আমরা জানতে পারি না; যা আমরা জানতে পারি তা হল চৈতন্যের পরদায় ফুটে ওঠা ওই বস্তুগুলির বিম্ব, যাকে ফুটিয়ে তোলে আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়। লকের মতে বাস্তবে আসলে যা আছে তা হল অবয়বহীন একটা সারবস্তু (substance)। তার নিজের কোনো গুণ নেই, কিন্তু তারই নির্গুণ ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে প্রাথমিক গুণগুলি।

হোয়াইট্‌হেড, রবীন্দ্রনাথ

এইভাবে একদিকে তিনি দেকার্তের 'সহজাত ধারণার' তত্ত্বকে বাতিল করলেন ঠিকই, কিন্তু অভিজ্ঞতাকে ইন্দ্রিয়ানুভূতি আর ভাবনাচিন্তা এই দুভাগে ভাগ করতে গিয়ে বিচিত্র এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করলেন। যার নিট ফল দাঁড়াল এই যে, প্রকৃত বাস্তবতাকে মানুষ কোনোদিনই জানতে পারবে না, যা পারবে তা হল ওই বাস্তবতা সম্বন্ধে নিজের মনেরই মাধুরী মেশানো কিছু ধারণা গড়তে। তার মানে ঘুরে ফিরে সেই মনেরই প্রাধান্যের কথা বললেন তিনি। এই যে-জটিলতার সৃষ্টি হল, তা নিয়ে অতি সুন্দর মন্তব্য করেছেন হোয়াইট্‌হেড। তিনি বলছেন, লকের তত্ত্বে বস্তুগুলোকে এমন কতকগুলো গুণের অধিকারী বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে, যা আসলে তাদের নেই। কেননা সে সব গুণ সবই তো মানস-আরোপিত। সেগুলো মনেরই সন্তান। মন ছাড়া তাদের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ প্রকৃতিকে যে সব কারণে আমরা বাহবা দিই— 'the rose for its scent, the nightingale for his song, and the sun for his brilliance'— সেগুলোর কৃতিত্ব আমাদের মনেরই পাওনা। কবিরা সবাই ভুল করেছেন। তাঁদের উচিত নিজেদের উদ্দেশে কবিতা লেখা। প্রকৃতির আসল চেহারাটা অতি ম্যাড়মেড়ে— তা শব্দহীন, গন্ধহীন, দৃশ্যহীন, বর্ণহীন। রূপ যা কিছু দর্শকেরই চোখে, কানে, মনে। সেই চোখ, কান, মন না থাকলে প্রকৃতিও নেই।[৪]

এ যেন রবীন্দ্রনাথের কবিতার দার্শনিক অনুবাদ:

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুণি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, 'সুন্দর',
সুন্দর হল সে।

এখানেই শেষ নয়, রবীন্দ্রনাথ যেন লকের দর্শনের কাব্য-ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন—

মানুষের যাবার দিনের চোখ
বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রঙ,
মানুষের যাবার দিনের মন
ছানিয়ে নেবে রস।
শক্তির কম্পন চলবে আকাশে,
জ্বলবে না কোথাও আলো।
বীণাহীন সভার যন্ত্রীর আঙুল নাচবে
বাজবে না সুর।
সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রবেন বসে
নীলিমাহীন আকাশে
ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে।[৫]

অযৌক্তিক, তাই সার্থক: রাসেলের টিপ্পনী

সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে লক কি সমস্যাটাকে আরো তালগোল পাকিয়ে দিলেন? তা হলে আর নিউটনের সঙ্গে তাঁর সখ্যের কী ফল ফলল? তা হলে বিজ্ঞানের দার্শনিক হিসাবে তাঁর এত খাতিরই বা কেন?

এইখানেই মজা। নিউটন তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাস ও ধর্মবিশ্বাসের খাতিরেই দেশকে (space) ঈশ্বরের চেতনাপীঠ (sensorium) বলে এবং সেই কারণে পরম বা অনাপেক্ষিক বলে মেনে নিয়েছিলেন। আমরা জানি, আইনস্টাইন নিউটনের সেই ভুল ভাঙেন, দেখান যে, দেশও আপেক্ষিক। লকের ক্ষেত্রেও সমস্যাটা একই। নিউটনেরই মতো লকও ভাববাদী দার্শনিক, খ্রিস্টীয় এক-ঈশ্বরে বিশ্বাসী। স্পিনোজারই মতো তিনি অলৌকিকে বিশ্বাসী নন এইজন্য যে, অলৌকিক মানে হচ্ছে ঐশ্বরিক নিয়মের ব্যত্যয়, যা তাঁর মতে অসম্ভব। তাই এক দিকে তিনি বিজ্ঞানের নিয়মাবলী আয়ত্ত করে বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণে বিশ্বাসী, অন্য দিকে সেই

নিয়মকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গত বলে প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর। তাই তিনি এইভাবে আপসরফা করলেন যে, আমাদের মনের মাধুরী-মেশানো যে-বিম্বগুলি দেখি সেগুলি প্রকৃত বস্তু নয় ঠিকই, কিন্তু তার সদ্‌বিম্ব তো বটে। তারা আমাদের বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে সঠিক ধারণাই দেয়। সেই কারণেই মানুষ সার্থকভাবে বিজ্ঞান চর্চা করতে পারে।

এ এক ধরনের গোঁজামিল ঠিকই, কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় গোঁজামিল। ঈশ্বরের পরম অস্তিত্বকেও মানব, আবার এ কথাও বলব যে, মন-নিরপেক্ষ বাস্তবতার অবধারণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব— এ করতে গেলে ওই গোঁজামিল ছাড়া রাস্তা নেই। আমরা পরে দেখব যে, ওই গোঁজামিল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই বিশপ জর্জ বার্ক্‌লি মায়াবাদী কায়দায় বাস্তবতার অস্তিত্বকেই উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, বাস্তবতা যদি কোথাও থাকে তো সে কেবল ঈশ্বরের চৈতন্যে, বাকি সব মায়া (প্রসঙ্গত, ওই কারণেই বিদ্যাসাগর মশাই সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যক্রমে বার্ক্‌লিকে রাখতে রাজি হননি)। লকের তুলনায় বার্ক্‌লির এই সিদ্ধান্ত যুক্তিশাস্ত্রের দিক থেকে অনেক পরিচ্ছন্ন, এ কথা মানতেই হবে।

এইখানে লকের দর্শন নিয়ে বার্ট্রান্ড রাসেল একটা চমৎকার যুক্তির অবতারণা করেছেন। তিনি বলছেন, লকের বাস্তবসম্মত কাণ্ডজ্ঞান অতি প্রখর ছিল। তাই যখনই তিনি দেখতেন তাঁর নিজেরই যুক্তি থেকে এমন সব সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসছে যা কাণ্ডজ্ঞানের বিরোধী, তখনই তিনি সে সিদ্ধান্ত বর্জন করে স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তটাই গ্রহণ করতেন। 'He is always sensible, and always willing to sacrifice logic rather than become paradoxical. He enunciates general principles which... are capable of leading to strange consequences; but whenever the strange consequences seem about to appear, Locke blandly refrains from drawing them.' (তিনি সর্বদাই কাণ্ডজ্ঞানের অধিকারী, স্ববিরোধী হয়ে ওঠার বদলে বরং যুক্তিশাস্ত্রের নিয়মকেই বিসর্জন দিতে সদা প্রস্তুত। তিনি নানান সামান্য সূত্র প্রণয়ন করেন... যার মধ্যে এমন এমন জিনিস থাকে যার অদ্ভুত সব পরিণাম হতে পারে। কিন্তু সেই সব অদ্ভুত পরিণাম দেখা দেওয়ার সূত্রপাত হওয়া মাত্রই তিনি সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে অম্লানবদনে বিরত থাকেন।) তাই, রাসেল বলছেন, লকের সঠিক ধারণাগুলোর মতো ভুল ধারণাগুলোও ব্যবহারিক দিক থেকে কাজে লেগেছিল। যে-যুক্তিতে লক মাধ্যমিক গুণগুলোকে অবধারকের অন্তর্নিহিত বা অভ্যন্তরীণ বলে প্রতিপন্ন করেন, সেই একই যুক্তিতে (বার্ক্‌লি সেটা প্রমাণ করেছিলেন) তাঁর কথিত প্রাথমিক গুণগুলিকেও মানুষের

অভ্যন্তরীণ গুণ বলা চলে। এ এক পরিষ্কার দ্বৈধতা। অথচ রাসেল বলছেন, কোয়ান্টাম তত্ত্বের আগে পর্যন্ত ওই দ্বৈধতাই ব্যবহারিক পদার্থবিজ্ঞানে প্রাধান্য বিছিয়ে রেখেছিল। জেনে অথবা না জেনে পদার্থবিজ্ঞানীরা ওই ধারণাকেই মেনে চলতেন। শুধু তাই নয়, ওই ধারণা থেকে বাস্তবে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারও হয়েছিল।

ডাক্তারি অভিজ্ঞতা

লকের এই বাস্তব কাণ্ডজ্ঞানের পিছনে তাঁর ডাক্তারি অভিজ্ঞতার একটা বড় অবদান আছে। ১৬৬৬ সাল থেকে তিনি ডাক্তার টমাস সিডেন্‌হ্যামের (১৬২৪-১৬৮৯) কাছে ডাক্তারি শিখেছিলেন। ডাক্তারি জগতে এই সিডেন্‌হ্যাম ছিলেন এক কিংবদন্তি। তাঁকে 'ইংল্যান্ডের হিপক্রেটিস' বলা হত, কারণ তিনি বেকনীয় কায়দায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রোগ পর্যবেক্ষণের ওপর অসীম গুরুত্ব দিতেন। আন্দাজি দূরকল্পনার ওপর তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন। এই মনোভাব তাঁর ছাত্রেও বর্তেছিল। একটি বিশেষ ঘটনা এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৬৬৭ সালে লক লর্ড অ্যাশ্‌লির চিকিৎসক পদে নিযুক্ত হন। অ্যাশ্‌লি প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। সিডেন্‌হ্যামের কায়দায় রোগ পর্যবেক্ষণ করে লক এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, অ্যাশ্‌লির লিভারে এমন একটা কিছু হয়েছে, যেটাকে কেটে বাদ দিলে রোগী হয়তো সুস্থ হয়ে উঠবে। ১৬৬৮ সালে তাঁরই তত্ত্বাবধানে অপারেশন হয়। সত্যিই দেখা যায়, রোগীর লিভারে একটা সিস্ট হয়েছে। সেটিকে কেটে বাদ দেওয়ার পর অ্যাশ্‌লি সুস্থ হয়ে ওঠেন, এবং দীর্ঘদিন সুস্থ ও সক্রিয় জীবন যাপন করেন। ঘটনাটা তখনকার দিনে বিরাট সাড়া জাগায়। এরই দৌলতে লক রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। মনে রাখতে হবে, তখন রোগনির্ণয়ের কোনো যন্ত্রপাতি (যথা এক্স-রে বা ইউএসজি) ছিল না। সুতরাং লক নিছক তাঁর চক্ষু, কর্ণ, হয়তো নাসিকা এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে রোগীর শরীরের অ-দেখা অঙ্গ ও রোগলক্ষণ সম্বন্ধে যে অনুমান করেন তা সঠিক বলে প্রমাণিত হয়, এবং সেই অনুমানের ভিত্তিতে বাস্তবে যে কাজ করা হয় (অপারেশন) তা বাঞ্ছিত ফল দেয়। তার মানে, ইন্দ্রিয়ের মারফত আমরা যা অবধারণ করি তার সঙ্গে বাস্তবের মিল থাকতে কোনো অসুবিধে নেই, তা আমাদের বাস্তবতা সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানই দেয়। ওই ঘটনার তিন বছরের মধ্যে (১৬৭১) লক *Essay Concerning Human Understanding*-এর খসড়াটি লেখেন।

উপসংহার

বাস্তব অনুশীলন থেকেই সঠিক ধারণার উদ্ভব হয়— মাও জেদঙের সেই বিখ্যাত উক্তির যথার্থতা লকের দর্শনের মধ্যে দিয়ে প্রতিভাত হয়। আবার, একই সঙ্গে, ভাববাদী পথ অনুসরণ করলে যে শেষ পর্যন্ত নিজেরই সঠিক ধারণা থেকে বিচ্যুত হতে হয়, সেটাও পরিষ্কার হয়ে যায় লকের দর্শন থেকেই।

বিশপ বার্ক্‌লি: পাশ্চাত্যের শঙ্কর?

জন লকের বিজ্ঞান দর্শনে যে গোঁজামিল ছিল, তা নিরসন করে অভিজ্ঞতাবাদী (এম্পিরিসিস্ট) দর্শনকে অনেক বেশি যুক্তিনিষ্ঠ করে তুললেন জর্জ বার্ক্‌লি (George Berkeley, ১৬৮৫-১৭৫৩)। কিন্তু সেটা তিনি করলেন বিজ্ঞানের স্বার্থে নয়, কায়েমি ধর্মের স্বার্থে। তিনি দেখালেন, নির্ভেজাল অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিতে বিচার করলে প্রমাণ হয়, একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া কোনো কিছুরই বাস্তব অস্তিত্ব নেই, ফলত নিউটনীয় বিজ্ঞান ভুল।

তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তাঁর চিন্তাধারা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। এই অর্থে পরিচ্ছন্ন যে, আশ্রয়বাক্য আর সিদ্ধান্তের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোনো গোঁজামিল নেই। এই কারণেই বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও দার্শনিক বার্ক্‌লিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অনেকে এমন কথাও বলেন যে, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের পিছনেও বার্ক্‌লি-দর্শনের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। একটা উদাহরণ দিলেই লক আর বার্ক্‌লির তফাতটা বোঝা যাবে। লক বলেছিলেন, পদার্থের বিস্তার (এক্সটেনশন) আর ভার-এর

মতো 'প্রাথমিক/মৌলিক' গুণগুলি মানসনিরপেক্ষ, অবজেকটিভ। অপর দিকে, গন্ধ কিংবা স্বাদের মতো 'মাধ্যমিক/আনুষঙ্গিক' গুণগুলি একেবারেই মানসনির্ভর, মনের বাইরে তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই। কেন এই দু ধরনের গুণকে তিনি দুটি আলাদা গোত্রে রাখছেন, তার কোনো সদুত্তর কিন্তু লক দেননি। কারণ, ভিতরে ভিতরে তিনি আসলে চাইছিলেন, নিউটনীয় বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথ নিষ্কণ্টক হোক। অথচ, সেটা করতে গিয়ে চার্চকে, কায়েমি ধর্মকে আঘাত করার মতো সাহস তিনি অর্জন করতে পারেননি। তাই দু'দিক বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন। আমরা দেখেছি, সাময়িকভাবে তাতে বিজ্ঞানের উপকারই হয়েছিল। কেননা, যে শ্রেণী তখন বিজ্ঞানের উন্নতি চাইছিল, তাদের মনোভঙ্গির সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়ে গিয়েছিল লকের ওই দু কূল বজায় রাখার দর্শন। আর ওই শ্রেণির সহায়তা না পেলে তখন বিজ্ঞান এগোতে পারত কি না সন্দেহ।

সেই দর্শনের মূল কথাটা এই রকম— সৃজনের আদিকালে ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এক মোক্ষম ঠেলা দিয়ে নিজে সরে পড়েন; সেই ঠেলা খাওয়ার পর থেকে ব্রহ্মাণ্ড কিন্তু তার নিজের নিয়মেই চলেছে, পদে পদে ঈশ্বরের আর হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হচ্ছে না। বিজ্ঞানের কাজ হল ব্রহ্মাণ্ডের সেই নিয়মগুলোকে জানা। এই মতকেই ডীইজ্‌ম (deism) বলা হয়।

কিন্তু কায়েমি ধর্মীয় স্বার্থের সঙ্গে, মৌলবাদী খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁরা এই গোঁজামিলকে মেনে নেবেন কেন? শুধু সৃষ্টির আদি মুহূর্তে নয়, প্রতিটি মুহূর্তের প্রতিটি ঘটনাই তাঁদের মতে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় ঘটছে। অতএব, নিউটনকে এবং নিউটনের বকলমে লককে আক্রমণ না করলে তাঁদের চলবে কেন? সেই আক্রমণ শানানোর কাজে যিনি সবচেয়ে সফল নেতৃত্ব দিলেন, তিনি হলেন বিশপ জর্জ বার্ক্‌লি, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাববাদী দার্শনিক হিসেবে যিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন।

বার্কলির জীবনকথা

জর্জ বার্ক্‌লির জন্ম আয়ারল্যান্ডে, ১৬৮৫ সালে। ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষালাভ করে তিনি পরে ওই কলেজেরই 'ফেলো' পদে যোগ দেন। গ্রীক ও হিব্রু ভাষার অধ্যাপক বার্ক্‌লি অনেক বই লিখেছিলেন, তার মধ্যে তিনটি রচনা প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে: *Essay Towards a New Theory of Vision* (১৭০৯), *A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge* (১৭১০), এবং *Three Dialogues Between Hylas and Philonous* (১৭১৩)। তবে আশ্চর্যের বিষয়

এই যে, নিজ যুগে তিনি বিখ্যাত ছিলেন 'টার-ওয়াটার'-এর ভেষজগুণ নিয়ে গবেষণার জন্য!

১৭২২ থেকে ১৭২৮ সাল পর্যন্ত বার্ক্‌লি মেতেছিলেন এক বিরাট ধর্মীয় কর্মসূচি নিয়ে। আমেরিকা মহাদেশের বারমুডায় তিনি একটি ধর্ম-বিদ্যালয় (সেমিনারি) স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, ব্রিটেন থেকে যারা আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করতে গিয়েছে তাদের ছেলেমেয়েদের, আর সেই সঙ্গে স্থানীয় 'নেটিভ'দের খ্রিস্টীয় শিক্ষা দেওয়া। এর জন্য তিনি জোর তদবির করে অনেকের কাছ থেকে প্রচুর টাকা অনুদানের প্রতিশ্রুতি পান। এমনকী ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তাঁকে বিশ হাজার পাউন্ড অনুদানের প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৭২৮ সালের ১ অগস্ট অ্যান ফস্টারকে বিবাহ করে তিনি আমেরিকা পাড়ি দেন। রোড আইল্যান্ডের নিউপোর্টে গিয়ে ঘর বাঁধেন। সেখানে হোয়াইট্‌হল নামে এক খামারবাড়ি বানান, যা আজও রয়েছে। সেই বাড়িতে বসে তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন, কবে সেই প্রতিশ্রুত টাকাপয়সা আসবে। আর সেই সঙ্গে মুক্তচিন্তার বিরুদ্ধে খ্রিস্টপন্থার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে প্রচার চালাতে থাকেন।

১৭৩১-এর গোড়ায় খবর আসে, প্রতিশ্রুত অনুদানের টাকা আসছে না। ওই বছরেই অক্টোবর মাসে তিনি লন্ডন ফিরে আসেন। যাওয়ার আগে তাঁর বইয়ের বিশাল সংগ্রহ দান করে যান হার্ভার্ড আর ইয়েল গ্রন্থাগারকে। খামারবাড়িটি দান করে যান ইয়েলকে। ক্যালিফর্নিয়ার বার্ক্‌লি শহর এবং, বলা বাহুল্য, বার্ক্‌লি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁরই নামে চিহ্নিত।

দেশে ফিরে আসার পর ১৭৩৪ সালে তাঁকে ক্লয়েন (Cloyne)-এর বিশপ পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। ১৭৫২ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানেই থাকেন, তারপর ছেলের কাছে চলে যান অক্সফোর্ডে। ১৪ জানুয়ারি ১৭৫৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তখনকার রেওয়াজ অনুযায়ী তাঁর দেহ পাঁচদিন কবর না দিয়ে রেখে দেওয়া হয়। মৃতদেহ পচে দুর্গন্ধ বেরনোর পর কবর দেওয়া হয়। তখনকার এই প্রথার উদ্দেশ্য ছিল যাতে ভুল করে কাউকে জ্যান্ত কবর না দেওয়া হয়।

নিউটনীয় দর্শন ও গণিতের বিরুদ্ধে আক্রমণ

১৭৩৪ সালে নিউটনীয় গণিতকে তীব্র আক্রমণ করে তিনি লেখেন *The Analyst*, যার উপ-শিরোনাম ছিল: A DISCLOSURE Addressed to an Infidel Mathematician. বাংলা করলে দাঁড়ায়: *জনৈক বিধর্মী গণিতজ্ঞের উদ্দেশে রচিত*। অনুমান করা হয় এই 'বিধর্মী গণিতজ্ঞটি' আর কেউ নন, স্বয়ং সার আইজ্যাক নিউটন। নিউটন অবশ্য ১৭২৭ সালেই মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সহযোগী ও

বন্ধু এডমন্ড হ্যালি তখনও বেঁচে। ব্যক্তিগতভাবে নিউটন এই আক্রমণের লক্ষ্য হোন বা না হোন, নিউটনীয় বিজ্ঞানপদ্ধতিই যে এর লক্ষ্যবস্তু, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহেরই অবকাশ নেই। এই বইতে তিনি নিউটন ও লাইব্‌নিৎস-এর প্রবর্তিত ক্যালকুলাস পদ্ধতি যে কত অযৌক্তিক তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। তিনি দেখাতে চান যে, মৌলবাদী খ্রিস্টধর্মের মতগুলিকে যাঁরা অযৌক্তিক বলেন, তাঁদের নিজেদের মত ও পথও কিছু কম অযৌক্তিক নয়। নেতিবাচক অর্থে বার্ক্‌লির এই আক্রমণের ফল অবশ্য ভালই হয়েছিল। কেননা, ওই আক্রমণের পালটা উত্তর দিতে গিয়ে ক্যালকুলাস পদ্ধতির যৌক্তিক বনেদটি আরও নিশ্ছিদ্র করে গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

নিউটনের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণ এই প্রথম নয়। ১৭২১ সালেই, অর্থাৎ নিউটনের জীবৎকালেই *গতিপ্রসঙ্গে* (*De Motu*) নামক বইতে তিনি নিউটনের দেশ (space)-সংক্রান্ত দর্শনকে আক্রমণ করেছিলেন।

বার্ক্‌লির বিজ্ঞানদর্শন নিয়ে আমরা পরে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করব। তার আগে যুগে যুগে, দেশে দেশে বস্তুবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে ওই দর্শনের প্রবল লড়াই সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে নিতে চাই।

বার্ক্‌লি ও বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) ও অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) ছিলেন আধুনিক ভারতের দুই অগ্রণী ভাববাদ-বিরোধী মনীষী। বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক, তখন অবৈজ্ঞানিক সাংখ্য ও বেদান্তদর্শনের ক্ষতিকর প্রভাবের পালটা হিসেবে ক্লাসে বেকন-এর অভিজ্ঞতাবাদী দর্শন পড়ানোর প্রস্তাব দেন। জন স্টুয়ার্ট মিল-এর *লজিক* পাঠ্য করেন। সংস্কৃতর পাশাপাশি ইংরেজি অবশ্যপাঠ্য করেন। ব্রিটিশ প্রাচ্যবাদীরা এর প্রবল বিরোধিতা করেন। এঁদেরই প্রতিভূরূপে বিখ্যাত পণ্ডিত জে আর ব্যালান্টাইন বেনারস থেকে সরকারি নির্দেশে সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শনে আসেন। বিদ্যাসাগরের অগাধ পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করলেও তিনি কিন্তু বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞানমুখী অভিজ্ঞতাবাদী শিক্ষাদর্শনের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, 'পাশ্চাত্য দর্শন' যদি পড়াতেই হয়, তা হলে পড়ানো হোক জর্জ বার্ক্‌লি। দেশে দেশে বিজ্ঞানবিরোধী দার্শনিকদের মধ্যে কী আশ্চর্য মিল! ব্যালান্টাইন নির্ভুলভাবেই বুঝেছিলেন, বার্ক্‌লির দর্শন শঙ্করাচার্যের মায়াবাদী দর্শনেরই অর্বাচীন পাশ্চাত্য রূপ মাত্র। কাজেই, ওই দর্শনের পাঠ নিলে মায়াবাদী ভাবনায় অভ্যস্ত ভারতীয়রা আধুনিক বিজ্ঞানের যুক্তিধারা ও পদ্ধতি রপ্ত করতে পারবে না। পক্ষান্তরে, বিদ্যাসাগরও নির্ভুলভাবে বুঝেছিলেন যে, ওই পথ থেকে

ভারতীয়দের সরিয়ে আনতে না পারলে ভারতে কোনোদিনই আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার উপযোগী মন তৈরি করা যাবে না। বস্তুত, প্রধানত ওই দর্শনের প্রভাবেই তো ভারতীয়রা তাদের এত বড় বিজ্ঞানচর্চাব ঐতিহ্য নষ্ট করে ফেলেছে। তার ওপর ঔপনিবেশিক হীনম্মন্যতাবশত তারা যদি দেখে, বার্ক্লির মতো সাহেব দার্শনিকরাও শঙ্করের পথের পথিক, তা হলে তো সোনায় সোহাগা। তখন তো তারা বলবে, সবই ব্যাদে আছে (মেঘনাদ সাহা স্মরণীয়)! অতএব বিদ্যাসাগর স্বভাবসুলভ রুদ্রমূর্তি ধারণ করে বললেন, বার্ক্লির দর্শন পড়ালে ছেলেদের প্রচণ্ড ক্ষতি হবে; তাই বার্ক্লি নয়, বেকনের দর্শনকেই ক্লাসে পাঠ্য করতে হবে। এর অন্যথা হলে তিনি পদত্যাগ করবেন। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ-ভারতের সরকারি শিক্ষাদফতর বিদ্যাসাগরের কথা মানতে বাধ্য হয়। ব্যালান্টাইনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করে বেকনের *Novum Organum*-ই পাঠ্য হিসেবে নির্বাচিত হয়, বার্ক্লি নয়।

লেনিন ও চন্দ্রশেখরের বার্ক্লি-বিরোধিতা

দেশে দেশে বস্তুবাদী বিজ্ঞানদর্শনের সঙ্গে বার্ক্লি-দর্শনের এই সঙ্ঘাত চলেই আসছে। জে ডি বার্নাল (১৯০১-১৯২৪) তাঁর **ইতিহাসে বিজ্ঞান** বইতে বার্ক্লির দর্শন সম্বন্ধে সংক্ষেপে মন্তব্য করেছেন যে, 'বার্ক্লি কায়েমি ধর্মের স্বার্থে প্রমাণ করতে চাইলেন যে বিশ্বের এবং বিজ্ঞানের বাস্তব অস্তিত্ব যদি কোথাও থাকে তো সে কেবল ঈশ্বরের চোখে, আর কোথাও নয়। সেকালে এ-তত্ত্বের তেমন কোনো প্রভাব না পড়লেও, পরে বিশ শতকে, এই তত্ত্ব হয়ে ওঠে প্রতিক্রিয়াশীলতার ভিত্তি।'[১]

লেনিন (১৮৭০-১৯২৪) তাঁর *Materialism and Empirio-Criticism* (১৯০৮) বইতে মাখ-এর নব্য প্রত্যক্ষবাদের ওপর, এবং সেই সূত্রে রুশ চিন্তাবিদ্‌দের ওপর, এমনকী রুশ মার্ক্সবাদীদের ওপর বার্ক্লি-দর্শনের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। লেনিন লিখছেন, 'অতএব দেখা যাচ্ছে, বহির্জগতের "উদ্ভট" অস্তিত্বে বিশ্বাসীদের বার্ক্লি বাধ্য হয়ে শুধু তত্ত্বগতভাবে খণ্ডন প্রয়াসে ক্ষান্ত হননি, প্রচণ্ড আবেগতাড়িত হয়ে বস্তুবাদী অনুগামীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতেও কুণ্ঠা বোধ করেননি। বস্তুবাদের বিষময় ফল তো টেনে উপড়ে ফেলতে হবে।... বার্ক্লি কিন্তু নিজের দার্শনিক ঝোঁকের ব্যাপারে খোলাখুলি শুধু ছিলেন না, ভাববাদের নগ্নরূপকে আড়াল করতেও যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন। ভীষণ চেষ্টা ছিল যাতে লোকে মনে করে তাঁর দর্শন অযৌক্তিকতা থেকে মুক্ত ও "সাধারণ বুদ্ধিতে" গ্রহণযোগ্য।'[২]

বস্তুবাদী দর্শনের দিক থেকে যেমন লেনিন, তেমনই নিখাদ বিজ্ঞানের দিক থেকে সুব্রমনিয়ন চন্দ্রশেখর (১৯১০-১৯২৪) বার্ক্লির দর্শনের অবাস্তবতা স্পষ্ট

করে দেখিয়ে দিয়েছেন: 'আঠারো শতকের ভাববাদী দার্শনিক, বার্ক্লি আর তাঁর অনুগামীরা দাবি করেছিলেন যে সূর্য, চন্দ্র ও তারাগুলি "আমাদের মনের ভিতরকার কতকগুলি অনুভূতি মাত্র", ওগুলি নিয়ে (যেমন তারাদের উপাদান নিয়ে) অনুসন্ধান করা নিরর্থক। অথচ এর মাত্র কয়েক দশকের মধ্যেই ১৮৬০ সালে কার্চফ (Kirchoff) তাঁর অসীম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটির কথা ঘোষণা করেন। ফ্রাউনহফার রেখাগুলির রাসায়নিক ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি দেখান যে, সূর্যের আবহমণ্ডলে আমাদের পরিচিত ধাতুগুলি জ্বলমান বাষ্প আকারে উপস্থিত রয়েছে। সেই সময় থেকে তারাদের উপাদান নিয়ে কথা বলাটা আর অলস স্বপ্ন দেখে দিন কাটানোর ব্যাপার রইল না। তা হয়ে উঠল অতীব কৌতূহলজনক এক ব্যবহারিক বিষয়।'[৩]

বার্ক্লির যুক্তিধারা

আগেই উল্লেখ করেছি, লকের অভিজ্ঞতাবাদী (এম্পিরিসিস্ট) অথচ ঈশ্বর-বিশ্বাসী যুক্তিধারার মধ্যে গুরুতর গোঁজামিল ছিল। সেই গোঁজামিলের ছিদ্র দিয়েই অনুপ্রবেশ ঘটল জর্জ বার্ক্লির। জ্ঞান আসে কেবল অভিজ্ঞতা থেকে আর অভিজ্ঞতা ঘটে কেবল ইন্দ্রিয়ের মারফত— লকের এই যুক্তি থেকেই সম্পূর্ণ বিপরীত এক সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলেন তিনি। তিনি দেখালেন, লকের ওই যুক্তি থেকেই প্রমাণ হয় যে বস্তু হচ্ছে মনেরই এক অংশ মাত্র, তার স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। ভাবনাটা অসাধারণ। ভাববাদের সপক্ষে এমন জোরালো, গোঁজামিল-বর্জিত যুক্তি কমই আছে।

বার্ক্লির সেই যুক্তিধারাটি একটু ভালো করে অনুধাবন করা যাক। মানুষ জন্মকালে কোনো ধারণা নিয়ে জন্মায় না, ঈশ্বর মানুষের মনে আগে থেকেই কোনো ধারণা রোপণ করে তাকে পৃথিবীতে পাঠান না। তা হলে মানুষ কী করে কোনো বিষয়ে ধারণা গঠন করে? লক বললেন, অভিজ্ঞতা থেকে। কী করে সে-অভিজ্ঞতা হয়? লক বললেন, ইন্দ্রিয়ের মারফত। ঠিক এই জায়গাটাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বার্ক্লি। তিনি বললেন, বেশ তো, সব জ্ঞানই তা হলে গঠিত হয় ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা মারফত। ফাঁকা, নিষ্কলঙ্ক স্লেটের মতো মন নিয়ে মানুষ জন্মাচ্ছে, তারপর নানারকম অভিজ্ঞতার আঁকিবুঁকির মধ্যে দিয়ে সেই স্লেট ভর্তি হয়ে উঠছে, সে জ্ঞান লাভ করছে। কিন্তু কীসের জ্ঞান? ইন্দ্রিয়ের মারফত যে সব বোধ জাগে, কিংবা সেই সব বোধ যেসব ভাবনার জন্ম দেয় তারই জ্ঞান, তার বাইরে কিছু নয়। তার মানে একটা 'জিনিস' সম্বন্ধে যে জ্ঞান আমরা লাভ করেছি, সেটা কতকগুলো অবধারণার (পারসেপ্‌শন) সমষ্টি। অবধারণা কেমন করে গড়ে ওঠে? ওই সব বোধকেই মনের

মধ্যে বিভিন্ন বর্গে/ গোত্রে সাজিয়ে নিয়ে, নানারকম ব্যাখ্যার অধীন করলে আমরা অবধারণা গঠন করতে পারব। বার্ক্‌লি বললেন, তা হলে এর মধ্যে 'বস্তু'র প্রশ্নটা উঠছে কোথা থেকে? সবই তো কতকগুলো মানসিক *বোধ* বা অবধারণার বা তার স্মৃতির সমষ্টি মাত্র। লক তো কোথাও বলেননি যে, বস্তু কী? বরং তিনি এই কথাই বলেছেন যে, আমাদের মনের বাইরে অবস্থিত বস্তুগুলিকে আমরা জানতে পারি না; যা আমরা জানতে পারি তা হল চৈতন্যের পরদায় ফুটে ওঠা ওই বস্তুগুলির বিম্ব, যাকে ফুটিয়ে তোলে আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়। সুতরাং, বার্ক্‌লির মতে, যে জ্ঞান আমরা লাভ করছি তার কোনো বস্তুগত ভিত্তি নেই, তা আমাদেরই মনের নিজস্ব মাধুরী ছাড়া আর কিছুই নয়।

উদাহরণ নেওয়া যাক। ধরুন বিরিয়ানি খাচ্ছেন। মাংসটা বেশ শক্ত, ভালো সেদ্ধ হয়নি। ছিঁড়তে দাঁত ভেঙে যাওয়ার জোগাড়। গলদঘর্ম হয়ে, রীতিমত ধস্তাধস্তি করে খাওয়া শেষ করলেন। আধ ঘণ্টা পরে পেট আইঢাই। এবার প্রশ্ন: ওই সেদ্ধ না-হওয়া মাংস, হাড়, ওই সরু চাল, ওই দাঁতের ও পেটের ব্যথা— এ সবের মধ্যে কোথাও বস্তুর সংস্রব নেই? সবই আপনার মনের কতকগুলো অবধারণা মাত্র?

বার্ক্‌লির উত্তর হবে এইরকম। যেটাকে আপনি বিরিয়ানি বলছেন, মাংস, হাড় বা সরু চাল বলেছেন, সেগুলো নেহাতই আপনার দর্শনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয় আর স্পর্শেন্দ্রিয়ের (অর্থাৎ ত্বকের) কতকগুলো অনুভূতির সমষ্টি মাত্র। কেননা, আপনি যদি লকের কথা মানেন, তা হলে আপনাকে মানতে হবে যে, 'বস্তু' সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান লাভ আপনার পক্ষে সম্ভব নয়, কতকগুলো ইন্দ্রিয়ানুভূতির অভিজ্ঞতা বা স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই আপনার জানা নেই। চাল-বস্তু, হাড়-বস্তু, মাংস-বস্তু, পাঁঠা-বস্তু সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না। জ়াফরান কী, আপনি জানেন না; জ়াফরানের গন্ধটা আপনার নাকের বিশেষ বিশেষ স্নায়ুর বিশেষ বিশেষ উদ্দীপন-জাত অনুভূতি। 'শক্ত' মাংসটা আপনার দাঁত, জিভ, মাড়ি প্রভৃতি অঞ্চলের পেশি আর স্নায়ুর কতকগুলো সঙ্কোচন-প্রসারণ-জাত অনুভূতি মাত্র। রেওয়াজি পাঁঠার মাংসের স্বাদটা জিভের স্বাদগ্রন্থির বিশেষ ধরনের রসক্ষরণের অভিজ্ঞতা মাত্র। সত্যিকারের পাঁঠা কাকে বলে সেটা আপনার পক্ষে জানা সম্ভবই নয়— আপনার চোখ আর মস্তিষ্ক মিলে লম্বকর্ণর কতকগুলো অবয়বের ছবি এঁকে নিয়েছে, সেইগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে, তারই স্মৃতিকে কাজে লাগাচ্ছেন আপনি। ভাবছেন আপনি বুঝি সত্যিকারের লম্বকর্ণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেছেন। আসলে কিন্তু আপনি নেহাত কিছু ইন্দ্রিয়ানুভূতির মালিক, সত্যিকারের বস্তুগঠিত লম্বকর্ণকে জানবার কোনো প্রক্রিয়া আপনার আয়ত্তে নেই।

বার্ক্লি আরও বলবেন, ধরা যাক জন্মগত কোনো অসুখে আপনার জিভের স্বাদগ্রন্থি শিশুকাল থেকে নিষ্ক্রিয়। তা হলে কি আপনি রেওয়াজি পাঁঠার স্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন? খেয়ে বলে দিতে পারবেন, এটা পার্ক সার্কাস থেকে আনা হয়েছে, না উলটোডাঙা থেকে? পারবেন না। অর্থাৎ রেওয়াজি পাঁঠার স্বাদ গ্রহণ এবং তা নিয়ে বিচার-বিবেচনা করার ব্যাপারটা নির্ভর করছে আপনার স্বাদ-ইন্দ্রিয় কাজ করছে কি না তার ওপর। যদি না করে, তা হলে আপনার সাপেক্ষে ওই রেওয়াজি পাঁঠা তখন নিরস্তিত্ব।

শঙ্করের মায়াবাদ ও বার্ক্লির দর্শন

সুতরাং বার্ক্লি প্রমাণ করে দিলেন যে লকের অভিজ্ঞতাবাদকে যদি মানতে হয়, তা হলে এও মানতে হবে যে, বস্তু সম্বন্ধে কোনো কিছু জানার কলাকৌশল মানুষের আয়ত্তে নেই। প্রশ্ন, তা হলে কি বস্তু বলে আদপেই কিছু নেই? সবটাই মায়া? শঙ্করাচার্য হলে হয়তো তাই বলতেন: 'ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মিথ্যা'।[৪]

কিন্তু বার্ক্লি বলবেন, বস্তু নিশ্চয়ই আছে, বস্তু না থাকলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে কী করে? কিন্তু সে বস্তু সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান লাভ করা মানুষের সাধ্য নয়। একমাত্র ঈশ্বরের চৈতন্যেই বস্তুর প্রকৃত জ্ঞান অধিষ্ঠান করে। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, বার্ক্লির এই বক্তব্য শঙ্করের থেকে খুব বেশি আলাদা নয়। যেমন, শঙ্কর বলছেন: 'মায়া বা অবিদ্যা ব্রহ্মের শক্তি। তাহাকে অব্যক্তও বলা হয়। ...এই মায়া হইতে এই সকল জগৎ উৎপন্ন হয়।[৫] এই জগৎ অবশ্য মিথ্যা, কিন্তু বিশেষ ধরনের মিথ্যা: 'মায়া এবং মহৎ (বিশ্বমন) হইতে স্থূলদেহ পর্যন্ত মায়িক সৃষ্টি— সব কিছুই মিথ্যা। এই সকল অনাত্মবস্তুকে তুমি মরুভূমিতে জলভ্রমের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া জান।'[৬] এখানে এই মরীচিকার উপমাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা 'মরীচিকা একান্তভাবে মিথ্যাবস্তু নয়: মরুভূমিরূপ অধিষ্ঠান না থাকিলে জলভ্রম হইত না।'

বার্ক্লির মতের সঙ্গে শঙ্করের মায়াবাদের এই সাদৃশ্য লক্ষ করেই বিদ্যাসাগর ১৮৫৩ সালে মন্তব্য করেছিলেন: '...When, by the perusal of that book, the Hindu students of Sanskrit will find that the theories advanced by the Samkhya and Vedanta systems are corroborated by a philosopher of Europe, their reverence for these two systems will increase instead of being decreased.' (ভাবানুবাদ: বার্ক্লির ওই বই পড়ে সংস্কৃতের হিন্দু ছাত্ররা যখন দেখবে যে সাংখ্য আর বেদান্ত মতে যেসব তত্ত্বকথা বলা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন করছেন একজন ইউরোপীয় দার্শনিক, তখন ওই দুই মতের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা কমার বদলে বরং আরো বেড়েই যাবে।)[৭]

বার্ক্‌লি আসলে খ্রিস্টীয় চার্চের পক্ষ নিয়ে নিউটনীয় বিজ্ঞানকে আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন। নিউটনের বিজ্ঞান এবং লকের দর্শন কোনোটাই সরাসরি ঈশ্বরদ্রোহী না হওয়া সত্ত্বেও, এক দিকে গণিত-নির্ভর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতন্ত্র, অন্য দিকে লকের 'টাবুলা রাসা' (নিষ্কলঙ্ক স্লেট) তত্ত্ব, এ দুটোই খ্রিস্টীয় ধর্মতাত্ত্বিকদের বিরাট ধাক্কা দিয়েছিল। সে ধাক্কা সামলাতে হলে শুধু ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তি যথেষ্ট নয়; তার জন্য প্রয়োজন নিউটনীয় ক্যালকুলাস-গণিতকে এবং লকের দর্শনকে সমানভাবে আক্রমণ করা। তার জন্য যে-অগাধ পাণ্ডিত্য দরকার, তা ছিল না ধর্মতাত্ত্বিকদের। জর্জ বার্ক্‌লির সেই পাণ্ডিত্য ছিল। তাকেই কাজে লাগিয়ে তিনি যুগপৎ নিউটনের গণিত এবং নিউটনীয় বিজ্ঞানের দার্শনিক প্রতিরূপ লকের অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনকে আক্রমণ করলেন।

রাসেলের বার্ক্‌লি-খণ্ডন

রাসেল অতি যত্নে বার্ক্‌লির যুক্তির হেত্বাভাসগুলি (ফ্যালাসি) দেখিয়ে দিয়েছেন। দু-একটি উদাহরণ। বার্ক্‌লির যুক্তি: তাপ কোনো বস্তু হতে পারে না, যেহেতু 'তাপের অতি প্রবল ও তীব্র মাত্রাই (হচ্ছে) যন্ত্রণা' এবং 'বোধহীন কোনো জিনিস যন্ত্রণা বা আরাম দিতে পারে', এ তো আর সম্ভব নয়। রাসেলের পালটা যুক্তি: 'যন্ত্রণা' (pain) শব্দটার দুরকম অর্থ হয়, বার্ক্‌লি তারই সুযোগ নিচ্ছেন। যন্ত্রণার একটা অর্থ হল কোনো একটা অনুভূতির যন্ত্রণাদায়ক বৈশিষ্ট্য বা গুণ। এর আরেকটা অর্থ হল যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি। প্রথম অর্থটিতে একটি বৈশিষ্ট্য বা গুণ (যন্ত্রণা) বোঝানো হচ্ছে, আর দ্বিতীয়টিতে বোঝানো হচ্ছে একটি অনুভূতি। রাসেল বলছেন, আমরা যখন বলি, পা ভাঙলে যন্ত্রণা হয়, তখন আমরা এ কথা বোঝাই না যে পায়ের অস্তিত্ব রয়েছে মনে। অনুরূপভাবে, যখন আমরা বলি, তাপ (হচ্ছে) যন্ত্রণা, তখন আসলে বোঝাই, তাপ যন্ত্রণা দেয়। অর্থাৎ তাপ নিজে যন্ত্রণা নয়, তা যন্ত্রণার জন্ম দেয়। কাজেই বার্ক্‌লির ওই যুক্তিটা খুব দুর্বল, নিছক কথার মারপ্যাঁচ মাত্র।

এই একই ধরনের যুক্তির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে স্বাদের ব্যাপারে। মিষ্টত্ব হচ্ছে সুখ, আর তিক্ততা হচ্ছে যন্ত্রণা। অতএব মিষ্টত্ব আর তিক্ততা দুটোই বার্ক্‌লির মতে নিছক মানসিক বৈশিষ্ট্য বা গুণ।

বিদ্যাসাগর ১৮৫৩ সালে গভীর প্রত্যয় নিয়ে লিখেছিলেন, বার্ক্‌লির মত তখনকার ইউরোপে আর 'sound system of philosophy' বলে গণ্য করা হয় না। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে, এবং বিংশ শতকে কিন্তু ওই মত বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। বার্নাল তাই মন্তব্য করেছেন, 'সেকালে এ-তত্ত্বের তেমন কোনো প্রভাব না পড়লেও, পরে বিশ শতকে, এই তত্ত্ব

হয়ে ওঠে প্রতিক্রিয়াশীলতার ভিত্তি।'[৮] আশ্চর্যের এবং দুঃখের ব্যাপার এই যে, বিদ্যাসাগর, লেনিন, বার্নাল, চন্দ্রশেখরের মতো মনীষীরা বারবার বার্ক্‌লি-দর্শনের ক্ষতিকর ও ভ্রান্ত দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও কিন্তু বার্ক্‌লির প্রভাব বিজ্ঞান-দর্শনের ওপর ভালোরকমই রয়েছে— আজও। এ থেকেই বোঝা যায়, ভাববাদের বিজ্ঞান-বিরোধী আকর্ষণ কী তীব্র— শেষ পর্যন্ত যার কারণ খুঁজতে হয় কায়েমী ধর্মেরই মধ্যে। আরো বোঝা যায়, এর বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যাওয়াটা কত জরুরি।

ডীইজ়ম: ভগবানের হারানো লেত্তি

ডীইজম্ (deism— অনেকে ডেইইজ্‌ম-ও বলেন, কেউ কেউ এর বাংলা করেন 'যুক্তিসঞ্জাত ঈশ্বরবাদ') নিয়ে লিখতে বসে প্রথমেই মান্না দে-র কথা মনে পড়ে গেল। গোয়াবাগানের মানুষ দে মশাইয়ের তুলনা নেই। সেই কবে সলিল চৌধুরীর সুরে অমিত মৈত্রর কথায় 'একদিন রাত্রে' ছবিতে গেয়েছিলেন, *'ঘুরিয়ে দুনিয়ার লাট্টু, ভগবান হারিয়েছে লেত্তি'*, আজও তা পুরনো হল না।

ভাববেন না ফাজলামি করছি। ডীইস্ট্‌রা গুরুগম্ভীর সুরে ওই কথাই বলতেন— একেবারে সৃজনের আদিলগ্নে ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এক মোক্ষম ঠেলা দিয়েই সরে পড়েছেন। ব্রহ্মাণ্ড তার পর থেকে নিজের নিয়মেই, অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মেই চলেছে। আর ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ দরকার হচ্ছে না। অর্থাৎ কিনা, ভগবান একবার লাট্টুটা বোঁ করে ঘুরিয়ে দিয়েই লেত্তিটা ফেলে দিয়েছেন (মতান্তরে হারিয়ে ফেলেছেন), এখন ইচ্ছে করলেও আর প্রকৃতির কোনো কিছুতে হস্তক্ষেপ করার জো নেই তাঁর! লাট্টু যদি থামে, তো তার নিজের নিয়মেই থামবে, ঈশ্বরের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না

করে। ফাজলামি নয়, এ সব হল গভীর তত্ত্বকথা। সাইমন ব্ল্যাকবার্নের খাস অক্সফোর্ডীয় দর্শন-অভিধানে বলা হয়েছে, ডীইজ়্ম্ অনুসারে God may only be thought of as an 'absentee londlord'.[১] কী ভয়ানক কথা! সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে কিনা 'অনুপস্থিত জমিদারের' সঙ্গে তুলনা করা। আমরা প্রাক্তন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লোক, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দৌলতে অনুপস্থিত জমিদারের কীর্তিকলাপ হাড়ে হাড়ে জানি। সেই ধারণার সঙ্গে ডীইস্ট্দের ভগবানের ধারণা খাপে খাপে মিলে যায়, কেননা ডীইস্ট্দের মতে 'Supplication and prayer in particular are fruitless'.[২] প্রার্থনা করে, করুণা চেয়ে কিছু হয় না। এও আমাদের চেনা কথা। ব্রাহ্মসমাজের ডীইজ়ম-পন্থী অংশের নেতা অক্ষয় দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) মধ্য-উনিশ শতকে সেই যে এক মোক্ষম ইকুয়েশন লিখে বাংলা কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন, সে তো এই কথারই বীজগাণিতিক রূপ:

প রি শ্র ম = শ স্য

প রি শ্র ম + প্রা র্থ না = শস্য

∴ প্রা র্থ না = ০

মুশকিল হচ্ছে, ডীইজ়মে নাকি বেশিদিন বিশ্বাস করা যায় না: যে-ব্যক্তি ডীইজ়মে বিশ্বাস করে, সে অচিরে নাস্তিক হয়ে উঠতে বাধ্য। এও মহাপুরুষেরই কথা। দনি দিদরো-র (Denis Diderot, 1713-1784) মন্তব্য অবিস্মরণীয় হয়ে আছে: ডীইস্ট্ হল সেই ব্যক্তি যে নাস্তিক হয়ে ওঠার আগেই মরে গেছে! অর্থাৎ যে-লোক ডীইস্ট্, সে ঠিকঠাক বেঁচে থাকলে একদিন নাস্তিক হয়ে উঠবেই। এ হিসেবও আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। অক্ষয় দত্তই তার নির্ভুল উদাহরণ। মধ্যবয়সে তিনি তো কার্যত নাস্তিকই হয়ে গিয়েছিলেন।

অক্সফোর্ড থেকে এবার যদি কেম্ব্রিজের দ্বারস্থ হই, তা হলে দেখব ডীইজ়মের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইভাবে: 'Belief in the existence of a supreme being who is the ground and source of reality but who does not intervene or take an active interest in the natural and historical order.'[৩] এ তো ভারি মজার ব্যাপার। পরম শক্তিস্বরূপ একজন কেউ আছেন, আছেন শুধু নন, তিনিই হচ্ছেন বাস্তবতার উৎস এবং ভিত্তি। অথচ এহেন ঈশ্বর প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলির ওপর হস্তক্ষেপ করেন না, সমাজের নিয়মকানুনের মধ্যে নাক গলান না, সে সবে তাঁর কোনো সক্রিয় আগ্রহ নেই। এতই তিনি অলস। তাঁকে 'অনুপস্থিত জমিদার' বলে গাল দিয়ে— নাকি প্রশংসা করে?— ব্ল্যাকবার্ন তো ঠিকই করেছেন দেখছি।

ডীইজ়ম হল প্রায়-নাস্তিকতা; কিন্তু ওই 'প্রায়'টুকু খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেন যে ওই 'প্রায়'-এর দুয়ারটুকু পার হতে তাঁদের এত সংশয়, তা নিয়ে একটু পরেই আলোচনা করব, তার আগে অন্য একটা মজার ব্যাপার নিয়ে দুয়েকটা কথা বলে নেব।

ঈশ্বর: দেশকালে সীমাবদ্ধ

Deism— এই ইংরেজি শব্দটার উৎস সন্ধানে বেরলে কতকগুলো অদ্ভুত জিনিস নজরে পড়বে। শব্দটা এসেছে ফরাসি déism থেকে। ফরাসি কথাটা আবার এসেছে লাতিন deus (দিউস) থেকে, যার অর্থ ভগবান। এই দিউস শব্দটি ইন্দো-ইউরোপীয় প্রায় সবকটি প্রধান ভাষাতেই পাওয়া যায়— সংস্কৃত সমেত। অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষায়: 'ঈশ্বর অথবা দেবতা-বাচক পদ আর্য্যবংশীয় যাবতীয় জাতির মধ্যেই সমস্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দিব্ অথবা দ্যু ধাতুর রূপ। ওই ধাতু হইতে সংস্কৃত দেব, লাতিন ডিউস, গ্রীক জিউস্ ও থেয়স্... শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।' শুধু তাই নয়, দত্ত মহাশয় আরও বিশদ করে বলছেন: 'বেদসংহিতায় দ্যৌঃ বা দ্যৌস্ নামে একটি দেবতার প্রসঙ্গ বারংবার প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনুধাবন করিয়া দেখিলে গ্রীসীয় জিউস্ এবং বেদোক্ত দ্যৌস্ এই দুটি নাম যে নিতান্ত সুসদৃশ, ইহাতে সন্দেহ থাকে না।' শুধু নাম নয়, এ দুজনের স্বভাবচরিত্রও প্রায় একই রকম। গ্রীকদের জ়িউস 'গগনবিহারী, গগনাধিকারী ও বজ্রধারী এবং মেঘ, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত, শিলা-বর্ষণ, ইন্দ্রধনু-প্রকাশ প্রভৃতি গগন-গত ব্যাপারের উৎপাদনকর্ত্তা।' আর আমাদের 'বেদোক্ত দ্যৌস্ দেবতাও গগন-বাচক ও বজ্র-বিচালক এবং ইন্দ্রদেবের উৎপাদক।' তিনি আরো দেখান, 'জিউস্ দেবতা বহুতর তনয়ের পিতা ও অনেকানেক নর-বংশের জনয়িতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বৈদিক সংহিতায় দ্যৌস্ দেবতাকেও বারংবার পিতৃ-শব্দে সম্বোধন করা হইয়াছে।'[৪] অক্ষয় দত্ত ঋগ্বেদ থেকে এই সংক্রান্ত অংশগুলি উদ্বৃত করে তাঁর মামলা চমৎকারভাবে সাজান। সে সব খুঁটিনাটিতে যাচ্ছি না, যাঁর আগ্রহ আছে তিনি *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়*-এর প্রথম খণ্ডের উপক্রমণিকাটি পড়ে নেবেন।

না, ভয় পাবেন না; গল্পচ্ছলে সট্‌কে শেখানোর মতো কায়দা করে ডীইজ়ম শব্দের খেই ধরে পাঠককে তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্ব শেখানোর অভিসন্ধি আমার নেই, সে-এলেমও নেই। কেবল একটা জিনিস বিশেষ করে বোঝাতে চাইছি যে, ঈশ্বরবিশ্বাস ব্যাপারটারও একটা ইতিহাস আছে। সেটা কোনো দেশকালাতীত,

স্বপ্নাদ্য ব্যাপার নয়। মানুষের ইতিহাস-ভূগোল যেমন যেমন বদলেছে, তার সঙ্গে তাল রেখে ঈশ্বরের ধারণাও বদলেছে, ধর্মাচরণও বদলেছে। যেমন আদি ইন্দো-ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর একটা বিশেষ ধরনের ঈশ্বরবিশ্বাস ছিল। 'গ্রীক, লাটিন, হিন্দু ও পারসীকেরা যে সময়ে একত্র অবস্থান করিতেন, সেই সময়ের অবস্থা... আর্য্যদিগের জাতীয় ধর্ম্মের প্রথম অবস্থা'।[৫] সেই বিশ্বাসটা এক বিশেষ ধরনের কালচারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তারপর ইতিহাসের প্রক্রিয়ায় সেই জনগোষ্ঠী ভৌগোলিক অর্থে যত ছড়িয়ে পড়েছে, ততই দেশে দেশে তাদের কালচারও বদলেছে, ঈশ্বরবিশ্বাসের ও ধর্মের ধরণটাও বদলে গেছে, এখনও বদলে চলেছে। আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয়রা যতই হিন্দুধর্ম-হিন্দুধর্ম করে চিৎকার করুন, আর দু-এক প্রজন্ম পরে একমাত্র গাঁজা কিংবা হাশিশের ব্যবহার ছাড়া তাঁদের হিন্দু ধর্মের সঙ্গে এ দেশের হিন্দু ধর্মের কোনো জান-পহ্চান থাকবে না, ওটা পুরাতত্ত্বের আওতায় চলে যাবে। যেমন, 'হিন্দু' শব্দের উৎস খুঁজতে গিয়ে আজ ইরাণের দ্বারস্থ হতে হয় আমাদের: 'হিন্দু-শব্দ সংস্কৃত নহে; বেদ, স্মৃতি, দর্শন ও রামায়ণাদি প্রাচীন গ্রন্থে উহা দৃষ্ট হয় না।...সংস্কৃত সপ্তসিন্ধু ও আবস্তিক হপ্তহেন্দু শব্দের প্রসঙ্গে পাঠ করিলে বোধ হইবে, আবস্তিক হেন্দু শব্দ সংস্কৃত সিন্ধু শব্দেরই রূপান্তর মাত্র। পারসীক দেশের কীলরূপা শিলালিপিতে উহা হিদুস্ বলিয়া লিখিত আছে।'[৬] অথচ আজকের ইরানের ইসলামি কালচারের সঙ্গে আজকের হিন্দুদের কালচারের আসমান-জমিন ফারাক। অর্থাৎ ঈশ্বর শাশ্বত নন, অবিনশ্বর নন, কালাতীত নন, নেহাতই দেশেকালে সীমাবদ্ধ একটি ধারণা। তিনি নিতান্তই মানুষের জাগতিক জীবনযাত্রার উপজাতক, তার সুখদুঃখের, তার সার্থকতা-ব্যর্থতার বাষ্পরূপ। সুব্রমনিয়ন চন্দ্রশেখর বলেছিলেন, 'ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেন নি, মানুষই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে।' এ শুধু হক কথা নয়, লাখ কথার এক কথা।

আক্ষরিক অর্থে বিচার করলে deism আর theism একই কথা। দুটোরই আক্ষরিক ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল ঈশ্বরবাদ বা ঈশ্বরে বিশ্বাস। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দুটো শব্দ প্রায় দুই বিপরীত মেরুর ভাবনাকে ধারণ করে আছে। Theism বলতে ঈশ্বরে বিশ্বাসকেই বোঝায়, বাংলায় যাকে আস্তিকতা বলা হয়। তার বিপরীত কথাটা atheism, বাংলায় নাস্তিকতা, নিরীশ্বরতা বা অনীশ্বরতা। এ দুটো প্রাচীন আমল থেকেই ছিল। নিরীশ্বরতার ইতিহাস ঠিক আস্তিকতার মতোই পুরনো, হয়তো আরো বেশি পুরনো। ভারতের প্রাচীনতম দর্শন সাংখ্যমতে তো পরিষ্কার ভাষায় ঈশ্বরকে 'অসিদ্ধ' বলা হয়েছে। এইভাবে ঈশ্বর-অনীশ্বরের দ্বন্দ্ব নিয়েই যুগ যুগ ধরে ইতিহাস এগিয়েছে। ইতিহাসের একটা বিশেষ পর্যায়ে, সতেরো শতকে এসে, ইউরোপে এক নতুন ধরনের ঈশ্বর-বিশ্বাস হিসেবে ডীইজ়ম-এর উদ্ভব হল। ওটাও বিশেষ

দেশকালের, বিশেষ অবস্থার অবদান। ব্ল্যাকবার্নের কথায়, ডীইজ়ম হল 'a term referring to the doctrine of "natural religion" emerging in England and France in the late 17th and early 18th centuries, according to which while reason... assures us that there is a God, additional revelation, dogma, or supernatural commerce with the deity are all excluded.'[৭] প্রশ্ন হচ্ছে সতেরো-আঠেরো শতকে ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সে কী এমন ঘটল, যার ফলে ডীইজ়মের জন্ম হল? কারাই বা এর প্রধান প্রবক্তা? কী তাঁদের ভূমিকা?

আধুনিক বিজ্ঞান ও ডীইজ়ম

সতেরো-আঠারো শতকে ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সে যা ঘটল তার নাম আধুনিক বিজ্ঞান। কোপার্নিকাসের হাত ধরে যার সূত্রপাত, টাইকো-কেপলার গ্যালিলিও-বেকন-দেকার্ত হয়ে অবশেষে নিউটনের হাতে তার পূর্ণতা। ভলতেয়ারের হাত ধরে নিউটনের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ফ্রান্সে ছড়িয়ে পড়ে। নিউটন এমন এক বিশ্বপ্রক্রিয়ার ছবি আঁকলেন যা সরল প্রাকৃতিক নিয়মে চলে, যাতে ঈশ্বরের প্রয়োজন হয় কেবল সৃষ্টির সময় আর গোটা ব্যবস্থাটাকে চালু করে দেওয়ার সময় (সেই ভগবান, লাট্টু আর লেত্তির তত্ত্ব!)। প্রত্যেকটা কাজের জন্য প্রত্যেকটা ধাপে আলাদা আলাদা করে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের তত্ত্ব আর টিকল না। এক সময় বলা হত (এখনো অনেকে বলেন), ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া একটি গাছের একটি পাতাও নাকি নড়ে না। এখন আর শিক্ষিত লোকেরা সে কথা মানতে রাজি হল না। এখন থেকে ঈশ্বরের যেটুকু ভূমিকা তা নেপথ্যে, নাটক শুরু হওয়ার আগে। একবার নাটক শুরু হয়ে গেলে পর, তিনি থাকলেন কি গেলেন, তা নিয়ে আর কারও মাথাব্যথা রইল না। ধর্মতাত্ত্বিকদের আওতা থেকে বার করে এনে বিজ্ঞানচর্চার একটা স্বাধীন পথ তৈরি হল এর ফলে।

কিন্তু পুরোপুরি স্বাধীন বলা যায় কি? এতদিনকার চালু ধর্মবিশ্বাস রাতারাতি তো আর উবে যেতে পারে না। নিউটন নিজে খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাস করতেন, খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব নিয়ে তাঁর প্রচুর কাজ আছে। কাজেই তিনি তাঁর 'সিস্টেম'-এ ঈশ্বরের জন্য একটু ফাঁক রেখে দিলেন। বললেন, আর সবই বলবিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী চলছে ঠিকই, কিন্তু দেশ (space) হচ্ছে খোদাতালার 'খাস পেয়ারা', তা নাকি সব কিছুর ঊর্ধ্বে, তা নাকি আপেক্ষিক নয়, তা নাকি খোদ ঈশ্বরেরই 'চেতনাপীঠ (sensorium)'। এ তো অদ্ভুত ব্যাপার। বিশ্বসংসারের বাকি সব কিছু নিউটনেরই প্রমাণিত প্রাকৃতিক বলবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে চলবে, অথচ দেশের বেলায় বলা হবে ওটা ঈশ্বরের খাসতালুক! আসলে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বা ঈশ্বরবিশ্বাসের গোঁজামিল দিতে গেলেই ওইরকম পরস্পর-বিরোধী কথাবার্তা বলতে হয়।

ডীইজ়মের মধ্যে ঠিক এই জিনিসটাই দেখতে পাই। ডীইজ়মের প্রবক্তারা আগাপাশতলা যুক্তিবাদী। বিজ্ঞানকেই তাঁরা আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে বড় অঙ্গ বলে মনে করেন। যুক্তিবাদী পথে সমাজকে, মানুষের মনকে নতুন ছাঁচে ঢেলে নিতেও তাঁরা আগ্রহী। কিন্তু সব কিছুর পরেও তাঁদের ঈশ্বরবিশ্বাসটুকু ছাড়তে রাজি নন। নিউটনেরই বন্ধু, তাঁরই অনুগামী দার্শনিক জন লক-এর (১৬৩২-১৭০৪) কথাই ধরুন না। তিনি নিজে ছিলেন ডাক্তার, 'অলৌকিক কোনো কিছুকে মেনে নেওয়ার দায় তাঁর ছিল না। তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন নিয়মের শাসনকে—একদিকে নিউটনের বৈজ্ঞানিক নিয়ম, অন্যদিকে ব্রিটেনে ১৬৮৮ সালের সাংবিধানিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত দেওয়ানি (সিভিল) আইনের নিয়ম।'[৮] এই জন লক একরকম ডীইজ়মে বিশ্বাস করতেন। অর্থাৎ ঈশ্বরও আছেন, বৈজ্ঞানিক নিয়মও আছে। শুধু জন লক কেন, বিশ্ব-ইতিহাসের অনেক অবিস্মরণীয় ব্যক্তি ডীইজ়মে বিশ্বাস করতেন। রসায়নবিদ জোসেফ প্রিস্ট্‌লী (১৭৩৩-১৮০৪) নিজেকে খ্রিস্টান বললেও, তাঁর ভাবনাচিন্তা ডীইজ়মেরই সমগোত্রীয় ছিল। নিয়তি, ট্রিনিটি, খ্রিস্টের মৃত্যু মানুষের পাপেরই মূল্য, আত্মার অস্তিত্ব, এইসমস্ত চালু খ্রিস্টীয় বুলিতে এতটুকু বিশ্বাস ছিল না তাঁর, বরং, এগুলিকে তিনি প্রকৃত খ্রিস্টধর্মের 'অবমাননা' বলে গণ্য করতেন। 'বিজ্ঞানসাধনা, মানবহিতৈষণা এবং বিপ্লবাত্মক রাজনীতির সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন তিনি।... মজার ব্যাপার হচ্ছে, ফরাসিরা ভেবেই পেত না, কী করে একজন দার্শনিকের পক্ষে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা সম্ভব; ওদিকে ইংরেজরা বুঝতে পারত না, নিরীশ্বরবাদের সঙ্গে প্রিস্ট্‌লীর ধর্মের তফাতটা কী!'[৯]

বেন্‌জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের (১৭০৬-১৭৯০) ভাবনাচিন্তাও কতকটা ওইরকমেরই ছিল। ফ্র্যাঙ্কলিনের জীবনী পড়ে ব্রহ্মবাদী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কীরকম চটে গিয়েছিলেন, সে কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে। মহর্ষির চোখে ফ্র্যাঙ্কলিন ছিলেন 'নিতান্তই সুবুদ্ধি মানুষ'। তাঁর 'হিসাব-করা কেজো ধর্মনীতির সংকীর্ণতা' দেবেন্দ্রনাথকে পীড়া দিত। তিনি 'ফ্রাঙ্কলিনের ঘোরতর সাংসারিক বিজ্ঞতার দৃষ্টান্তে ও উপদেশবাক্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতেন এবং প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।'[১০] একই মানুষ সম্বন্ধে বার্নাল লিখছেন: 'পারিতে এবং ভের্সাইতে থাকাকালীন রাজনীতি ও বিজ্ঞানের গতিপ্রকৃতির ওপর তাঁর প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। ফ্র্যাঙ্কলিন যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর বেকন। তবে এ-বেকনের চরিত্র আলাদা। ...নবযুগের এই বেকনের উদ্ভব জনগণের মধ্যে থেকে, স্বাধীনতার আবহাওয়ায়। ...নবযুগের বিজ্ঞানের একেবারে সামনের সারিতে তাঁর অবস্থান।'[১১] বৈজ্ঞানিকতা, গণতান্ত্রিকতা আর সহজ বুদ্ধি, এই তিনটি গুণের সমন্বয়ে ফ্র্যাঙ্কলিন ছিলেন অনন্য।

টম পেইন ও ডীইজ়ম

তবে, আগমার্কা ডীইস্ট্‌দের মধ্যে যাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন টম পেইন (১৭৩৭-১৮০৯)। ফরাসি বিপ্লবের সমর্থক, 'কমন সেন্স'-এর দার্শনিক বলে প্রসিদ্ধ টম পেইন তাঁর *Rights of Man* গ্রন্থে আঠারো শতকের সুশৃঙ্খল সভ্যতার ধারণাটিকে তীব্র আক্রমণ করলেন। লক থেকে বার্ক পর্যন্ত কেউই তাঁর ক্ষুরধার আক্রমণ থেকে রেহাই পেলেন না। টম পেইন এই সভ্যতাকে ভ্রষ্টাচারগ্রস্ত এবং নিপীড়নমূলক বলে বর্ণনা করলেন। মানুষকে যে মানুষ হিসেবেই সম্মান দেখাতে হবে, তার কৌলীন্য কিংবা সম্পদ বিচার করে নয়, তাঁর এই ধারণাটাই তখন নতুন। সমাজ, এমনকি শৌখিন বৈঠকখানার সমাজও এই কালাপাহাড়ি ধারণার উচ্চারণে মর্মাহত হল।'[১২] ডীইজ়ম সম্পর্কে পেইন-এর লেখা নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করলেই এই মতের শক্তি ও দুর্বলতা দুটোই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

'Of the Religion of Deism Compared with the Christian Religion'.[১৩] (খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে ডীইজ়ম-ধর্মের তুলনা) প্রবন্ধে পেইন লিখেছেন, 'যেকোনো মানুষ, তিনি যে-ধর্মেরই হোন না কেন, তাঁর ধর্মমতের আদি সূত্র হল ডীইজ়ম।... ডীইজ়ম মানে ঈশ্বরে বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই প্রতিটি মানুষের ধর্মমতের প্রথম সূত্র।' তা হলে সাধারণ অর্থে ঈশ্বরবিশ্বাসের সঙ্গে, অর্থাৎ থীইজ়মের সঙ্গে এর তফাত কোথায়? 'যখনই আমরা ওই সূত্র থেকে সরে গিয়ে এ-কে মানুষের তৈরি-করা অন্যসব সূত্রের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলি, তখনই আমরা পথ হারিয়ে অনিশ্চয়তা আর বানানো গল্পকথার এক গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়ি। তখনই আমরা বুজরুকদের ঈশ্বর-প্রেরিত বার্তার যাবতীয় চাপের শিকার হই।' পেইন-এর মতে, যারা বলে, ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ যোগাযোগ আছে, ঈশ্বরই নাকি তাদের নিজ বার্তা পাঠিয়ে দেন, 'তারা ধাপ্পা মারে।'

যুগ যুগ ধরে নানা ধর্মমতের নামে মানুষ এই সব 'ধাপ্পা' শুনে আসছে। পেইন উদাহরণ দিচ্ছেন: 'পারস্যের অনুশাসন-প্রণেতা জ়োরোআস্তার রচিত জ়েন্দ্-আবেস্তা দেখিয়ে পারসিকরা বলবে: এই হল ঐশ্বরিক নিয়ম। ব্রাহ্মণরা তাদের শাস্ত্র দেখিয়ে বলবে, ঈশ্বর মেঘের আড়াল থেকে ব্রহ্মার কাছে ওই শাস্ত্র উদ্‌ঘাটন করেছেন। ইহুদিরা যেটাকে মোজ়েস-এর অনুশাসন বলে সেটাকে দেখিয়ে দাবি করবে, ঈশ্বর স্বয়ং মোজ়েস-কে ওইসব অনুশাসন দান করেছিলেন সাইনাই পাহাড়ের ওপরে। খ্রিস্টানরা কতকগুলো বই আর নীতিকথার সংকলন (সেগুলো কে যে লিখেছে, কেউ জানে না) দেখিয়ে বলবে, এই হল 'নিউ টেস্টামেন্ট'। মুসলমানরা তাদের কোরান দেখিয়ে বলবে, ঈশ্বর ওই কথাগুলি মহম্মদকে স্বমুখে

বলেছিলেন। এরা প্রত্যেকেই দাবি করে, তাদের ধর্মটাই ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট। ওটাই ঈশ্বরের একমাত্র সত্য কথা। প্রতিটি ধর্মের অনুগামীরা একই কথা বার বার শুনতে শুনতে একথা বিশ্বাস করে ফেলে। তারা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে যে অন্য সব ধর্ম হল গা-জোয়ারি ব্যাপার, একমাত্র তাদেরটাই খাঁটি।'

এর বিপরীতে, পেইন বলছেন, 'একজন ডীইস্ট্কে তার বিশ্বাস সত্য প্রমাণ করার জন্যে অত্যাশ্চর্য দৈব ঘটনা বলে প্রচারিত ওই সমস্ত কেরামতি আর চালবাজির আশ্রয় নিতে হয় না।' খ্রিস্টীয় জগতে এই ধরনের অত্যাশ্চর্য দৈব ঘটনার সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ, বলাই বাহুল্য, অক্ষতযোনি মেরি-র গর্ভে যিশুর জন্ম। পেইনের কথায়, 'একটা গল্প চালু আছে যে জোসেফের সঙ্গে বিয়ের আগে একজন রোমান সেনা মেরিকে ধরে রেখেছিল এবং তারই ঔরসে তিনি গর্ভবতী হন। এ গল্পটার সত্যি-মিথ্যে নির্ধারণের ভার আমি ইহুদি আর খ্রিস্টানদের ওপরেই ছেড়ে দিলাম। তবে গল্পটা সত্যি হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। কারণ মেরির স্বামী জোসেফ একটা কিছু সন্দেহ করতেন, মেরিকে ঈর্ষা করতেন। মেরিকে তিনি লুকিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন (নিউ টেস্টামেন্ট, ম্যাথু, ১:১৯)।' পেইন বলছেন, একমেবাদ্বিতীয়ম সেই আদি ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোনো গালগল্পতে বিশ্বাস করলে যে কী ঝামেলায় পড়তে হয়, এটা তারই উদাহরণ: শেষ পর্যন্ত 'কে যে যিশুর পিতা তা নিশ্চিত করে জানাই অসম্ভব হয়ে পড়ল।'

পেইন-এর মতে, ওল্ড টেস্টামেন্টের জেনেসিস-কাণ্ডে যে সব কাহিনি নিছক রূপক আকারে বলা হয়েছিল, চার্চ অব রোম সেগুলোকে সত্যি ঘটনা বলে প্রচার করল, কেননা তা না হলে তারা যিশু খ্রিস্টকে জগতের ত্রাতা বলে উপস্থিত করবে কী করে? ওইখানেই পুরোহিততন্ত্রের কারসাজি ও কেরামতি। 'পুরোহিততন্ত্র চিরকালই জ্ঞানের শত্রু, কারণ মানুষকে বিভ্রম আর অজ্ঞানতার ঘোরে আচ্ছন্ন করে রেখেই তো তারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। সুতরাং জ্ঞান আহরণকে সত্যিকারের পাপ বলে ফতোয়া দেওয়াটা তাদের নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ...পুরোহিততন্ত্রের কাছে বিচারবোধই হল নিষিদ্ধ বৃক্ষ। (ইডেন উদ্যানের) নিষিদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের রূপক ব্যাখ্যায় এটা একটা সূত্র হতে পারে। কারণ যেসময় ওই রূপক বানানো হয়েছিল তখন এর একটা অর্থ ও ব্যবহারিক উপযোগিতা নিশ্চয়ই ছিল, এরকম অনুমান সঙ্গত।'

এখানেই থামছেন না পেইন। 'ধর্মমতের কোনো একটা সূত্রকে যখন কিছুতেই সত্য বলে বা সম্ভবপর বলে প্রমাণ করা যায় না, তখন মোক্ষম তোপটি দাগা হয়, বলা হয়, ওটি ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ। তাতে কিন্তু সমস্যা মেটে না, একটার জায়গায়

অন্য একটা সমস্যা হাজির হয় মাত্র। কারণ কোনো একটা বিষয়কে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলে প্রমাণ করাটা ঠিক পূত আত্মার দ্বারা মেরির গর্ভাধান প্রমাণ করার মতোই অসম্ভব। এইখানেই ডীইজ়ম-ধর্ম খ্রিস্টধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যেসব বানানো, কষ্টকল্পিত গালগল্প আমাদের বিচারবোধকে চরম আঘাত হানে, কিংবা আমাদের মানবিকতাকে আহত করে, খ্রিস্টধর্মে যেসব গল্পের ছড়াছড়ি, সেসবের থেকে ডীইজ়ম মুক্ত। তার ধর্মমত বিশুদ্ধ এবং মহনীয়রূপে সরল। সে কেবল ঈশ্বরকে মানে, তার বেশি কিছু মানে না।'

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অসারতা, বিশেষ করে পুরোহিততন্ত্রের বুজরুকিকে পেইন যেভাবে আক্রমণ করেছেন, তা অতুলনীয়। কিন্তু যে-যুক্তিবাদের কথা, যে-'বিচারবোধ'-এর কথা তিনি বার বার বলেন, যার জোরে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে এমনভাবে তুলোধোনা করেন, সেই বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করলে ঈশ্বরে আদৌ বিশ্বাস করা যায় কি না, সে প্রশ্ন তিনি তোলেন না। বরং এই কথাই বলেন যে, ওই বিচারবোধের বলেই মানুষ এক আদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী; বাকি সব ধাপ্পা। এই কারণেই ডীইজ়ম প্রায়-নাস্তিক, কিন্তু নাস্তিক নয়।

উপসংহার

লেন্তি-হারা ভগবানের এই বৃত্তান্তের সারসংক্ষেপ করে আমরা বলতে পারি, মানুষের ঈশ্বরভাবনার ইতিহাসে ডীইজ়মের ভূমিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্দিষ্ট যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে বৈপ্লবিকই বলা যায়। এর প্রবক্তারা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের যাবতীয় নোংরামির বিরুদ্ধে, আধুনিক বিজ্ঞান ও যুক্তিশীলতার আলোকে মানুষের সামাজিক ও নৈতিক কাঠামোকে নতুন করে গড়ে নেওয়ার লক্ষ্যে যে-লড়াই করেছেন তা অবিস্মরণীয়। এতদ্‌সত্ত্বেও, তাঁরা একমেবাদ্বিতীয়ম আদি ঈশ্বরে বিশ্বাসের কথা বলে, 'প্রাকৃতিক ধর্ম'-এর কথা বলে মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন। বহু বিজ্ঞানী ডীইজ়মের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। আমাদের দেশেও অক্ষয়কুমার দত্তের মতো বিজ্ঞানসচেতন মানুষ জীবনের প্রথম দিকে এই ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত পরে কার্যত নাস্তিক হয়ে গিয়েছিলেন। বস্তুত, ডীইজ়মে বিশ্বাস যেন নাস্তিকতারই আগের ধাপ। অতএব, দিদরো-র সেই বিখ্যাত বচনটিকে স্মরণ করে লেখা শেষ করি: ডীইস্ট্ হল সেই ব্যক্তি যে নাস্তিক হয়ে ওঠার আগেই মরে গেছে!

ঈশ্বর আছেন কি নেই, সেই প্রশ্ন

পিটার মেডাওয়ার[১]

(অনুবাদ)

বিজ্ঞানের দর্শনের ক্ষেত্রে ফ্রান্সিস বেকন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রেখেছেন। বেকন কিন্তু একজন নির্ভেজাল ঈশ্বরভক্ত মানুষ ছিলেন। তবে তাঁর মধ্যে এমন কিছু প্রবণতা ছিল, যার জন্য পাওলো রোসি তাঁকে বলেছিলেন, 'আধুনিক স্বপ্নে তাড়িত একজন মধ্যযুগীয় দার্শনিক'। বেকন তাঁর 'ধর্মবিশ্বাস ঘটিত স্বীকারোক্তি'তে বলেছিলেন, 'আমার বিশ্বাস, একমাত্র ঈশ্বরই অনাদি। তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম, শাশ্বত, সর্বশক্তিমান। তিনি বিচক্ষণ, স্বভাবতই মঙ্গলময়। কোনো প্রকৃতি নয়, কোনো পদার্থ নয়, কোনো আত্মা নয়, একমাত্র তিনিই ব্যক্তিগণের মধ্যে শাশ্বতরূপে পিতা, পুত্র ও আত্মারূপে বিরাজমান।'

হয়তো আত্মিক অন্ধতার প্রকোপে, কিংবা হয়তো কোনো কিছুর ঘাটতিজনিত রোগের দরুন আমি বেকনের ওই সরল ঈশ্বরবিশ্বাসে শামিল হতে পারি না। তবে এটুকু জানি, তাঁর ওই বিশ্বাসে অনেকেরই মন সায় দেয়। আমার নিজের ধারণাটা অবশ্য তা নয়— আমার মতে, আমরা বিশ্বাস

করি বলেই ঈশ্বর আছেন। এই ধরনের স্মার্ট সংক্ষিপ্ত বচনের প্রতি ন্যায্য কারণেই অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন। তা সত্ত্বেও আমি বলব, 'মানুষই ঈশ্বরকে গড়েছে তার নিজের আদলে'— পাষণ্ডোচিত এই রকমের বহু-পরিচিত ও লঘু বচনের মধ্যে আমার প্রতিপাদ্য যুক্তিটির ন্যায্যতা বহুকাল ধরেই প্রমাণিত হয়ে আসছে। এইবার আমার প্রতিপাদ্য যুক্তিটির অবতারণা করব।

পপার-এর 'তৃতীয় জগৎ' ও ঈশ্বর

মনের বিভিন্ন সৃষ্টিকে একসূত্রে গাঁথবার জন্য কার্ল পপার যে 'তৃতীয় জগৎ'-এ ধারণার প্রবর্তন করেন, তার মূল কথাটিকে আমি আমার 'প্লুটোজ় রিপাবলিক' বইতে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছিলাম:

পপারের মতে, মানুষ তিনটি স্বতন্ত্র বিশ্বে বাস করে, অথবা তিনটি স্বতন্ত্র বিশ্বের মোকাবিলা করে। প্রথমটি সাধারণ পদার্থের দ্বারা গঠিত বিশ্ব, বিভিন্ন ভৌত অবস্থার দ্বারা গঠিত বিশ্ব। দ্বিতীয়টি হল: মানসিক বিশ্ব, মনের বিভিন্ন অবস্থার দ্বারা গঠিত বিশ্ব। তৃতীয় বিশ্বটি হল (নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কেন তিনি আজকাল একে 'তৃতীয় বিশ্ব' না বলে 'বিশ্ব ৩' বলা পছন্দ করছেন) চিন্তার সম্ভাব্য ফসল বা প্রকৃতই বিদ্যমান ফসলের (objects) জগৎ— অর্থাৎ ধারণা, ভাবনা, তত্ত্ব, উপপাদ্য, যুক্তি আর ব্যাখ্যার জগৎ। বলতে পারি, এটি হল মনের যাবতীয় আসবাবের জগৎ। বস্তুময় জগতের সাধারণ সব জিনিসপত্র যেভাবে একে অপরের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটায়, এই তৃতীয় জগতের উপাদানগুলিও ঠিক তা-ই করে। যেমন, দুটো তত্ত্বের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে, তা থেকে জন্ম নেয় তৃতীয় কোনো তত্ত্ব। যেমন ভাগনার-এর সুররচনা স্ট্রাউস-কে প্রভাবিত করে; স্ট্রাউসের সুররচনা আবার পরবর্তী সব [পাশ্চাত্য—অনুবাদক] সঙ্গীতরচয়িতাকে প্রভাবিত করে। আবার দেখুন, যে কথাটা ভাবলে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়, আমরা মনের নানা ব্যাপার নিয়ে এমনভাবে কথাবার্তা বলি যেন কোনো 'জিনিসপত্র' সম্পর্কে কথা হচ্ছে: আমরা একটা যুক্তিকে 'ঠাহর' করি, একটা ভাবনাকে 'আঁকড়ে ধরি', সংখ্যা নিয়ে 'নাড়াচাড়া' করি— কেউ বিশেষজ্ঞের মতো, কেউ বা আনাড়ির মতো। মানুষের যা কিছু সম্বল আছে, তার মধ্যে মানবীয় ভাষার সঙ্গে নাড়ির বন্ধনে আবদ্ধ এই তিন নম্বর জগৎই বোধ হয় সবচেয়ে স্পষ্টভাবে মানবিক। পপার বিশেষ জোর দিয়ে বলেন, এই তৃতীয় জগৎটা মোটেই কাল্পনিক নয়, 'বাস্তবে' তার অস্তিত্ব রয়েছে। ওই জগৎ মানুষের মনেরই ফসল, অথচ তা বহুলাংশে স্বয়ংশাসিত।

নিজের ভাবনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পপার নিজে অবশ্য এই ব্যাপারটার ওপরেই বেশি জোর দিয়েছেন (*Objective Knowledge: An Evolutionary Approach,*

Oxford, 1972) যে তৃতীয় জগৎটা গঠিত হয়েছে তাত্ত্বিক সিস্টেম, যুক্তিতর্ক আর পরিস্থিতিভিত্তিক সমস্যা দ্বারা। আমি কিন্তু এই ব্যাপারটার ওপর অতটা জোর

ঈশ্বরকে ওই তৃতীয় জগতের উপাদান হিসেবে ধরে নিলে বলা যায়, মনের অন্যান্য ফসলেরই মতো তারও সমমাত্রায় একই রকম অবজেকটিভ বাস্তবতা আছে। ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে হলে তাঁকে স্তুতি ও বন্দনা করতে হয়, তাঁকে মেনে চলতে হয়, কিংবা তাঁর দ্বারা অন্য নানাভাবে প্রভাবিত হতে হয়। আমরা তাঁর মূর্তি গড়ি এবং ধরে নিই যে আমরা সেই আদলেই গড়া। যখন প্রার্থনা করি, তখন তাঁর সঙ্গে আমাদের কাল্পনিক কথাবার্তা চলে, আমরা তাঁর কাছ থেকে স্বস্তি ও উপদেশ চাই। সব শেষে, আমরা বিশ্বাস করি তিনিই হলেন কারক শক্তি— বস্তুত তিনিই সেই প্রথম আদি কারণ। ঈশ্বরের অবজেকটিভ অস্তিত্ব নির্ভর করছে তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাসেরই ওপর। সেই বিশ্বাস যদি না থাকে, তা হলে আমাদের বন্দনাও থেমে যাবে, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তাও আর চলবে না, আমরা তাঁকে আর প্রথম আদি কারণ বলেও গণ্য করতে পারব না।

অনেক লোকেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে মনের জোর ও শান্তি পায়। তাঁরা অনেকেই আমার প্রিয়, আমার শ্রদ্ধার পাত্র। তাই আমার নিজের এই ঈশ্বরবিশ্বাসহীনতা নিয়ে আমি আদৌ গর্ব বোধ করি না। মেকি বিশ্বাসের ভান করা অবশ্য আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ আমার ধাপ্পাবাজি নিমেষেই ধরা পড়ে যাবে। তবে আমি চাই আমার আচরণ হোক এমন, যাতে মানুষকে সাহায্য করা, সহৃদয়তা, প্রভৃতি যেসব গুণ থাকলে পৃথিবীটাকে আরেকটু ভালোভাবে চালানো যায়, সেগুলো যেন লোকে আমার মধ্যে দেখতে পায়। সেই অর্থে লোকে যেন আমাকে 'ধার্মিক' বলে মনে করে। তাই বলে, কোনো আচার অনুষ্ঠান পালন, কিংবা মিথ্যে বিশ্বাসের ভান আমি করতে পারব না। সংক্ষেপে, আমি সেই সব গুণেরই আধার হতে চাই, যাদের 'খ্রিস্টীয় গুণাবলি' বলা হয় বলে ইহুদিরা চটে যান, ন্যায্যতই চটে যান।

ঈশ্বরে এবং ধর্মীয় সাড়ায় আমার কোনো বিশ্বাস নেই। এর জন্য আমি মোটের ওপর দুঃখিত। কেননা, ঈশ্বরে বিশ্বাস করার জোরালো কোনো বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক কারণ যদি খুঁজে পাওয়া যেত বা প্রমাণ করা যেত, তা হলে অনেক মানুষের 'শুষ্ক হৃদয়ে' সন্তোষ আর শান্তির বারি বর্ষণ করা যেত।

অনেকে বলতে পারেন, যেহেতু আমি খুব নিভৃত ও নিশ্চিন্ত সারস্বত জীবন যাপন করেছি, তাই আমার জীবনে আত্মিক শান্তি আর সহায়তা লাভের প্রয়োজন অন্যদের মতো অত তীব্র হয়ে ওঠেনি; আমার জীবন অন্যদের মতো অস্থির বা অসুখী বা বিপদসঙ্কুল হলে পরিণতি অন্যরকম হত। কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। দু-দুবার আমি

মস্তিষ্ক-কোষের রক্তবাহের বৈকল্যজনিত অসুখে মরতে মরতে বেঁচে গেছি। তা সত্ত্বেও আমি যথাকালে একটু আধটু প্রায়শ্চিত্ত করার কথা ভাবি না'। আমার দুটো অঙ্গ নষ্ট হয়ে গেছে। তার জন্য আমি ঈশ্বরকে অভিশাপ দিইনি। তিনি যে আমার অন্য দুটো অঙ্গ নষ্ট করে দেননি, তার জন্যও তাঁকে ধন্যবাদ জানাইনি, তাঁর স্তুতিও করিনি। এই দুটো অসুখের সময়েই আমি কখনও ধর্মের কাছ থেকে কোনো শান্তি পাইনি, আমার একবারও মনে হয়নি যে, ঈশ্বর আমার দেখভাল করছেন। কবি উইলিয়াম আর্নেস্ট হেনলি[২] তাঁর এক বিখ্যাত কবিতায় নিজেকে আপন ভাগ্যের অধীশ্বর বলেছেন, এবং তার পরেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছেন এই অপরাজেয় আত্মার জন্যে। এরকম ভাবতে পারলে তো আমি অনেক শান্তি পেতাম। কিন্তু এরকম আমি ভাবতে পারি না। তা ছাড়া, হেনলির ওই কবিতাটা সাহিত্যের দিক থেকেও আমার পছন্দ নয়, আমার মনে হয় এ ধরনের বড় বড় কথা বলাটা বেশ যন্ত্রণাদায়ক। আমি খুব ভালো করেই জানি, কেউই আসলে অপরাজেয় নয়। ও সব কেবল ফাঁকা বোলচাল। আমি জানি, হেরে না যাওয়াটাই হল আসল ব্যাপার। আমি নিজেকে দৈব বিধানের শিকার, কিংবা ঈশ্বরের আশিসধন্য, কোনোটাই মনে করি না। আর, যত চেষ্টাই করি না কেন, কিছুতেই নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারি না যে, ঈশ্বর ছোট ছোট বাচ্চাদের মঙ্গলবিধানের ব্যাপারটা সেইভাবেই দেখাশোনা করেন, যেভাবে তা করা উচিত (অর্থাৎ যেভাবে স্নেহশীল বাবা-মা, কিংবা শিশুরোগ-বিশেষজ্ঞরা বা ইস্কুলের ভালো শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের দেখাশোনা করেন)। এটা বিশ্বাস করি না এই জন্যে যে, এরকম বিশ্বাসের কোনো কারণ নেই। (এই তো আমার গণ্ডগোল, কেবল কারণ খুঁজে মরি।)

বিচারবুদ্ধির সিংহাসনে তীব্র আর জোরালো মাত্রার খাঁটি ধর্মবিশ্বাসকে বসালে তার ফল ভয়ানক মারাত্মক হতে পারে। বিভিন্ন উপজাতির মধ্যকার শত্রুতাগুলোর মধ্যে একটা ভুয়ো আধ্যাত্মিক মাত্রা যোগ করতে পারে এই ধর্মীয় বিশ্বাস। যাদের 'লো কান্ট্রিজ়' বলা হয় সেই সব দেশে, কিংবা শ্রীলঙ্কায়, উত্তর আয়ার্ল্যান্ডে বা আফ্রিকার নানা জায়গায় ঠিক সেই জিনিসটাই দেখতে পাই। আর হিটলারের জার্মানিতেও তো আমরা তা-ই দেখেছি। সেখানে খাঁটি রক্ত আর 'দেশের মাটি'র দর্শন সুনিশ্চিত প্রত্যয় জাগিয়ে যেভাবে মানুষকে খেপিয়ে তুলেছিল, তা যে-কোনো ধর্মীয় উন্মাদনার চেয়ে বেশি বই কম নয়। ধর্মবিশ্বাসকে খাঁটি প্রমাণ করার জন্য যে ধরনের গভীর আবেগতপ্ত প্রত্যয়ের কথা বলা হয়, ওই দর্শনের সঙ্গে তার কোনো তফাত আছে কি?

যন্ত্রণাঘটিত দার্শনিক সমস্যার সমাধান করা যায়নি, যদিও লম্বাচওড়া ধর্মতাত্ত্বিক বাতেলার কুয়াশা তার অস্তিত্বকে প্রায় যেন ঢেকে রেখেছে। শুধু তা-ই নয়, কেবলই দুরকম কথা বলে বলে সবচেয়ে অপ্রীতিকর ওই সত্যটাকে চোখের আড়াল করবার

চেষ্টা করা হয়, এমন ভান করা হয় যেন সমস্যাটা আদপেই নেই। কোনো একটা ধর্মীয় সত্যে, কিংবা তারই সঙ্গী কোনো একটা কুসংস্কারগত আচার-পালনে আবেগতপ্ত, তীব্রগভীর প্রত্যয়ভরা বিশ্বাস থাকলেই আমরা চাইব যাতে অন্যেরাও সেই বিশ্বাসে শামিল হয়। আর, কোনো একটা ধর্মীয় সত্যকে সবার কাছে গ্রহণীয় করে তোলার নিশ্চিত পথ তো একটাই— সেই সত্যে অবিশ্বাসীদের খতম করা। অল্প দু-চারজন লোকের আত্মিক সুখ আর স্বস্তি আনবার জন্য মানবজাতিকে এত বেশি রক্ত আর অশ্রুপাত করতে হয়েছে যে, তার পরে আর নৈতিকতার জমা-খরচ নেওয়ার কোনো দাবি ধর্মের থাকতে পারে না। 'নৈতিকতার জমা-খরচ নেওয়ার দাবি' বলতে আমি বলতে চাইছি, অমুক অমুক কাজ খারাপ বা ভালো, কিংবা অমুক লোক ভালো আর অমুক লোক খারাপ, এই ধরনের বিচার করার অধিকার।

আমি একজন যুক্তিবাদী। মানছি, কথাটা বড্ড সেকেলে। তবে সচরাচর নিজের যুক্তিবাদী পরিচয়টাকে ঘোষণা করতে দ্বিধাবোধ করি। কারণ যেকোনো দার্শনিক আলোচনায় কোনটা *আবশ্যিক* আর কোনটা *যথেষ্ট*, তার সীমারেখা স্পষ্ট করে টেনে নেওয়া উচিত। কিন্তু এই সীমারেখাটা নিয়ে হয় প্রচুর ভুল-বোঝাবুঝি আছে, কিংবা সেটাকে অগ্রাহ্য করা হয়। আমি এ কথা মনে করি না— মনে করলে হাসি পায়— যে, আমাদের অবস্থাকে ব্যাখ্যা করবার জন্য, বা প্রয়োজনে সে অবস্থাকে বদলানোর জন্য, নিছক যুক্তিবিচারই *যথেষ্ট*। কিন্তু এ কথা অবশ্যই বিশ্বাস করি যে, যুক্তিবিচার সর্ব অবস্থাতেই *আবশ্যিক*। এর কোনো ব্যত্যয় হতে পারে না। এই সত্য বিস্মৃত হলে আমাদের সর্বনাশ। আমি এবং আমার মতো অনেকেরই বিশ্বাস, এই পৃথিবীটাকে বাসের পক্ষে আর একটু বেশি উপযোগী করে তোলা সম্ভব, এমনকি হয়তো তা এরই মধ্যে আগের চেয়ে বেশি বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। এই উন্নতির পেছনে একটা কর্ম-উদ্যোগ কাজ করছে: তার নাম প্রকৃতি-বিষয়ক বিজ্ঞান। সে-উদ্যোগের মধ্যে অনেক খামতি আছে, সে কথা মেনে নিয়েও বলব, ওই উন্নতির পেছনে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে। আমি এবং আমার সহযাত্রী বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে অসীম গর্ব অনুভব করি। এ কথা ঠিক, মানুষ কোথা থেকে এল, কেন এল, কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, এ সব আদি এবং অন্তিম প্রশ্নের উত্তর বোধহয় আমরা কোনোদিনই দিতে পারব না, যদিও এই প্রশ্নগুলোই ছিল আমার এই ছোটো প্রবন্ধের আলোচ্য। কিন্তু এটুকু অন্তত আমরা জানি যে, এর পরে কী ঘটতে চলেছে, সে ব্যাপারে ব্যক্তি হিসেবে কিংবা রাজনৈতিক মানুষ হিসেবে আমাদের বক্তব্যের একটা ওজন আছে। আমাদের গন্তব্যস্থল তো সেইটাই যেটা আমরা নিজেরা ঠিক করব। এ ছাড়া, আর কী হতে পারে?

ব্যাপারটা যে এইরকমই, তা আশাবাদী স্বভাবের লোকদের শক্তি জোগায়, একটা সৎ আর সম্মানজনক উচ্চাশা লালন করবার তেজ জোগায়। আদি এবং

অন্তিম প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের অক্ষমতা থেকে একটা গ্লানি জন্ম নিতে পারে। এই গ্লানি কাটানোর একটা টোটকা অবশ্য সাধারণ লোকেরা বহুদিন ধরে প্রয়োগ করে আসছে। সে-টোটকাটা বাতলেছিলেন ভলতেয়ার। তিনি বলেছিলেন: 'নিজেদের বাগানটা নিজেদেরই চাষ করতে হবে।'

ওপরের বচনাটি তাঁর *The Strange Case of the Spotted Mice* (শার্লক হোম্স স্মরণীয়!) গ্রন্থের অন্তর্গত The Question of the Existence of God প্রবন্ধের অনুবাদ।

বাবো বছব বয়সে ইংবেজ কবি-সমালোচক উইলিয়াম আর্নেস্ট হেন্‌লির (১৮৪৯-১৯০৩) হাড়ে টিবি হয়। স্থূল পদ্ধতিতে চিকিৎসা করায় তাঁর পা হাঁটুর নীচ থেকে কেটে বাদ দিতে হয়। সেখানেই শেষ নয়, চিকিৎসকরা জানান, তাঁব প্রাণ বাঁচানোর একমাত্র পন্থা হল অন্য পা-টিও কেটে বাদ দেওয়া। চিকিৎসকদের এই নির্ণয় তিনি অসীম মনোবল নিয়ে সহ্য করেন। অতঃপর জোসেফ লিস্টাব-এর প্রবর্তিত শল্যচিকিৎসার সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে তাঁর পা কেটে বাদ দেওয়া হয় এবং তাঁব প্রাণ রক্ষা পায়। ১৮৭৫ সালে তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওযা হয। তার পর প্রায় তিরিশ বছর তিনি সক্রিয় লেখক-জীবন যাপন করেন।

মেডাওয়ার এখানে তাঁব যে-কবিতাটিব উল্লেখ করেছেন, সেটি ১৮৭৫ সালে রচিত তাঁব অন্যতম জনপ্রিয় কবিতা Invictus (অপরাজিত).

Out of the night that covers me,
Black as the Pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
For my unconquerable soul.
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeonings of chance
My head is bloody, but unbowed
Beyond this place of wrath and tears
Looms but the Horror of the shade,
And yet the menace of the years
Finds, and shall find me, unafraid
It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate·
I am the captain of my soul.

[ভাবানুবাদ: ঘনতমিস্র এই রাত্রির আচ্ছাদন ভেদ করে আমি যেখানে যত দেবতা আছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাই আমাকে এই অপরাজেয় আত্মার অধিকারী করার জন্য। দুঃসহ দুরবস্থাব মাঝে আমি কুঁকড়ে যাইনি, কেঁদে বুক ভাসাইনি। ভাগ্যের লগুড়াঘাতে আমার মস্তক রক্তাক্ত, তথাপি অনবনত। জানি, ভয়ানক কোপ আর অশ্রুমাখা এই স্থান পার হয়ে যেখানে যাব, সেখানে শুধুই নরকেব ঘোর আতঙ্ক। তথাপি, বর্ষের পর বর্ষ ধরে আমি অভীত হয়ে আছি, অভীতই থাকব। দুয়ার যত সঙ্কীর্ণই হোক, ভাগ্যপত্রে যত শাস্তিই বিহিত থাকুক, কিছু আসে যায় না: আমিই আমার ভাগ্যের নিয়ন্তা, আমিই আমার আত্মাতরীব চালক।]

রবীন্দ্রনাথের 'জগৎ': কাছের পক্ষ, দূরের পক্ষ

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কিংবা ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতো বিজ্ঞান-দর্শন রবীন্দ্রনাথের সাভিনিবেশ চর্চার বিষয় ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞান-অনুপ্রাণিত একজন আধুনিক কবি হিসেবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে তিনি ও বিষয়ে অতি মূল্যবান কিছু ভাবনার নিদর্শন রেখে গেছেন। সেগুলো কোনো বিজ্ঞান-দর্শন বিশারদের লেখা সন্দর্ভ নয়, নেহাতই ভারতবর্ষ নামক এক ব্রিটিশ উপনিবেশের একজন বাঙালি কবির বিজ্ঞান-দর্শন ভাবনা। সেখানেই তার গুরুত্ব। সেগুলো অনুধাবন করলে বিজ্ঞান-দর্শন বিষয়ে আমাদের জ্ঞান কতটা বাড়বে জানি না, কিন্তু বিশ শতকের বিজ্ঞান উদ্বেলিত জগতের একজন ঔপনিবেশিক প্রান্তবাসী বিশ্বনাগরিক কবির দার্শনিক দ্বন্দ্ব, সীমাবদ্ধতা ও দায়বদ্ধতাগুলো আরো ভালোভাবে বুঝতে পারব। এ প্রবন্ধের প্রধান অনুপ্রেরণা সেটাই।

পটভূমি

বিজ্ঞান-দর্শন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাচিন্তাকে মোটামুটি তিনটে ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ভাগটাকে বোঝার জন্য ১৯১৪ সালে সবুজপত্রে প্রকাশিত 'আমার জগৎ' প্রবন্ধটিকে নিবিড়ভাবে অণু-পাঠ করার চেষ্টা করব। পাঠের প্রক্রিয়ায় এগিয়ে-পিছিয়ে অন্য নানা পার্শ্ব-প্রসঙ্গও উঠবে, সেগুলোকে অবান্তর বলে এড়িয়ে যাব না।

'আমার জগৎ' প্রকাশিত হয়েছিল সবুজপত্রের আশ্বিন ১৩২১ সংখ্যায় (ওই একই সংখ্যায় বেরিয়েছিল তাঁর 'শেষের রাত্রি' গল্প)। এ প্রবন্ধ লেখার পিছনে কোনো বিশেষ উপলক্ষ কাজ করেছিল কি? জানতে পারিনি। তবে সাধারণভাবে সবুজপত্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্রবের পরিপ্রেক্ষিতে, এবং ওই বিশেষ কালপর্বে তাঁর ভাবনাচিন্তার প্রবাহ যে-খাতে বাঁক নিয়েছিল তার নিরিখে, এ বিষয়ে কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে।

সবুজপত্র প্রথম সংখ্যা বেরোয় ২৫ বৈশাখ ১৩২১ (মে, ১৯১৪)। পত্রিকার 'মুখপত্রে' সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী লেখেন: 'ইউরোপ আমাদের মনকে নিত্য যে ঝাঁকুনি দিচ্ছে, তাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। ইউরোপের দর্শন মনের গায়ে হাত বুলোয় না, কিন্তু ধাক্কা মারে। ইউরোপের সভ্যতা অমৃতই হোক মদিরাই হোক আর হলাহলই হোক, তার ধর্মই হচ্ছে মনকে উত্তেজিত করা, স্থির থাকতে দেওয়া নয়।' অনুক্ত কথাটি এই যে 'ভারতীয়' দর্শন, বিশেষ করে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদী দর্শন, 'মনের গায়ে হাত বুলিয়ে' মনকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে, সংশয়কে নিরস্ত করে। প্রশান্তকুমার পাল এই সম্পাদকীয়টি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'বোঝা যায়, পত্রিকা প্রকাশের পূর্বে নানাবিধ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথই এই লক্ষ্য প্রমথ চৌধুরীর সামনে তুলে ধরেছিলেন।' এর অল্পকাল আগে রবীন্দ্রনাথ ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা ঘুরে এসেছেন। সেখানকার সেরা ভাবুকগোষ্ঠীর সংসর্গ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বদৃষ্টিকে 'আরও ব্যাপক ও গভীরতর হতে সাহায্য করেছিল।'[১] কৃষ্ণ কৃপালনির মতে, বিশ শতকের প্রথম দিকে প্রাচীন ভারতের ভাববাদী দর্শনের প্রতি যে-প্রশ্নহীন আনুগত্য তাঁকে সাময়িকভাবে পেয়ে বসেছিল, তা এই সংসর্গে এসে কেটে গেল। অগ্রগামী জীবনের প্রতি তাঁর 'পুরুষোচিত বিশ্বাস,' নতুন নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে অবাধ লেনদেনের মারফত মনের সমৃদ্ধি অর্জনের অবিরাম আকৃতি আবার পূর্ণ মাত্রায় জাগ্রত হল। 'Henceforth, he was more a world-citizen than an Indian. He was a world-citizen not because he became world-famous but because he felt with the world.'[২] জগৎ ও জীবনকে প্রাচীন ভারতীয় তপোবন আদর্শে, এমনকী বর্ণাশ্রমিক ছাঁচে ঢেলে বিচার করার যে-ঘোর তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল বিংশ

শতকের গোড়ার দিকে, যার পিছনে অনেকটাই ছিল দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব,[৩] তা কেটে গেল। নতুন এক বিজ্ঞান-স্নাত খোলা মন নিয়ে বেরিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ। ঔপনিষদিক আধ্যাত্মিকতাও এক নতুন বিশ্বজনীন, সংশয়বাদী বর্ণে প্রতিভাত হল তাঁর সামনে। সবুজপত্রে প্রকাশিত 'আমার জগৎ' রবীন্দ্রনাথের মনের সেই নিজস্ব নবজাগরণ প্রক্রিয়ায় এক বিশেষ দিক্‌চিহ্ন।

১৯১৪ সালে লেখা প্রবন্ধটি ১৯১৬ সালে প্রকাশিত 'সঞ্চয়' বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। বইটি 'শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের নামে' উৎসর্গ করা হয়েছিল। প্রাসঙ্গিক তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য এই যে, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অমর গ্রন্থ *The Positive Sciences of the Ancient Hindus* (সম্প্রতি সাহিত্য সংসদ কর্তৃক পুনঃ-প্রকাশিত) প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৫ সালে। তার আগেই অবশ্য শীল মহাশয়ের ওই বইয়ের কিছু অংশ প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের *History of Hindu Chemistry*-র দ্বিতীয় খণ্ডের (১৯০৯) অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

'সঞ্চয়' বইটিতে ১৯১১ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে লেখা মোট সাতটি প্রবন্ধ আছে। প্রত্যেকটি প্রবন্ধের মধ্যেই ধুয়োর মতো ফিরে ফিরে এসেছে বিজ্ঞানের নিরিখে সমাজকে, ধর্মকে, মনুষ্যত্বকে বাজিয়ে নেওয়ার প্রসঙ্গ। ১৯১১ সালে লেখা 'রূপ ও অরূপ' প্রবন্ধটি শুরুই হচ্ছে এইভাবে: 'জগৎ বলিয়া আমরা যাহা জানিতেছি সেই জানাটাকে আমাদের দেশে মায়া বলে। বস্তুত তাহার মধ্যে যে একটা মায়ার ভাব আছে তাহা কেবল তত্ত্বজ্ঞান বলে না, আধুনিক বিজ্ঞানও বলিয়া থাকে। কোনো জিনিস বস্তুত স্থির নাই, তাহার সমস্ত অণু পরমাণু নিয়ত কম্পমান অথচ জানিবার বেলায় এবং ব্যবহারকালে তাহাকেই স্থির বলিয়া জানিতেছি। নিবিড়তম বস্তুও জালের মতো ছিদ্রবিশিষ্ট অথচ জানিবার বেলায় তাহাকে আমরা অছিদ্র বলিয়াই জানি।' একই সালে লেখা 'ধর্মের নবযুগ' প্রবন্ধে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সঙ্কীর্ণতার বিপরীতে মনুষ্যত্বের বিশ্বজনীনতার প্রসঙ্গটি প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তিনি লেখেন: 'এই বৃহৎ বিশ্বগোষ্ঠীর গোপন কুলজিখানি সন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে তখনই ধরা পড়িয়া যায় যে যিনি নিজেকে যত বড়ো কুলীন বলিয়াই মনে করুন না কেন গোত্র সকলেরই এক। এইজন্য বিশ্বের বাজারে কোনো একটি কিছুর তত্ত্ব সত্য করিয়া জানিতে গেলে সবকটির সঙ্গে তাহাকে বাজাইয়া দেখিতে হয়। বিজ্ঞান সেই উপায় ধরিয়া সত্যের পরখ করিতে লাগিয়া গেছে।'

এই পর্যায়েরই শেষ লেখা 'আমার জগৎ'। পড়া শুরু করা মাত্র বোঝা যায়, এর জাত আলাদা। বোঝা যায়, মনের মধ্যে একটা প্রক্রিয়া চলছিল, সেটা এবার পরিণতিতে পৌঁছল। সেটা কেবল এর কাব্যশ্রী-মণ্ডিত চলতি গদ্যেই নয়, এর বৈজ্ঞানিক আত্মস্থতার সুরে, এমনকী কলহপ্রিয়তার মেজাজের মধ্যেও ধরা পড়ে।

কৃপালনি যে 'পুরুষোচিত বিশ্বাসের' (নারীবাদীরা ক্ষমা করবেন) কথা বলেছেন তা এই প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। 'সঞ্চয়'-এর অন্য প্রবন্ধগুলি ভালো অর্থে সারবান; 'আমার জগৎ' প্রজ্ঞাবান। তাই তার প্রকাশ এমন সুমধুর।

প্রবন্ধটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র-শতবার্ষিক রচনাবলীর বারো নম্বর খণ্ডের ৫৫৯ থেকে ৫৬৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে। বর্তমান লেখায় ওই পাঠই অনুসরণ করা হয়েছে।

এক

লেখাটি শুরু হয়েছে সহজ এক গদ্যকবিতার ঢঙে, যাকে অনায়াসেই 'লিপিকা'র একটি লাইন বলে চালিয়ে দেওয়া যায়:

> পৃথিবীর রাত্রিটি যেন তার এলোচুল, পিঠ-ছাপিয়ে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নেমে পড়েছে।

কিন্তু পরের লাইনেই টের পাই, রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে বসেননি। রাত্রি কেবল পৃথিবীরই এলোচুল: প্রকৃতির নয়, শুধু পৃথিবীরই; সৌরজগতের মধ্যে পৃথিবীর স্থানটি নির্দিষ্ট কিন্তু ক্ষুদ্র, অকিঞ্চিৎকর, এই কথাটা জানিয়ে দেন তিনি—

> কিন্তু সৌরজগৎলক্ষ্মীর শুভ্রললাটে একটি কৃষ্ণতিলও সে নয়। ঐ তারাগুলির মধ্যে যে-খুশি সেই আপন শাড়ির একটি খুট দিয়ে এই কালিমার কণাটুকু মুছে নিলেও তার আঁচলে যেটুকু দাগ লাগবে তা অতি বড়ো নিন্দুকের চোখেও পড়বে না।

খুবই কাব্যময় এই কটি পঙ্‌ক্তির আধারে রবীন্দ্রনাথ যেটা বলতে চাইছেন সেটা কিন্তু রীতিমতো ওজনদার এক ধারণা। রাত্রি শুধু পৃথিবীরই। পৃথিবীর বাইরে, যেখানে 'সৌরজগৎলক্ষ্মীর' রাজত্ব, সেখানে ওই রাত্রির আলাদা কোনো দ্যোতনা নেই, থাকলেও তা অতি নগণ্য। অথচ ওই পৃথিবীতেই থাকে মানুষ, যার ভালো নাম হোমো সেপিয়েন্স। সেই প্রাণীটির ইন্দ্রিয় ও মন দিয়ে দেখা জগতের সঙ্গে সৌরজগতের, কিংবা সৌরজগৎ-অতিক্রান্ত বিশ্বের ব্যাপ্ত-সুদূর বাস্তবতার সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সে-সম্পর্ক একমাত্রিক নয়, দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ নয়। এখানে প্রশ্নটা বিশ্বজগতের বাস্তবতা নিয়ে নয়; প্রশ্ন এই যে, বিশ্বজগৎ সম্পর্কে মানুষ যে-অবধারণা (পারসেপ্‌শন) গঠন করে তা কতদূর অবজেকটিভ? এই প্রশ্নের সূচনা করছেন তিনি, নেহাতই খেলাচ্ছলে, সহজ কয়েকটি উপমার আশ্রয়ে:

> এ যেন আলোক মায়ের কোলের কালো শিশু সবে জন্ম নিয়েছে। লক্ষ লক্ষ তারা অনিমেষে তার এই ধরণী-দোলার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে। তারা একটু নড়ে না পাছে ঘুম ভেঙে যায়।

তারারা নড়ে না, এটা তো নেহাত চোখে-দেখা, অর্থাৎ একমাত্রিক উপরি-বাস্তবতা। আসল ঘটনাটা যে ঠিক তার বিপরীত তা রবীন্দ্রনাথ জানেন। ১৯০৫ সালেই আইনস্টাইনের বিশেষ অর্থাৎ সীমিত আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বেরিয়ে গেছে। তা নিয়ে অ-বিশেষজ্ঞ মহলেও তখন বিস্তর লেখালিখি হচ্ছে। গতি কম/গতি বেশি, নিকট/দূর, সমতল/বক্র এই সবের অবধারণা যে পরম নয়, আপেক্ষিক, আইনস্টাইনের কল্যাণে এই আশ্চর্য কথাটা ক্রমে ক্রমে মানুষের মনে ঠাঁই করে নিচ্ছে। জে ডি বার্নালের ব্যাখ্যা: 'উনিশ শতকী পদার্থবিদ্যার একটি শাখায় যেসব গরমিল দেখা গিয়েছিল, সেখান থেকেই আইনস্টাইনের ভাবনার শুরু। আলোকের তড়িৎচুম্বক তত্ত্বের সাধারণীকরণ ঘটাবার প্রয়াসে প্রমাণ করার চেষ্টা চলে যে, তথাকথিত স্থির ঈথর-মাধ্যমে কোনো পর্যবেক্ষকের চলন-হারের ওপরেই আলোকের আপাত-গতিবেগ নির্ভরশীল।' সেই প্রয়াসেরই অঙ্গস্বরূপ ঘটানো হয় সেই 'সুবিখ্যাত মাইকেলসন-মার্লি পরীক্ষা— যা বিজ্ঞান-ইতিহাসের মহত্তম নঞর্থক পরীক্ষা। নঞর্থক, কারণ ওই পরীক্ষা থেকেই প্রমাণ হয়ে গেল, আলোকের গতিবেগ পর্যবেক্ষকের গতি বা গতিমুখের ওপর কোনোভাবেই নির্ভর করে না।' অর্থাৎ যা প্রমাণ করার জন্য ওই পরীক্ষার আয়োজন করা হল, ঠিক তার উলটো জিনিসটা প্রমাণিত হল: জানা গেল, আলোকের গতিবেগ অন্য-নিরপেক্ষ, অনতিক্রম্য। অন্য এক মহলে, এও দেখা গেল যে 'উচ্চগতিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে ইলেকট্রনেরা যে-গতিতে চলে, স্বীকৃত নিউটনীয় পদার্থবিদ্যা অনুযায়ী তাদের সে-গতিতে চলার কথা নয়, যত তাদের গতি বাড়ে ততই যেন তারা অলস হয়ে ওঠে, তাদের গতি বাড়ানো ততই যেন কঠিন হয়ে পড়ে। এই দুটি ব্যাপারেরই ব্যাখ্যা মিলল আইনস্টাইনের বিশেষ (১৯০৫) আপেক্ষিকতা তত্ত্বে।' এত কথা রবীন্দ্রনাথ সেই সময় জানতেন, মনে হয় না। কিন্তু সদ্য-ইউরোপ ও আমেরিকা-প্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথ, যিনি জগদীশচন্দ্র বসুর মননসঙ্গী, তিনি বিজ্ঞানের জগতের এইসব যুগান্তকারী ভাবনার দার্শনিক তাৎপর্যটুকু সম্বন্ধে মোটের ওপর অবহিত ছিলেন এরকম অনুমান নিশ্চয়ই সঙ্গত। সব মিলিয়ে প্রকৃতিকে বোঝবার চেনাজানা পথগুলো যে বদলে যাচ্ছে, সেটা তিনি অবশ্যই জানতেন।

সুতরাং, নিছক চোখে-দেখা পর্যবেক্ষণ ও তার বিশ্লেষণ, যার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল বনেদি নিউটনীয় পদার্থবিদ্যা, তা যে আসল বাস্তবতার হদিশ না-ও দিতে পারে, সেই বিপরীত প্রসঙ্গটা টেনে আনবার উপলক্ষ হিসেবেই রবীন্দ্রনাথ তারারা 'একটু নড়ে না' কথাগুলো ব্যবহার করছেন। ওই কথা শুনে:

> আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুর আর সইল না। তিনি বললেন, তুমি কোন্ সাবেক কালের ওয়েটিং রুমের আরাম-কেদারায় পড়ে নিদ্রা দিচ্ছ ওদিকে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের রেলগাড়িটা যে বাঁশি বাজিয়ে ছুট দিয়েছে। তারাগুলো নড়ে না এটা তোমার কেমন কথা? একেবারে নিছক কবিত্ব!

'নিছক কবিত্ব' বলে বিদ্রূপ করলে কোনো কবির মাথা ঠাণ্ডা থাকতে পারে। কবি তাই কোমর বেঁধে জুতসই উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরি হলেন। তখনও তাঁর ধারণা, বিজ্ঞান আর কাব্যের বৈসাদৃশ্য বুঝি অনপনেয়: যা বিজ্ঞান তা কাব্য হতে পারে না, এবং ভাইসি ভার্সা। কিছুকাল পরে তিনি এ ধারণা একেবারে পরিত্যাগ করবেন, সে-প্রসঙ্গ নিয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি। কিন্তু এখানে, এই ১৯১৪ সালের প্রবন্ধে, বিজ্ঞান আর কবিতার সহাবস্থান অবাস্তব, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি তাঁর কাল্পনিক বৈজ্ঞানিক বন্ধুর সঙ্গে শৌখিন যুদ্ধে নামলেন। 'নিছক কবিত্ব' বলে হেনস্থা করার শোধ তুলতে গেলেন।

> আমার বলবার ইচ্ছা ছিল, তারাগুলো যে নড়ে এটা তোমার নিছক বৈজ্ঞানিকত্ব।

কিন্তু পরমুহূর্তেই পিছিয়ে এলেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতির হার এবং যুগের হাওয়া, যা তখন আইনস্টাইনের দিক থেকে বইছে, সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত, তাই পরের লাইনে নিজের মন্তব্য প্রায় গিলে নিয়ে বলেন:

> কিন্তু সময় এমনি খারাপ ওটা জয়ধ্বনির মতোই শোনাবে।

'নিছক বৈজ্ঞানিকত্ব'র কদর ১৯১৪ সালে, অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, নিছক কবিত্বের চেয়ে অনেক বেশি ছিল— অন্তত রবীন্দ্রনাথ তাই মনে করতেন। বিজ্ঞান বড়জোর কাব্যের পিঠ চাপড়ে সস্নেহ প্রশ্রয় দিতে পারে, কিন্তু তথাকথিত অবজেকটিভ সত্যের অঙ্গনে কাব্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ:

> *এই কবিত্বের কালিমা পৃথিবীর রাত্রিটুকুরই মতো। এর শিয়রের কাছে বিজ্ঞানের জগজ্জয়ী আলো দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু সে এর গায়ে হাত তোলে না। স্নেহ করে বলে, আহা স্বপ্ন দেখুক।*

বিজ্ঞান নাকি স্বপ্ন দেখে না, বিজ্ঞান নাকি শুধু বাস্তব দেখে, বিজ্ঞানে নাকি কল্পনার ঠাঁই নেই। বিজ্ঞানের কারবার অবজেকটিভিটি নিয়ে। কৃষ্ণতিল-টিলের উপমা তার কাছে নাকি বড়জোর করুণার বিষয়। ১৯১৪ সালে মানুষের সংস্কৃতির দ্বিখণ্ডন এতটাই গভীরে চলে গিয়েছিল বলে মনে করছেন রবীন্দ্রনাথ।

মনে করছেন, কিন্তু মেনে নিচ্ছেন না। তিনি কবিতার পক্ষ নিয়ে, বরং বলা যাক দ্রষ্টাসাপেক্ষ অনুভূতির পক্ষ নিয়ে দ্রষ্টানিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিকতার সঙ্গে এক ছদ্ম-তর্কযুদ্ধের অবতারণা করেন:

আমার কথাটা হচ্ছে, স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি তারাগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। এর উপরে তো কথা চলে না। বিজ্ঞান বলে তুমি অত্যন্ত বেশি দূরে আছ বলেই দেখছ তারাগুলো স্থির। কিন্তু সেটা সত্য নয়। আমি বলি, তুমি অত্যন্ত বেশি কাছে উঁকি মারছ বলেই বলছ ওরা চলছে। কিন্তু সেটা সত্য নয়। বিজ্ঞান চোখ পাকিয়ে বলে, সে কেমন কথা?

আমিও চোখ পাকিয়ে জবাব দিই, কাছের পক্ষ নিয়ে তুমি যদি দূরকে গাল দিতে পার তবে দূরের পক্ষ নিয়ে আমিই বা কাছকে গাল দেব না কেন?

কাছের পক্ষ বলতে দ্রষ্টানিরপেক্ষ, অবজেকটিভ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পক্ষ, আর দূরের পক্ষ বলতে দ্রষ্টাসাপেক্ষ, সাবজেকটিভ উপলব্ধির পক্ষ:

বিজ্ঞান বলে, যখন দুই পক্ষ একেবারে উলটো কথা বলে, তখন ওদের মধ্যে এক পক্ষকেই মানতে হয়।

এইবার রবীন্দ্রনাথ একটি মোক্ষম যুক্তির অবতারণা করেন। বিজ্ঞান নিজেই কি সত্য নিরূপণের ব্যাপারে দ্বৈত-মান প্রয়োগ করে না? কখনও খণ্ডাংশবাদী রিডাক্শনিজ়ম, কখনও পূর্ণাত্মক সমগ্রতাবাদী হোলিজ়ম, এই দুই পথ ধরেই কি বিজ্ঞান এগোয় না?—

পৃথিবীকে গোলাকার বলবার বেলায় তুমি অনায়াসে দূরের দোহাই পাড়। তখন বল, কাছে আছি বলেই পৃথিবীকে সমতল বলে ভ্রম হয়। তখন তোমার তর্ক এই যে কাছে থেকে কেবল অংশকে দেখা যায়, দূরে না দাঁড়ালে সমগ্রকে দেখা যায় না।

বিজ্ঞানের এই দেখাটায় 'সায় দিতে রাজি' রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর প্রশ্ন:

দূরকে যদি এতটা খাতিরই কর তবে কোন্ মুখে বলবে, তারাগুলো ছুটোছুটি করে মরছে?

রিডাক্শনিজ়ম-হোলিজ়মের এই দ্বন্দ্বকে আরো স্পষ্ট করে মেলে ধরেন তিনি:

আমরা যখন সমস্ত তারাকে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযোগে মিলিয়ে দেখছি তখন দেখছি তারা অবিচলিত স্থির।... জ্যোতির্বিদ্যা যখন এই সম্বন্ধসূত্রকে বিচ্ছিন্ন করে কোনো তারাকে দেখে যখন দেখতে পায় সে চলছে...। এখন মুশকিল এই, বিশ্বাস করি কাকে?

সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে না-দেখলে কোনো বস্তু সম্বন্ধে তথ্য জানা যাবে না; আবার বিচ্ছিন্ন করে দেখে যেসব তথ্য পাচ্ছি, সেগুলোকে সমগ্রে অন্বিত করতে গেলেই তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব বদলে যাবে; ফলত বাস্তবতা সম্বন্ধে আমাদের যে-ধারণা জন্মাবে, সেটাও আপেক্ষিক হয়ে পড়বে। ভুল অবধারণা আর 'সঠিক' জ্ঞানের মধ্যে যে তফাত সেই প্রশ্ন এইবার তুললেন রবীন্দ্রনাথ, চলে এলেন সংশয়ের জগতে:

> সমস্ত পৃথিবী বলছে আমি গোলাকার, কিন্তু আমার পায়ের তলার মাটি বলছে আমি সমতল। পায়ের তলার মাটির জোর বেশি, কেননা সে যেটুকু বলে সে একেবারে তন্ন তন্ন করে বলে। পায়ের তলার মাটির কাছ থেকে পাই তথ্য, অর্থাৎ কেবল তথাকার খবর; বিশ্বপৃথিবীর কাছ থেকে পাই সত্য, অর্থাৎ সমস্তটার খবর।

সুতরাং, 'যখন দুই পক্ষ একেবারে উলটো কথা বলে, তখন ওদের মধ্যে এক পক্ষকেই মানতে হয়'—এই যুক্তি খণ্ডন করে রবীন্দ্রনাথ বলেন, তন্ন তন্ন করে পাওয়া 'তথাকার খবর'কে, অর্থাৎ তথ্যকে যখন সমগ্রের সঙ্গে মিলিয়ে নিই, তখনই পাই সত্য। খবর আর সত্যকে, উপাত্ত আর তত্ত্বকে আলাদা করেন তিনি। পরে আমরা দেখব, এই জিনিসটাকেই ভিন্ন এক প্রেক্ষিতে তিনি সীমা আর অসীমের দ্বন্দ্বমিলন বলে চিহ্নিত করছেন। কিন্তু তিনি একথাও বলেন, 'আমাদের যে দুইই চাই।' কেজো দৈনন্দিনতার বিচারে 'তথ্য' আমাদের চাইই চাই, নইলে 'কাজকর্ম বন্ধ।' আবার 'সত্য না হলেও আমাদের পরিত্রাণ নেই।' তাঁর প্রস্তাবিত সিন্থেসিস এইরকম—

> অতএব যদি বলা যায়, আমার দূরের ক্ষেত্রে তারা স্থির আছে, আর আমার নিকটের ক্ষেত্রে তারা দৌড়চ্ছে তাতে দোষ কী?

এখানে দেখবার জিনিস হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু একবারও শঙ্করাচার্য কিংবা জর্জ বার্ক্‌লির ঢঙে তারাগুলো আছে কি না, সে প্রশ্ন তুলছেন না। তারাদের বাস্তব অস্তিত্ব নিয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর প্রশ্ন কেবল এই যে, তারাদের ধর্ম সম্বন্ধে মানুষ— কিংবা আরো নির্দিষ্টভাবে বললে, এম্পিরিসিস্ট বিজ্ঞান— যে সব 'ধারণা' গঠন করছে, সেগুলো কি ওই বিশেষ অর্থে 'সত্য'? আরো একটু সহজভাবে বললে, একটা বিশেষ পর্যায়ের বিজ্ঞান তার স্বীকৃত পদ্ধতিতন্ত্র অনুসারে বাস্তবতা সম্বন্ধে যে-ধারণা গঠন করে দিচ্ছে, সেটি ছাড়া অন্য সব ধারণা কি বাতিল? একটা বস্তু সম্বন্ধে মানুষের মনে বিভিন্ন স্তরের উপলব্ধি কি জাগতে পারে না? সেইসব উপলব্ধির সবগুলোই কী ব্যক্তিমানুষের মনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে সত্যি হতে পারে না?

পজ়িটিভিস্ট্‌দের সঙ্গে বাস্তবতাবাদীদের যে-বিতর্ক, এর মধ্যে তারই একটু অন্য রূপ দেখতে পাই। পজ়িটিভিস্ট্‌রা শুধু তথাকার খবর, অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ-লব্ধ তথ্যের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে যত্নবান। ওই কারণেই কাউফমান নিখুঁত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরেও ইলেকট্রন নামক কোনো বস্তুসত্তার অস্তিত্ব মানতে পারেননি; মাখ-এর মতো এত বড়ো বিজ্ঞানী পরমাণু নামক কোনো বস্তুসত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে পারেননি; কার্ল পিয়ার্সন জিন নামক কোনো বস্তুসত্তার অস্তিত্ব মানতে পারেননি। এঁরা সকলেই পরীক্ষালব্ধ পরিসংখ্যানকে কতকগুলি আঙ্কিক অনুপাত বলে মেনেছেন, পর্যবেক্ষণকে কতকগুলি বিবরণ ('খবর') বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু ওইসব খবর থেকে সাধারণীকরণের মারফত কোনো সামগ্রিক 'সত্যে' পৌঁছতে রাজি নন তাঁরা, কেননা সামগ্রিক সত্যকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, আর প্রত্যক্ষ নয় এমন কোনো কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করতে তাঁদের ঘোর আপত্তি। তাঁদের কেবলই ভয়, নির্ভেজাল তথ্যের ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে গিয়ে বস্তুসত্তা সম্বন্ধে সামগ্রিক ধারণা-গঠনের (যথা, ইলেকট্রন, পরমাণু, জিন) বড়ো অঙ্গনে গিয়ে পড়লেই তাঁরা শুদ্ধ বিজ্ঞানের আওতা থেকে বেরিয়ে অধরা এক মনোজগতের গহ্বরে পতিত হবেন, অধিবিদ্যার কবলে পড়বেন। আর তা হলেই বিজ্ঞানের ভরাডুবি।

দুই

দূরেও বটে, নিকটেও বটে

কিন্তু অধিবিদ্যাকে উপনিষদ-লালিত রবীন্দ্রনাথ ভয় পাবেন কেন, বরং তিনি তো অধিবিদ্যার সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক গড়তেই আগ্রহী। তাই তথ্য-সত্য বিতর্কে উপনিষদের একটি বিখ্যাত শ্লোককে অব্যর্থ পটুতায় প্রয়োগ করেন তিনি:
সেইজন্যেই উপনিষৎ বলেছেন—

> তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
> তিনি চলেন এবং তিনি চলেন না, তিনি দূরে এবং তিনি নিকটে এ দুইই এক সঙ্গে সত্য। অংশকেও মানি, সমস্তকেও মানি; কিন্তু সমগ্রবিহীন অংশ ঘোর অন্ধকার এবং অংশবিহীন সমগ্র আরও ঘোর অন্ধকার।

রবীন্দ্রনাথ খুব সচেতনভাবেই, জেনেবুঝেই এ যুক্তি প্রয়োগ করছেন। চলা আর থামা, অংশ আর সমগ্র, ধ্রুবত্ব আর চঞ্চলতা— এই আপাত-বিপরীত সত্তাগুলিকে কোনো এক বৃহত্তর সত্যের কাঠামোর মধ্যে ধরানো যায় কি না, সেটাই তাঁর বিবেচ্য।—

> এখনকার কালের পণ্ডিতেরা বলতে চান, চলা ছাড়া আর কিছু নেই, ধ্রুবত্বটা

> আমাদের বিদ্যার সৃষ্টি মায়া। অর্থাৎ জগৎটা চলছে কিন্তু আমাদের জ্ঞানেতে আমরা তাকে একটা স্থিরত্বের কাঠামোর মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেখছি নইলে দেখা বলে জানা বলে পদার্থ থাকতই না—অতএব চলাটাই সত্য এবং স্থিরতাটা বিদ্যার মায়া।

সাদা কথায়, জানবার সুবিধে হবে বলেই বিজ্ঞান চলমান জিনিসকে থামিয়ে দেখে। সেই দেখাই তাকে তথ্য সরবরাহ করে। কিন্তু 'এখনকার কালের পণ্ডিতেরা' জ্ঞানপাপী, তাঁরা জানেন, আসলে চলা ছাড়া আর কিছুই নেই, তবু ইচ্ছে করেই তাঁরা স্থিরতার একটা মায়া তৈরি করেন। তারপর, তথ্য জানা হয়ে গেলে সেই মায়া কাটিয়ে ফেলেন, সেই তথ্যকে (খবরকে) চলমানতার ব্যাপকতর কাঠামোয় স্থাপন করেন। বিজ্ঞানীদের মতে তখন সেটা হয়ে ওঠে জ্ঞান। এইভাবে চলা এবং না-চলা, দূর এবং নিকট, অংশ এবং সমগ্র পরস্পরের পরিপূরক হয়ে একটাই কাঠামোর অঙ্গ হয়ে ওঠে। সংশয়বাদী ঔপনিষদিক অধিবিদ্যা, যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন অক্ষয় দত্ত,[৫] তার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানদর্শনের একটা সাযুজ্যের সূত্র যেন এইভাবে রেখে যান রবীন্দ্রনাথ।

এই অধিবিদ্যা কিন্তু এক বিশেষ ধরনের অধিবিদ্যা। শঙ্করের অদ্বৈতবাদী, অব্যক্ত ব্রহ্মস্বরূপের যে-অধিবিদ্যা, তাতে তাঁর যে বিশেষ সায় নেই, তার প্রমাণস্বরূপ পূর্বোদ্ধৃত অংশটির ঠিক পরের লাইনে তিনি বলেন—

> আবার আর-এককালের পণ্ডিত বলেছিলেন, ধ্রুব ছাড়া আর কিছুই নেই, চঞ্চলতাটা অবিদ্যার সৃষ্টি।

মনে হতে পারে, 'এখনকার কালের পণ্ডিত'দের পদ্ধতি আর 'আর এককালের পণ্ডিত'দের পদ্ধতিকে বুঝি তিনি তুল্যমূল্য মনে করছেন। তা কিন্তু নয়। 'এখনকার কালের পণ্ডিত'দের পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য এই যে, বাস্তবতাকে জানতে সুবিধে হবে বলে তাঁরা নিজেদের মতো করে 'স্থিরত্ব'র একটা 'কাঠামো' বানিয়ে নিয়েছেন; কিন্তু আসলে তাঁরা জানেন যে 'চলা ছাড়া আর কিছুই নেই', আসলে বাস্তবতা স্থির নয়, সচল, পরিবর্তনশীল। এটাকে যদি আত্ম-প্রবঞ্চনা বলা যায় তো সে-প্রবঞ্চনা সচেতন, জ্ঞান আহরণের একটা উপযোগী সোপান মাত্র। সেই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ এই মায়াকে 'বিদ্যার মায়া' বলে নন্দিত করেছেন। অপর দিকে, অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতদের বিচারে, বাস্তবতাটাই অপরিবর্তনীয়, অব্যক্ত। বাস্তবতা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের *পদ্ধতির* প্রতি নয়, খোদ বাস্তবতার প্রতিই তাঁদের এই ধারণা প্রযোজ্য। তাই তা কখনো বিজ্ঞানের সহায়ক হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এটা 'অবিদ্যার সৃষ্টি।' শেষ পর্যন্ত তিনি 'সরলবুদ্ধি'র ওপরেই, অর্থাৎ এম্পিরিসিস্ট কাণ্ডজ্ঞানের ওপরেই ভরসা করেছেন:

> সরলবুদ্ধি জানে, চলাও সত্য, থামাও সত্য। অংশ, যেটা নিকটবর্তী, সেটা চলছে; সমগ্র যেটা দূরবর্তী, সেটা স্থির রয়েছে।

বহু-পরিচিত, কিন্তু তুলনাহীন এক উপমায় তিনি এই দ্বান্দ্বিকতাকে ব্যাখ্যা করেছেন:

> গাইয়ে যখন গান করে তখন তার গাওয়াটা প্রতি মুহূর্তে চলতে থাকে। কিন্তু সমগ্র গানটা সকল মুহূর্তকে ছাড়িয়ে স্থির হয়ে আছে।... গানে ও গাওয়ায় মিলে যে সত্য সেই তো—
> তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
> সে চলেও বটে চলে নাও বটে, সে দূরেও বটে, নিকটেও বটে।

অনিশ্চয়তা-সূত্র, হাইজেন্‌বর্গ, রবীন্দ্রনাথ

যদিও চোদ্দো বছর পরের কথা, তবু এখানেই বোধ হয় বিজ্ঞান-দর্শনের ইতিহাসের একটা অতি আশ্চর্য ঘটনার আলোচনা সেরে নেওয়া ভালো।

রবীন্দ্রনাথ ঈশোপনিষদের ওই 'তদেজতি'-র দার্শনিক ভাবনাটার সারাৎসার যেভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, দার্শনিক দিক থেকে হাইজেন্‌বর্গের অনিশ্চয়তা-সূত্রের সঙ্গে তার লক্ষণীয় মিল আছে। হাইজেন্‌বর্গের ওই বিখ্যাত সূত্রের মূল কথাটা এই যে, একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে একটা ইলেকট্রনের অবস্থান আর গতিবেগ একই সঙ্গে কখনো নিরূপণ করা সম্ভব নয়। অতি দ্রুত গতিতে ঘূর্ণমান ওই কণার অবস্থান যদি নির্ণয় করতে যাই, তা হলে তার গতিবেগ ঠিক জানা যাবে না; আর যদি গতিবেগ নির্ণয় করতে যাই, তাহলে তার অবস্থান জানা যাবে না। যা জানা যেতে পারে তা হল, সম্ভাব্য গতিবেগ, সম্ভাব্য অবস্থান। তার মানে অতি দ্রুতগতিতে চলমান কণাদের ক্ষেত্রে দূর/নিকট, ভিতর/বাহির এই সব ধারণা সুনির্দিষ্টভাবে আর প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। 'সে চলেও বটে চলে নাও বটে, সে দূরেও বটে, নিকটেও বটে'—এই ধারণার সঙ্গে ওই সূত্রের দার্শনিক তাৎপর্যটির যথেষ্ট মিল রয়েছে। কেননা, চলা মানেই তো অবস্থান বদলানো। নিকট বা দূর সেই অবস্থানের ওপরেই তো নির্ভরশীল। অতি ক্ষুদ্র এবং অতি দ্রুতের জগতের এই সব ঘটনাকে বনেদি পদার্থবিদ্যার মতো আর সুনিশ্চিতভাবে মাপজোক করা যাবে না। তাই অনিশ্চয়তা বিশ্বজগতের এক মৌলিক সূত্র।

কৌতূহলের ব্যাপার এই যে, রবীন্দ্রনাথ যখন 'আমার জগৎ' লিখছেন, তার চোদ্দো বছর পরে হাইজেনবর্গ জটিল অঙ্ক কষে ওই 'অনিশ্চয়তা সূত্র' প্রণয়ন করেন। গণিতের দিক থেকে নিখুঁত ওই তত্ত্বের প্রাকৃতিক তাৎপর্য তাঁর নিজের মনেই

গভীর সংশয়ের সৃষ্টি করে। বাস্তবতা কি কখনো অতখানি অনিশ্চয়তার ভিত্তিতে গঠিত হতে পারে? এতদিনকার প্রচলিত বিজ্ঞানের দিক থেকে তো নয়ই, এমনকী পাশ্চাত্য কোনো দর্শনের দিক থেকেও তিনি তাঁর ওই গাণিতিক তত্ত্বের ভৌত তাৎপর্যের কোনো সমর্থন বা গ্রহণযোগ্যতা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। মনের এহেন অবস্থায়, কার পরামর্শে জানি না, তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ খুঁজে নেন। সে-সাক্ষাৎ ঘটে এই কলকাতা শহরেই। দেবেন্দ্রমোহন বসুর ডায়েরি থেকে সেই বিবরণটি পাওয়া যায়। ঘটনাটি রোমাঞ্চকর, একটু বিস্তৃতভাবে বিবৃত হওয়ার দাবি রাখে।

পদার্থবিদ্যার দিক্‌পালদের সঙ্গে ১৯২৭ সালে দেবেন্দ্রমোহনের আলাপ হয়েছিল মুসোলিনির সৌজন্যে ইটালির কোমোতে অনুষ্ঠিত ভোল্টার (১৭৪৫-১৮২৭) মৃত্যু-শতবার্ষিকী অধিবেশনে।* এঁদের মধ্যে অনেকেই পরে ভারতে এসেছিলেন, যথা রাদারফোর্ড, বোর, এডিংটন, জীন্‌স, হাইজ়েন্‌বর্গ, সোমারফেল্ড ও মিলিক্যান। ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বরে হাইজ়েন্‌বর্গের কলকাতা আগমনের কাহিনিটি সত্যিই চমকপ্রদ। দেবেন্দ্রমোহন লিখছেন: 'হাইজ়েন্‌বর্গ আর সোমারফেল্ড উভয়েই জাপানে অন্য একটি আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা অধিবেশনে যোগ দিতে যাবার পথে কলকাতায় কয়েকদিন কাটিয়ে যান। আগে থেকে কোনোরকম খবর না দিয়েই হাইজ়েন্‌বর্গ একদিন হঠাৎই এসে হাজির হন সায়েন্স কলেজে। আমরা কয়েকজন মিলে— যতদূর মনে পড়ে, তাঁদের মধ্যে ছিলাম এস কে মিত্র, পি এন ঘোষ. বি বি ঘোষ আর আমি— তাঁকে নিয়ে ফির্পোতে লাঞ্চের বন্দোবস্ত করলাম। রবীন্দ্রনাথ সেসময় কলকাতায় ছিলেন। হাইজ়েন্‌বর্গ তাঁর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ওই দিনই বিকেলে আমরা তাঁকে জোড়াসাঁকোয় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলাম।

সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলাম রথীবাবু আমাদের জন্য চমৎকার চা-জলখাবারের আয়োজন করেছেন। কবির সঙ্গে কথা বলবার জন্য হাইজ়েন্‌বর্গকে সেখানে রেখে

*দেবেন্দ্রমোহন ভুল করে লিখেছেন, ভোল্টার 'জন্ম-শতবার্ষিকী।' এই অধিবেশন সম্বন্ধে অতি চমৎকার এক বিবরণ পাওয়া যাবে মেঘনাদ সাহার 'ভোল্টা শতবার্ষিকী' শীর্ষক রচনায় (শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রকাশিত *মেঘনাদ রচনা সঙ্কলন* দ্রষ্টব্য)। মেঘনাদ সাহাও ঐ অধিবেশনে নিমন্ত্রিত ছিলেন। তিনি অবশ্য সঠিকভাবেই লিখেছেন যে ভোল্টার 'মৃত্যুর শতবার্ষিকী উপলক্ষে সপ্তাহাধিক কাল ব্যাপিয়া সুন্দরী কোমো নগরী সভাসমিতি, ভোজ, আনন্দ-ভ্রমণ ও অন্যান্য নানাবিধ আমোদ-উৎসবে মত্ত হইয়াছিল।' বিশেষভাবে লক্ষণীয়, দিকপাল বিজ্ঞানীদের মধ্যে একমাত্র আইনস্টাইনই সে-অধিবেশনে যোগ দেন নি— মুসোলিনি তার হোতা ছিলেন বলেই কি? ব্যাপারটা আরো আশ্চর্যের এই জন্যে যে ঐ ১৯২৭ সালের অক্টোবরেই তিনি পঞ্চম সল্‌ভে অধিবেশনে যোগ দেন, সেখানেই নীল্‌স বোর-এর সঙ্গে তাঁর কোয়ান্টম মেক্যানিক্‌স নিয়ে বিখ্যাত আলাপ-আলোচনার সূত্রপাত।

আমরা চলে আসি। কী কথা হয়েছিল তার সারাংশ আমার মনে নেই। তবে হাইজেন্‌বর্গ কবির আলোকোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বে খুব মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাঁর মনে হয়েছিল যেন প্রাচীনকালের কোনো ঋষি।'

হাইজেন্‌বর্গের সত্যি কী মনে হয়েছিল, সে কথাটা আমার জানতে পারি ফ্রিট্‌য়োফ কাপ্‌রা-র *Uncommon Wisdom* নামক বই থেকে। '১৯২৯ (১৯২৮) সালে হাইজেন্‌বর্গ কয়েকদিন ভারতে বিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে বিজ্ঞান আর ভারতীয় দর্শন নিয়ে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা করেছিলেন। হাইজেন্‌বর্গ আমাকে বলেছিলেন যে ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে এইভাবে পরিচিত হয়ে তিনি মনে খুব শান্তি পান। আপেক্ষিকতা, পরস্পর-সম্বদ্ধতা আর অচিরস্থায়িত্বের ব্যাপারগুলিকে ভৌত বাস্তবতার একেবারে মৌলিক অঙ্গ হিসেবে মেনে নিতে তাঁর ও তাঁর সহ-পদার্থবিদ্‌দের খুব অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওই সাক্ষাতের পরে তিনি বুঝতে আরম্ভ করেন যে, ওইগুলি ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের আসল বনেদ। তিনি বলেন, 'যেসব ধারণা আমার কাছে একেবারে পাগলামি বলে মনে হচ্ছিল, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করবার পর সেগুলো হঠাৎ বেশ অর্থবহ হয়ে উঠল। এটা আমার পক্ষে খুব উপকারী হয়েছিল।''[৭]

রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে হাইজেনবর্গের অনিশ্চয়তা-নীতির দার্শনিক সমর্থন পাওয়ার ব্যাপারটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বোঝা যায়, 'আমার জগৎ' প্রবন্ধে যেসব ভাবনা রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত করেছিলেন, সেগুলিরই আরো পরিশীলিত রূপ তিনি হাইজেন্‌বর্গের কাছে পেশ করেন। ওই সময়েই তিনি *Religion of Man* এবং *মানুষের ধর্ম* নিয়ে কাজ করছেন।

তিন

মন: আয়না নয়, উপকরণ

দেশ ও কাল সম্বন্ধে মন যা অবধারণ করে তা যে কতখানি অধ্রুব, 'রেফারেন্স-ফ্রেম' বদলে গেলে সেই অবধারণাও যে বদলে যায়, এ ব্যাপারটাকে অরো প্রাঞ্জল করে বোঝানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ বলছেন:

> যদি এই পাতাটিকে অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখি তবে একে ব্যাপ্ত আকাশে দেখা হয়। সেই আকাশকে যতই ব্যাপ্ত করতে থাকব ততই ঐ পাতার আকার আয়তন বাড়তে বাড়তে ক্রমেই সে সূক্ষ্ম হয়ে ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যাবে।
> ঘন আকাশে যা আমার কাছে পাতা, ব্যাপ্ত আকাশে তা আমার কাছে নেই বললেই হয়।
> এই তো গেল দেশ। তার পরে কাল।...

> আমার মনে আছে, একদিন দিনের বেলা আমি অল্পক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমি সেই সময়ের মধ্যে একটা দীর্ঘকালের স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমার ভ্রম হল আমি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। আমার পাশের লোককে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল আমি পাঁচ মিনিটের বেশি ঘুমোইনি। আমার স্বপ্নের ভিতরকার সময়ের সঙ্গে আমার স্বপ্নেব বাহিরের সময়ের পার্থক্য ছিল।

এই ধরনের আরো অনেক উদাহরণ নিয়ে আলোচনার পর তিনি সিদ্ধান্ত করছেন:

> তাহলেই দেখা যাচ্ছে, আমরা যাকে জগৎ বলছি সেটা আমাদের জ্ঞানের যোগে ছাড়া হতেই পারে না। যখন আমরা পাহাড় পর্বত সূর্য চন্দ্র দেখি তখন আমাদের সহজেই মনে হয় বাইরে যা আছে তা আমরা তাই দেখছি। যেন আমাদের মন আয়না মাত্র। কিন্তু আমার মন আয়না নয়, তা সৃষ্টির প্রধান উপকরণ। আমি যে মুহূর্তে দেখছি সেই মুহূর্তে সেই দেখার যোগে সৃষ্টি হচ্ছে।

এইখানে তিনি আলোচনায় অন্য এক মাত্রা যোগ করলেন। ইন্দ্রিয়যোগে মনের মধ্যে বাইরের জগৎ সম্বন্ধে যে-অবধারণা আমরা গড়ছি তা অবজেকটিভ নয়। বস্তুত সেই অবধারণা-গঠনকে এক 'সৃষ্টি' বলে অভিহিত করেন তিনি— অর্থাৎ এমন কিছু যা আগে ছিল না, মনের সহযোগে এইবার উদ্ভূত হল। মন কেবল নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করে না, মন 'সৃষ্টির প্রধান উপকরণ'। মনেরই চেতনার রঙে চুনি রাঙা হয়ে ওঠে, পান্না হয় সবুজ।

তার অর্থ কি এই দাঁড়াল যে চুনির লালত্ব আর পান্নার সবুজত্ব আসলে নেই, আমার মন সক্রিয় উপকরণ হিসেবে কাজ করে নিজের মাধুরী মিশিয়ে ওই সব গড়ে নিয়েছে? তা কিন্তু নয়। লালত্ব কিংবা সবুজত্ব শব্দগুলো আমাদের মনের 'সৃষ্টি' হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে ওগুলো কতকগুলো বিশেষ কম্পাঙ্কের তড়িচ্চুম্বক ঢেউ মাত্র, যা চোখের রেটিনায় আঘাত করে বিশেষ বিশেষ স্নায়ুখাত বেয়ে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট অঞ্চলে কতকগুলো অনুভূতি জাগাচ্ছে। ওই ঢেউ, ওই কম্পন, ওই রেটিনা, ওই মস্তিষ্ককোষ সবই কিন্তু বাস্তব, পরিমাপযোগ্য।

কিন্তু মন যদি আয়না না-হয়ে সৃষ্টির উপকরণই হয়, তা হলে তো অবজেকটিভিটি বলে কিছু থাকেই না। কারণ 'যতগুলি মন ততগুলি সৃষ্টি'। আমার দেখা পাহাড় আর আপনার দেখা পাহাড় এক নয়, গ্যালিলিওর দেখা তারা আর নিউটনের দেখা তারা এক নয়। সে ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বলে তো কিছু থাকেই না। বিজ্ঞান তো দাঁড়িয়েই আছে পর্যবেক্ষণের ও পরীক্ষার পুনরাবৃত্তির ওপর। তার দাবি, একই পরিস্থিতিতে একই পরীক্ষা থেকে সর্বদাই একই ফল পাওয়া যাবে, ব্যক্তি নির্বিশেষে। বস্তুত, সেটাই তো বিজ্ঞান-অবিজ্ঞান আলাদা করার প্রধান মাপকাঠি। অথচ এখানে মনের বিশেষ সৃজনী ভূমিকার কথা তুলে রবীন্দ্রনাথ তো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার

সেই ব্যক্তিনিরপেক্ষ অবজেকটিভিটির বিরুদ্ধে কথা বলছেন। তিনি কি এই সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন?

শুধু সচেতনই নন, রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যায় এক নতুন মাত্রা এনে দেন 'সৃষ্টি' কথাটাকে বিশেষ ধরনে ব্যাখ্যা করে।

> বিজ্ঞান ঘড়ির কাঁটার কাল এবং গজকাঠির মাপ দিয়ে সমস্তকে দেখতে চায়। দেশকালের এক আদর্শ দিয়ে সমস্ত সৃষ্টিকে সে বিচার করে।

সেই আদর্শ ব্যক্তিনিরপেক্ষ অবজেকটিভিটির আদর্শ।

> কিন্তু এই এক আদর্শ সৃষ্টির আদর্শই নয়। সতরাং বিজ্ঞান সৃষ্টিকে বিশ্লিষ্ট করে ফেলে। অবশেষে অণু পরমাণুর ভিতর দিয়ে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছায় যেখানে সৃষ্টিই নেই। কারণ সৃষ্টি তো অণু পরমাণু নয়— দেশকালের বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে আমাদের মন যা দেখছে তাই সৃষ্টি। ঈথর পদার্থের কম্পন মাত্র সৃষ্টি নয়— আলোকের অনুভূতিই সৃষ্টি।

অসামান্য এই অনুচ্ছেদটিতে খুব গভীর কতকগুলো প্রশ্ন তুললেন তিনি। এক, মূল উপাদানে বিশ্লিষ্ট করে না-দেখলে বৈজ্ঞানিক অর্থে কোনো কিছুকে 'জানা' যায় না। হয়তো 'জানা' কথাটার একটা সংজ্ঞাই হল মৌল উপাদানগুলির ধর্ম জানা। সেই জানাটা 'ঘড়ির কাঁটার কাল এবং গজকাঠির মাপে' নির্ভুল। তার নির্ভুলতা নিয়ে, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক অর্থে 'জানার' এই পদ্ধতিটা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি তুলছেন না। কিন্তু, জানার ওই স্তরে আটকে যাওয়া বা থেমে থাকা নিয়েই তাঁর আপত্তি। প্রতীত ঘটনাজগতের ম্যাক্রো-স্তরে মৌল উপাদানগুলি উহ্য থাকে (বস্তুত সেই উহ্যতার অন্ধকার গহ্বর থেকে তাদের পরিচয় টেনে বার করার নামই তো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব)। অথচ সেই ম্যাক্রো-স্তরের ঘটনাবলিকে মানুষ যেভাবে অনুধাবন করছে সেটাই রবীন্দ্রনাথের মতে সৃষ্টি, সেখানেই বৈচিত্র্য। তাই অণু পরমাণু সৃষ্টির উপকরণ, কিন্তু সৃষ্টি নয়। 'বিচিত্র দেশকালের মধ্যে দিয়ে' যে-মন অণু পরমাণুর 'দৌড়াদৌড়ি' দেখে, আবার সেই দৌড়াদৌড়ি ছাপিয়ে লোহার পরমাণুকেও 'নিবিড় এবং স্থির দেখতে পায়' সেই মনই 'সৃষ্টির লীলা' দেখতে পায়। মাইক্রো-স্তর আর ম্যাক্রো-স্তরকে মনের মধ্যে মিলিয়ে নতুন একটা কোনো উপলব্ধিতে পৌঁছনো এবং তাকে রূপ দেওয়াটাই রবীন্দ্রনাথের মতে সৃষ্টি।

সুতরাং প্রশ্নটাকে তিনি একেবারে অন্য এক জায়গায় তুলে নিয়ে গেলেন। বিজ্ঞানের সত্যাসত্য কীভাবে নির্ণয় হয়, সেটা বাস্তবতা সম্বন্ধে কতদূর সঠিক জ্ঞান সরবরাহ করে, এটা এখন আর তাঁর আলোচ্য নয়। এখন তিনি দেখতে চাইছেন, বিজ্ঞান-প্রদত্ত সেই জ্ঞান কীভাবে মানবিক বোধের জগতে অন্বিত হয়। সেই অন্বয়কেই তিনি সৃষ্টি বলছেন। আরো একধাপ এগিয়ে তিনি এই ভাবনাটা উত্থাপন

করছেন যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংগৃহীত জ্ঞান আর বিজ্ঞান-অনবহিত অনুভূতি কি সর্বদা মেলে? এবং যদি না মেলে, তাহলে মিলল না বলেই বিজ্ঞান-অনবহিত বোধকে বিজ্ঞান-সমর্থিত জ্ঞানের সাপেক্ষে বর্জন করা বা হেয় করা কি যুক্তিযুক্ত?

চার

অভিজ্ঞতার বহুত্ব ও জোসেফ নীড্‌হ্যাম

গত তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান-বিরোধী আন্দোলন বেশ মাথা চাড়া দিয়েছে। কেন এমনটা হল, তা নিয়ে জোসেফ নীড্‌হ্যামের মতো মনীষী ১৯৭৬ সালেই অত্যন্ত গভীরদর্শী আলোচনা করেছিলেন। সেই আলোচনার এক জায়গায় তিনি যে-বিশ্লেষণ করেন তা রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য বক্তব্যের (১৯১৪) সঙ্গে অতি চমৎকার খাপ খায়। নীড্‌হ্যাম লিখছেন: 'আমার মনে হয়, বিজ্ঞান-বিরোধী এই ভেতরকার কথাটা হল এই যে বিজ্ঞানকেই মানুষের যাবতীয় একমাত্র গ্রাহ্য রূপ বলে মেনে নেওয়া উচিত নয়। বাস্তবিক, বহুকাল ধরেই দার্শনিকেরা এ নিয়ে প্রশ্ন তুলে আসছেন। মানবীয় অভিজ্ঞতার বিভিন্ন রূপগুলিকে—যথা ধর্ম, নন্দনতত্ত্ব, ইতিহাস ও দর্শন— নানান সমীক্ষায় সুসমন্বিত রূপে চিত্রিত করা হয়েছে।' ভিক্টর ভাইস্‌কফ-এর বক্তব্যকে সমর্থন করে নীড্‌হ্যাম আরো লেখেন: 'মানুষের চিন্তার ইতিহাসে দেখা গেছে, যখনই একটা কোনো চিন্তাধারা প্রবল হয়ে উঠেছে, তখনই চিন্তাভাবনার ও অনুধাবনের অন্যান্য ধারাগুলি অযৌক্তিকভাবে অবহেলিত হয়েছে। মধ্যযুগের ইউরোপে ধর্ম আর ধর্মতত্ত্ব নিয়ে স্পষ্টতই এই ঘটনাটা ঘটেছিল, এবং আজকের দিনে প্রকৃতিবিষয়ক বিজ্ঞান নিয়েও অবশ্যই সেই ঘটনাটাই ঘটছে।' এই বিজ্ঞানসর্বস্ব (হয়তো টেক্‌নলজি-সর্বস্ব বললে আরো যথাযথ হয়) একদেশদর্শিতারই প্রতিক্রিয়ায় পাশ্চাত্যে জেগে উঠছে বিজ্ঞান-বিরোধী আন্দোলন। নীড্‌হ্যামের মতে, এ থেকে মুক্তির পথ একটাই— এ কথা স্বীকার করা যে 'অভিজ্ঞতার ভিন্ন ভিন্ন রূপ, যা প্রায়শই একে অপরকে নাকচ করে দেয়, সেগুলো সবই মূলত বাস্তবতাকে অনুধাবন করার অসম্পূর্ণ কতকগুলো প্রক্রিয়া, এবং *একমাত্র ব্যক্তিমানুষের নিজস্ব জীবনের মধ্যেই সেগুলির সমন্বয় ঘটানো সম্ভব।*'[৮] এর মধ্যে প্রায় যেন রবীন্দ্রনাথের ১৯১৪ সালের ভাবনারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই, বিশেষ করে ওই শেষ বাক্যটিতে। উল্লেখ্য, শুধু এখানেই নয়, অন্য বহু জায়গাতেই নীড্‌হ্যামের অনেক ভাবনার সঙ্গে পঞ্চাশোত্তর রবীন্দ্রনাথের প্রচুর মিল দেখতে পাওয়া যায়। নীড্‌হ্যামের প্রসঙ্গটা গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যে যে তিনি ছিলেন একাধারে নামজাদা বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানের

ইতিহাসবিদ। চিনের বিজ্ঞান-ইতিহাস নিয়ে তাঁর কাজ বিশ শতকের বিদ্যাচর্চার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে কীর্তিত।

এক মন, বহু মন

রবীন্দ্রনাথ যে অভিজ্ঞতার এই ভিন্ন ভিন্ন রূপ এবং তার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক অবজেক্টিভিটির সম্পর্ক নিয়ে কতটা সচেতন তা বোঝা যায় যখন পরমুহূর্তেই তিনি প্রশ্ন তোলেন:

> বৈজ্ঞানিক বন্ধু তাড়া করে এলেন বলে। তিনি বলবেন, বিজ্ঞান থেকে আমরা বহুকষ্টে বোধকে খেদিয়ে রাখি— কারণ আমার বোধ এক কথা বলে, তোমরা বোধ আর এক কথা বলে। আমার বোধ এখন এক কথা বলে, তখন আর এক কথা বলে।

কবি রবীন্দ্রনাথ এ কথা অস্বীকার তো করেনই না, উপরন্তু বলেন, ওই বিভিন্নতাই শিল্পসৃষ্টির মূল কথা। ওই বিভিন্নতা চলে গেলে সৃষ্টি হয়ে দাঁড়াবে 'কলের সৃষ্টি— মনের সৃষ্টি' নয়। স্পষ্টতই তিনি এখন আর প্রশ্নটাকে জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে দেখছেন না, দেখছেন নন্দনতত্ত্বের দিক থেকে। যে-মন বিজ্ঞানচর্চা করে, সেই মনই তো শিল্পসৃষ্টি করে। তাই, বিজ্ঞানী যখন এই আপত্তি তোলেন যে 'এক এক মন যদি এক এক রকমের সৃষ্টি করে বসে তাহলে' কারোর সঙ্গে কারো যোগ থাকবে না, তখন কবি উত্তর দেন:

> তা তো হয়নি। হাজার লক্ষ মনের যোগে হাজার লক্ষ সৃষ্টি কিন্তু তবুও তো দেখি সেই বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাদের পরস্পর যোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। তাই তো তোমার কথা আমি বুঝি, আমার কথা তুমি বোঝ।

এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাববাদী রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতিপ্রিয় বিশ্বমনের ঐক্যতত্ত্বের অবতারণা করেন।

আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-দর্শনের যাথার্থ্যটা আমাদের বিবেচ্য নয়; আমরা বুঝতে চাইছি, তপোবন-সভ্যতার মিথ-মুক্ত রবীন্দ্রনাথ কীভাবে বিজ্ঞান-সমৃদ্ধ মানুষকে বিশ্বজগতের সঙ্গে অন্বিত করে দেখছেন। তিনি বলছেন:

> মন পদার্থটা জগদ্ব্যাপী। আমার মধ্যে সেটা বদ্ধ হয়েছে বলেই যে সেটা খণ্ডিত তা নয়। সেইজন্যেই সকল মনের ভিতর দিয়েই একটা ঐক্যতত্ত্ব আছে। তা না হলে মানুষের সমাজ গড়ত না। মানুষের ইতিহাসের কোনো অর্থ থাকত না।

অথচ নির্ভেজাল বস্তুবাদী মতে 'মানুষের মন কতকগুলো স্নায়ুবর্তনীর সমষ্টি মাত্র নয়;

আবার আত্মা, প্রবৃত্তি, গূঢ়েষা ইত্যাদির মতো কতকগুলো বিদেহী সত্তার (entelechies) আধারও নয়। পরিপার্শ্বের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য মানুষ 'মন' নামক এই উপকরণটির উদ্ভব ঘটিয়েছে— একলা-মানুষ নয়, সমাজবদ্ধ মানুষ।'[৯] রবীন্দ্রনাথ ঠিক এর উলটো কথা বলেন: সমাজের মধ্যে দিয়ে মন গড়ে ওঠেনি, জগদ্ব্যাপী মনই সমাজ গড়েছে। তিনি বোঝেন, এ উত্তর 'বিজ্ঞানসম্মত' নয়। তাই তাঁর কল্পিত বৈজ্ঞানিক বন্ধুকে দিয়ে অবিলম্বে প্রশ্ন করান: 'এই মন পদার্থটা কী শুনি।' উত্তরে ভাববাদী কবি বেশ মেজাজে শুনিয়ে দেন:

> তোমার ঈথর-পদার্থের চেয়ে কম আশ্চর্য এবং অনির্বচনীয় নয়। অসীম যেখানে সীমাকে গ্রহণ করেছেন সেইটে হল মনের দিক। সেই দিকেই দেশকাল; সেই দিকেই রূপরসগন্ধ; সেই দিকেই বহু। সে দিকেই তাঁর প্রকাশ।

পাঁচ

'সীমা ও অসীম'

সম্মানসূচক চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ এই প্রথম ঘটল এই প্রবন্ধে, এতক্ষণে। রবীন্দ্রনাথ প্রমাণিত অথবা বৈজ্ঞানিক অর্থে চর্চিত বিষয় থেকে এবার সরে যাচ্ছেন তাঁর বিশ্বাসের জগতে। তাঁর ভাববাদী বহুত্ব-মণ্ডিত দর্শনের সঙ্গে সেটা আদৌ বেমানান নয়। কিন্তু তিনি এটুকু জানেন ও মানেন যে, এই বিশ্বাসের জগতের সঙ্গে, আধুনিক বিজ্ঞানের জগৎ বেমানান। তাই তিনি তাঁর ভাববাদী কবিমনের অপর মেরুতে অবস্থিত তাঁর বিজ্ঞানী-বন্ধুকে দিয়ে তৎক্ষণাৎ বিদ্রূপ করান:

> অসীমের সীমা এসব কথা কবি যখন আলোচনা করেন তখন কি কবিরাজ ডাকা আবশ্যক হয় না?

স্পষ্টতই তিনি বুঝিয়ে দেন, প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞানের প্রচলিত যুক্তি-কাঠামোয় ওই সীমা-অসীম তত্ত্বের হদিস মিলবে না। তা না-ই বা মিলল। কবির মনের কাছে, যে-মন নতুন কিছু 'সৃষ্টি' করে তার কাছে তো ওটা সত্য। বিজ্ঞানের অনুমোদন বিনাই সত্য। বিজ্ঞানের অনুমোদন কাব্যের অভিজ্ঞতার সত্যতার পক্ষে অপরিহার্য নয়। এরই নাম অভিজ্ঞতার বহুত্ববাদ, যার কথা বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদ জোসেফ নীড্‌হ্যাম শতবার বলেছেন।

কিন্তু এই রবীন্দ্রনাথ আর সেই তপোবন-সভ্যতায় বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ নন। এই রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিজ্ঞানের প্রভায় স্নান করে উঠেছেন। তাই সীমা-অসীমের তত্ত্বকে

ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি উপনিষদের 'পুরাতন ঋষি'র আপ্ত-দোহাই পাড়েন বটে, কিন্তু সেখানেই থেমে থাকেন না। পরিচ্ছন্ন দ্বান্দ্বিকতার আশ্রয় নিয়ে বোঝান:

> তাই বলে সীমা আর অসীমের ভেদ একেবারেই ঘুচিয়ে দেখাই যে দেখা তাও নয় সে কথাও আছে। তাঁরা বলেছেন অন্ত এবং অনন্তের পার্থক্যও আছে। পার্থক্য যদি না থাকে তবে সৃষ্টি হয় কী করে?

এইখান থেকে তাঁর সুর বদলে যায়। এতক্ষণ ধরে যে-সুরে আলোচনা করছিলেন, তার সঙ্গে এই শেষ পর্যায়ের আলোচনা, এই ঔপনিষদিক 'তিনি'র ধ্রুপদী আবাহন, একেবারেই বেখাপ্পা। এতক্ষণ যে আধা-ঠাট্টার টপ্পা আঙ্গিকে কপট-কলহ চালাচ্ছিলেন তা আর ধরে রাখতে পারে না, ঢঙ বদলে ফেলে তাই সরাসরি কবুল করেন:

> তত্ত্বজ্ঞানে আমার কোনো অধিকার নেই—আমি সেদিক থেকে কিছু বলছিও নে। আমি সেই মূঢ় মানুষ যে মানুষ বিচিত্রকে বিশ্বাস করে, বিশ্বকে সন্দেহ করে না। আমি নিজের প্রকৃতির ভিতর থেকেই জানি দূরও সত্য, নিকটও সত্য, স্থিতিও সত্য, গতিও সত্য।

এখানে খেয়াল রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথ 'তত্ত্বজ্ঞান' বলতে বোঝাচ্ছেন ব্রহ্মসাধনার জ্ঞান। জানাচ্ছেন, সেই জ্ঞানে তাঁর কোনো অধিকার নেই। 'সাধনা'র প্রসঙ্গটা এখানে একবারের জন্যও উঠল না, উঠল কেবল ব্যক্তি-মানুষের নিজস্ব উপলব্ধির কথা। একজন বিজ্ঞান-অবহিত, ভাববাদী, কিন্তু প্রচলিত অর্থে আধ্যাত্মিক সাধনার অভিজ্ঞতা-হীন শিল্পীর ব্যক্তিমনের নিজস্ব দ্বন্দ্বটি খুব স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেন তিনি। আধুনিক বিজ্ঞানের খণ্ড-উপাদান-বাদী পদ্ধতিতে শিল্পী হিসেবে তিনি স্বস্তি পান না, তাঁর মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে। অপরূপ এই স্বীকারোক্তি:

> আমি যখন বর্ষার গান গেয়েছি তখন সেই মেঘমল্লারে জগতের সমস্ত বর্ষার অশ্রুপাতধ্বনি নবতর ভাষা এবং অপূর্ব বেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে, চিত্রকরের চিত্র, এবং কবির কাব্যে বিশ্বরহস্য নূতন বেশ ধরে দেখা দিয়েছে— তার থেকেই জেনেছি এই জগতের জল স্থল আকাশ আমার হৃদয়ের তন্তু দিয়ে বোনা, নইলে আমার ভাষার সঙ্গে এর কোনো যোগই থাকত না; গান মিথ্যা হত, কবিত্ব মিথ্যা হত...

সীমা আর অসীমের এক ধরনের অন্-আধ্যাত্মিক, প্রাকৃতিক ও মানবীয় সম্পর্ক যেন ফুটে উঠল এই স্বীকারোক্তিতে। সত্যিই তো, একজন শিল্পীর নিজস্ব মল্লার দুই ধৈবত আর দুই নিখাদের লীলার মধ্যে দিয়ে কোথায় যে উধাও করে দেয় লক্ষ মানুষের মনকে! এ কেমন করে সম্ভব, যদি সব— নিদেনপক্ষে অনেক— মনের

মধ্যে কোনো একটা 'ঐক্যতত্ত্ব' না থাকে? রিডাক্‌শনিস্ট বিজ্ঞান এই চিরপ্রশ্নের সামনে কি নিরুত্তর নয়? যারা বলে, রিডাক্‌শনিস্ট পদ্ধতিতেই এ-প্রশ্নের উত্তর মিলবে, তাদের উদ্দেশে এবার সমস্ত মুখোশ সরিয়ে ফেলে সরাসরিই কবি বলেন:

> কবি এবং গুণীদের কাজই এই যে, যারা ভুলে আছে তাদের মনে করিয়ে দেওয়া যে, জগৎটা আমি, জগৎটা আমার, ওটা রেডিয়ো-চাঞ্চল্যমাত্র নয়।

উপসংহার

পাঁচটি সূত্র পেলাম আমরা। এক, রবীন্দ্রনাথ মনে করছেন, বিজ্ঞান মাত্রেই খণ্ডাংশবাদী, রিডাক্‌শনিস্ট। বলা বাহুল্য, এ ধারণা ভুল। রিডাক্‌শনিস্ট পদ্ধতির যুক্তিযুক্ততা, এমনকী কার্যকরতা নিয়ে বিজ্ঞানের মধ্যেই প্রচুর মতবিরোধ আছে। দুই, খণ্ডাংশবাদী বিজ্ঞান নিজস্ব ক্ষেত্রে যে-সাফল্য অর্জন করেছে, রবীন্দ্রনাথ তাকে জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে পূর্ণ মর্যাদা দেন। তিন, কিন্তু তিনি মনে করেন, ওই সাফল্য একদেশদর্শী। তা মানবীয় অভিজ্ঞতার অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি সম্বন্ধে সঠিক বিচার করতে অক্ষম— বিশেষ করে শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্র সম্বন্ধে, যা বিশেষভাবেই ব্যক্তিমানুষের মনের গতির ওপর নির্ভরশীল এবং যা সর্বতোভাবেই পূর্ণাত্মক সমগ্রবাদী। চার, সেই ব্যক্তিমন ব্যক্তির নিজস্ব, কিন্তু বিশ্বমনের সঙ্গে যুক্ত। তা না হলে এক ব্যক্তির মনের সৃষ্টি কখনো লক্ষ লক্ষ মনে সাড়া তুলতে পারত না। রিডাক্‌শনিস্ট বিজ্ঞান শিল্পসৃষ্টির এই রহস্যকে ভেদ করতে অপারগ। অথচ এই অপারগতাকে সে অক্ষমতা বলে মানতে নারাজ, বরং যেন 'বিজ্ঞানেতর' অভিজ্ঞতাগুলোকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে উন্মুখ। বিজ্ঞানের সেই অহঙ্কার ভাঙা প্রয়োজন। পাঁচ, কোনো এক 'মহারসিক' বিশ্ববীণা বাজাচ্ছেন বটে, কিন্তু সেই ওস্তাদের কাছে তালিম নেওয়ার জন্য শিল্পীর ব্যক্তিমনের সংবেদনশীলতাই যথেষ্ট—কোনোরকম আধ্যাত্মিক প্রকরণ ছাড়াই 'তাঁর' সাড়া জাগে ব্যক্তি-শিল্পীর অন্তরে। সীমা আর অসীম সেই মোহনায় এসে মেশে।

তাই—

> আমি ধন্য যে, আমি পান্থশালায় বাস করছিনে, রাজপ্রাসাদের এক কামরাতেও আমার বাস নির্দিষ্ট হয়নি; এমন জগতে আমার স্থান, আমার আপনাকে দিয়ে যার সৃষ্টি; সেইজন্যেই এ কেবল পঞ্চভূত বা চৌষট্টিভূতের আড্ডা নয়, এ আমার হৃদয়ের কুলায়, এ আমার প্রাণের লীলাভবন, আমার প্রেমের মিলনতীর্থ।

মানুষের ধর্ম: জোসেফ নীড্‌হ্যাম ও রবীন্দ্রনাথ

দার্শনিক প্রাচ্য এবং দার্শনিক প্রতীচ্যের মধ্যে লেনদেনের চরিত্র নিয়ে জিতেন্দ্রনাথ মহান্তির বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য।[১] উনি বলছেন, এই লেনদেনের প্রক্রিয়াকে তিনটি গোত্রে ভাগ করা যায়। এক, বুদ্ধিবাদীর কর্মসূচি (Intellectualists' Agenda); দুই, প্রজ্ঞাসন্ধানীর কর্মসূচি (Wisdom-seeker's Agenda); তিন, পরিপূরণের কর্মসূচি (Agenda of Supplementing)।

কান্টের জ্ঞানতত্ত্বের আলোকে সাংখ্যের বিবর্তন-ক্রমকে বোঝার চেষ্টা করা, কিংবা ভারতীয় তর্কবিদ্যার বিভিন্ন তত্ত্বের প্রয়োগে পাশ্চাত্য ন্যায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে আরো সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা— এগুলিকে মহান্তি প্রথম গোত্রের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় ধারাটি সুবিজ্ঞাপিত এবং সেই কারণে সুপরিচিত। অত্যধিক বুদ্ধিচর্চায় ক্লান্ত হয়ে পশ্চিমের অনেক দার্শনিক নাকি প্রজ্ঞার সন্ধানে বেদান্ত, যোগ বা বৌদ্ধ দর্শনের দিকে ঝুঁকছেন। এই প্রক্রিয়াটি প্রায় একমুখী।

তৃতীয়টি হল শূন্যস্থান পূরণের প্রক্রিয়া। অর্থাৎ যার যে দিকটাতে ঘাটতি রয়েছে, অন্যের ভাণ্ডার থেকে আহরণ করে সে দিকটা ভরাট করা। যেমন, ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যে ইতিহাস-তত্ত্ব বিষয়ে বিশেষ চর্চা হয়নি, তাই আমরা পাশ্চাত্য ঐতিহ্য থেকে, বিশেষ করে মার্ক্সবাদ থেকে, সে জিনিসটা গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি। কিংবা, আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো বিজ্ঞানের দর্শন ভারতীয় ঐতিহ্যে নেই, তাই আমরা আধুনিক পাশ্চাত্য থেকে সেটার আমদানি করেছি। অন্য দিকে, আধ্যাত্মিকতার মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যায় পশ্চিমিরা পিছিয়ে আছে,[২] তাই তারা যোগ আর বেদান্তর দ্বারস্থ হচ্ছে। মহান্তির মতে বেদান্তে চৈতন্য সম্পর্কে, মনের বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে যে-সূক্ষ্ম তত্ত্ব রয়েছে তা ওই বিষয়ে কান্টের দর্শনের, এম্পিরিসিস্ট দর্শনের ও হেগেলের ঘটনাসারতত্ত্বের (ফেনোমেনোলজির) পরিপূরক হতে পারে।

এই তিনটে প্রক্রিয়া মোটামুটি স্বীকৃত। যে-আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হতে চলেছি, তার পটভূমি হিসেবে মহান্তির এই সরল— হয়তো অতিসরল— বর্গীকরণ বেশ উপযোগী। কিন্তু মহান্তি এর সঙ্গে আরো একটা ধারা যোগ করতে চান। সেটাও কৌতূহলজনক। ব্যাপারটা খানিকটা এই রকম।— আমার নিজস্ব দার্শনিক ঐতিহ্যে একটা সমস্যাকে আমি এক ভাবে দেখে অভ্যস্ত। কিন্তু ভিন্ন কোনো ঐতিহ্যে সেই সমস্যাটাকেই হয়তো সম্পূর্ণ আলাদা একটা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। এভাবে যে দেখা যায়, সেই সম্ভাবনাটা সম্বন্ধেই আমি হয়তো অবগত নই। কিন্তু সেই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ আয়ত্ত করতে পারলে দার্শনিক দিক থেকে আমি হয়তো অনেক উপকৃত হব, সমস্যাটার চরিত্র সম্বন্ধে আমার উপলব্ধি অনেক প্রসারিত হবে, দেশ-মণ্ডুকতা কিছুটা কাটবে। সমস্যাটাকে তখন আমি প্রশস্ততর প্রেক্ষিতে রেখে বিচার করতে পারব। দার্শনিক লেনদেনের এটা একটা সুফলপ্রসূ প্রক্রিয়া বলে তিনি মনে করেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলছেন, সাধারণভাবে নৈতিকতা, সৌন্দর্য আর ধর্ম, এই তিনটে জিনিসকে আলাদা আলাদা করে বিচার করাটাই হল রেওয়াজ। কিন্তু কনফুশীয় নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে পড়াশোনা করতে গিয়ে তিনি লক্ষ করেন, 'নৈতিকতা, সৌন্দর্য আর ধর্মের মধ্যে যে সব বেড়া তুলে রাখা হয়েছে তা ভেঙে দেওয়া সম্ভব।'

এই মন্তব্যটি পড়া মাত্র জোসেফ নীড্‌হ্যামের কথা মনে পড়ে যায়। বহুকাল আগে তিনি চিনের তাওবাদ, নৈতিকতা, মার্ক্সবাদ এবং আধুনিক বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে অত্যন্ত গভীরভাবে ভেবেছিলেন। নীড্‌হ্যামের প্রসঙ্গটা আমাদের কাছে জরুরি এই জন্যে যে, তিনি ছিলেন বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান-ইতিহাসবিদ, চিন-বিশেষজ্ঞ, মার্ক্সবাদ-অনুরাগী সক্রিয় সমাজতন্ত্রবাদী *এবং ধার্মিক*। তাঁর ভাবনার মধ্যেও এই বেড়া-ভাঙার প্রসঙ্গটাই ছিল প্রধান। এই ধরনের বেড়া-ভাঙার দর্শন

নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নীড্‌হ্যাম যে-অবস্থানে পৌঁছান, তার সঙ্গে আবার রবীন্দ্রনাথ মানুষের ধর্মের কোনো কোনো দিকের বেশ মিল আছে। সেই সব মিল, এবং সেই সব অমিল, বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য। আশা, তাতে করে হয়তো ওই প্রশস্ততর প্রেক্ষিত খুঁজে পাওয়ার কাজটা একটু এগোবে।

এক

জোসেফ নীড্‌হ্যাম: তিন স্ববিরোধিতার সমাহার

নিজের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে 'শতাব্দীর সমান বয়সী' জোসেফ নীড্‌হ্যাম (১৯০০-১৯৯৭) তিনটি 'স্ববিরোধিতার' কথা বলেছিলেন। প্রথমত, বিশ আর তিরিশের দশকের বামপন্থী ব্রিটিশ 'তরুণ বিজ্ঞানী'দের মধ্যে (যথা জুলিয়ান হাক্সলি, জে বি এস হল্‌ডেন, জে ডি বার্নাল, সি এইচ ওয়াডিংটন, লান্সলট হগবেন, হাইমান লেভি প্রমুখ) একমাত্র নীড্‌হ্যামেরই একটা সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় আনুগত্য ছিল। তিনি ছিলেন অ্যাংগ্লিক্যান চার্চের সদস্য। আজীবন তিনি এই ধর্মবোধে অবিচল ছিলেন। এটাকে তিনি বলেছেন, 'বিজ্ঞানচেতনা আর ধর্মবোধের বৈপরীত্য।'

দ্বিতীয়ত, এই ধর্মীয় আনুগত্য নিয়েই সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি তিনি নিবিড়ভাবে দায়বদ্ধ ছিলেন। '১৯১৭ সালের পর থেকে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশে কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে তোলার প্রয়াসের সঙ্গে তিনি নিজেকে শামিল করেছিলেন। এটাকে বলা যেতে পারে তাঁর ধর্মবোধ আর রাজনৈতিক চেতনার বৈপরীত্য।' সেই দায়বদ্ধতায় শিকড় কত গভীরে চলে গিয়েছিল তার প্রমাণ হল, ষাটের দশকের শেষে চিনের সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব নিয়ে যখন দুনিয়া জুড়ে টি-টি পড়ে গিয়েছিল, তখন নীড্‌হ্যাম তাকে সাগ্রহে সমর্থন করেছিলেন— শুধু রাজনীতির দিক থেকে নয়, নৈতিকতার দিক থেকেও। এমনও বলেছিলেন যে রাজনীতি-ক্ষেত্রে ব্যক্তিমানুষের নিজের মনের ভিতরকার লড়াইকে এতখানি গুরুত্ব দিয়ে মাও মার্ক্সবাদী নীতিশাস্ত্রে একটা নতুন অবদান রাখলেন।

তৃতীয়ত, 'জন্মভূমি ইংল্যান্ডের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে মিশে থেকেও নীড্‌হ্যাম 'চৈনিক সভ্যতার প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছিলেন।... শুধু তাই নয়, চিন, শ্রীলঙ্কা, ভারত এবং অন্যান্য এশীয় দেশের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও স্থায়ী বন্ধুত্ব পাতাতে পেরেছিলেন। এটাকে বলা যেতে পারে প্রাচ্য মনোভাব আর প্রতীচ্য মনোভাবের বৈপরীত্য।'[৩]

ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের, ধর্মের সঙ্গে মার্ক্সবাদের এবং তথাকথিত প্রতীচ্যের সঙ্গে তথাকথিত প্রাচ্যের 'বৈপরীত্য' নীড্‌হ্যামের মধ্যে ক্রিয়া করেছিল। এর মধ্যে

দ্বিতীয়টিকে বাদ দিলে, অন্য দুটি বৈপরীত্যের মোকাবিলা রবীন্দ্রনাথকেও করতে হয়েছিল। কিন্তু অন্যভাবে। রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন ধর্মের আশ্রয়ে, কিংবা বলা ভালো আধ্যাত্মিকতার মাটিতে, যত দিন গেছে ততই তিনি বিজ্ঞানের সঙ্গে সমঝোতা করে নিয়েছিলেন। অন্য কথায়, তাঁর পক্ষে ধর্মমনস্ক হওয়াটা ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু বিজ্ঞানমনস্ক হওয়াটা ছিল বিশেষ প্রচেষ্টাসাপেক্ষ। ভারতবর্ষে প্রকৃত বিজ্ঞানের চর্চা রবীন্দ্রনাথের জন্মের অন্তত পাঁচশো বছর আগে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর ঠিক আগের প্রজন্মের মানুষ বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্তের প্রয়াসে আধুনিক এম্পিরিসিস্ট বিজ্ঞান তখন সবে দুচারজন মানুষের মনে ঠাঁই পেতে আরম্ভ করেছে। সেই বিজ্ঞানের আলোকে, প্রতিষ্ঠিত ধর্মাচরণের অনেক কিছুই বিসঙ্গত বলে প্রতিভাত হচ্ছিল। তাই, আধুনিক বিজ্ঞান, যা সতেরো শতকের পর থেকে কেবল পাশ্চাত্যেই বিকশিত হচ্ছিল, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিশ্বচেতনা কেন অসংলগ্ন নয়, সেই প্রসঙ্গটাই উত্তরোত্তর বেশি করে ফিরে এসেছে তাঁর লেখায়, বিশেষ করে ১৯১১-র পর থেকে।

অপর দিকে আধুনিক বিজ্ঞানের মহনীয়তা নীড়্হ্যামের কাছে কোনো প্রমাণসাপেক্ষ ব্যাপার ছিল না, ছিল স্বতঃসিদ্ধ। বিজ্ঞানের কোলেই জন্ম তাঁর, বরং ধর্মের সঙ্গেই তিনি আপস করে নিয়েছিলেন। ফলে তাঁর অস্বস্তিটা আবার অন্য জায়গায়। যে জন্য তাঁকে বারবার লিখে বোঝাতে হয়েছে, কেন বিজ্ঞানী, সমাজতন্ত্রবাদী এবং মার্ক্সবাদ-অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ধর্মের পথ ছাড়েননি। সহপথিক বিজ্ঞানী-বন্ধুদের সঙ্গে এ নিয়ে তাঁর অনেক মতভেদ ছিল। তাঁর পথ কেন এবং কোথায় প্রচলিত অর্থে ধর্মের পথ থেকে অনেক দূরে গেছে বেঁকে, তাও সবিস্তার বুঝিয়েছেন তিনি। আর সেইখানটাতেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য ধরা পড়ে। ব্যাপারটা এরকমভাবে ভাবা যেতে পারে যে, দুই বিপরীত মেরু থেকে রওনা হয়ে দুজনে যেন একটা অভিন্ন মধ্যভূমিতে এসে পৌঁছলেন, যার নাম দেওয়া যেতে পারে মানুষের ধর্ম।

বিপরীত মেরু কথাটা দুজনের পটভূমি এবং স্বভাব সম্বন্ধেও খাটে। ঔপনিবেশিক বিশ্ব-কেন্দ্রে এমন এক সময়ে জন্ম নীড়্হ্যামের, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং ইউরোপের বিজ্ঞানচর্চা যখন একেবারে মধ্যগগনে। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে চল্লিশ বছরের ছোটো তিনি। বলশেভিক বিপ্লবের সময় তিনি সতেরো বছরের কিশোর, রবীন্দ্রনাথ ছাপ্পান্ন বছরের জগদ্বিখ্যাত কবি। নীড়্হ্যামের বাবা নামকরা ডাক্তার, মা গুণী পিয়ানো-বাদিকা। দুজনের মধ্যে বনিবনা বিশেষ ছিল না। নীড়্হ্যাম সেখানে সচেতনভাবেই সেতুর কাজ করতেন। ধর্ম আর দর্শনের প্রতি বাবার গভীর আগ্রহ অনায়াসেই ছেলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তাকে অতিক্রম করে যান তিনি। সেই অতিক্রমণের প্রকৃতি নিয়ে একটু পরেই আলোচনা

করব। বাবার উৎসাহেই তিনি প্রথমে ডাক্তারি পড়েন, কিন্তু তারপর নিজের অন্তরের তাড়নায় ঘুরে যান প্রাণ-রাসায়নিক গবেষণার পথে। অল্প বয়সেই কেম্ব্রিজের সবচেয়ে উজ্জ্বল জীববিজ্ঞানী-গোষ্ঠীর সদস্য তিনি, প্রবাদ হয়ে-যাওয়া জন গাউল্যান্ড হপ্‌কিন্‌স-এর অন্যতম প্রিয় ছাত্র। কাজকর্মের ধরন অত্যন্ত সানুপুঙ্খ, ইতিহাসনিষ্ঠ ও বৃত্তিনিপুণ। ফলিত গবেষণার অঙ্গস্বরূপ রচনা করেন ভ্রূণতত্ত্ববিদ্যার অমূল্য ইতিহাস। ব্রিটেনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-প্রক্রিয়ারই উজ্জ্বল ফসল নীড্‌হ্যাম ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী মার্ক্সবাদী রাজনীতিতে দীক্ষিত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান ছেড়ে বিজ্ঞানের ইতিহাসের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলেন তিনি। মনে প্রশ্ন জাগল: কেন এমন সমৃদ্ধ প্রযুক্তির ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটাতে ব্যর্থ হল চিন? কেন সে-বিপ্লব ঘটল চিনের প্রযুক্তি-অধমর্ণ পশ্চিম ইউরোপে? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে চৈনিক ভাষা আর সংস্কৃতিতে ক্রমে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলেন নীড্‌হ্যাম, দশকের পর দশক জুড়ে রচনা করলেন *সায়েন্স অ্যান্ড সিভিলাইজেশন ইন চায়না*, যা বিশ শতকের শ্রেষ্ঠতম মননকৃতিগুলির একটি। প্রায় পুরো বিংশ শতাব্দ এবং গোটা পৃথিবী জুড়ে তাঁর বিচরণ।

রবীন্দ্রনাথ: ধীর, কিন্তু অপ্রতিরোধ্য বনস্পতি

আর রবীন্দ্রনাথের জন্ম মধ্য-উনিশ শতকে, ব্রিটিশ উপনিবেশের রাজধানী কলকাতায়। দেশের সবচেয়ে সংস্কৃতিপরায়ণ ও অমিত ধনশালী পরশ্রমজীবী পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান তিনি। ঠাকুরদা ব্রিটিশ-অনুরাগী উদারপন্থী, বিলাসী মুৎসুদ্দি-শিল্পপতি, বাবা জমিদার ও সংস্কারপন্থী ধর্মনেতা। পারিবারিক সূত্রে ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা তিনি। 'দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছায় রবীন্দ্রনাথ বেশ অনেককাল আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পদে বৃত ছিলেন। তবে... সে কাজ তিনি কর্তব্য হিসেবেই পালন করেছিলেন, তার বেশি কোনো উৎসাহ ছিল না।'[৪] পিতার ওপর আধ্যাত্মিক, আত্মিক ও বৈষয়িক নির্ভরতা তাঁর জীবনের প্রথমার্ধের এক প্রধান ঘটনা। শিশুকাল থেকে আরম্ভ করে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর বাহ্য ব্যক্তিত্ব দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা অনেকাংশে আচ্ছন্ন ছিল। মা সারদা দেবীকে বালকবয়সেই হারিয়েছিলেন তিনি, মায়ের নিষ্প্রভ ব্যক্তিত্ব তাঁকে কোনোভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না।

ধর্মীয় দিক থেকে পিতার প্রভাব অনেক সময়েই মেনে নিতে পারেননি তিনি, কিন্তু এত সাহস ছিল না যে বিদ্রোহ করেন। যত্নপ্রসাধিত আনুষ্ঠানিক ব্যক্তিত্ব আর

গভীর গোপন ব্যক্তিত্বের আসল রূপ, এ দুটিকে সচেতনভাবে আলাদা করে লালন করবার অভ্যেস এমনি করেই গড়ে উঠেছিল। 'আমি যে-গৃহে জন্মেছি সেখানকার ধর্ম্মেই দীক্ষা পেয়েছিলুম। সে ধর্ম্মও বিশুদ্ধ। কিন্তু আমার মন তারই মাপে নিজেকে ছেঁটে নিতে কোনোমতেই রাজি ছিল না। তবু আমি এ নিয়ে টানাহেঁচড়া না করে বেশ সহজভাবেই আপন প্রকৃতির পথে চলেছিলুম।'[৫] স্বাধীন ইউরোপীয় বুর্জোয়া সমাজে জন্মানোর কল্যাণেই হয়তো, নীড্‌হ্যাম কিন্তু এই টানাহেঁচড়াটা করেছিলেন, স্পষ্টভাবে এবং প্রকাশ্যে।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সঙ্গে মনের বিরোধ থাকা সত্ত্বেও, তার সঙ্গে আপস করে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ঔপনিবেশিক শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে সমূলে প্রত্যাখান করেছিলেন, মনের চাষ করেছিলেন 'আনন্দে'। কোনো অর্থেই তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ফসল নন। এমনকী খোদ ইংল্যান্ডের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও বশ করতে পারেনি তাঁকে। অথচ তিনি আদৌ বিপ্লবী নন। বৈপ্লবিক উত্তরণ নয়, ধীরগতি কিন্তু অচঞ্চল বিবর্তনই তাঁর প্রকৃতি। বাংলা ভাষার এই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি চিত্রশিল্প এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও প্রাতিষ্ঠানিকতার বেড়া ভাঙেন প্রায় যেন খেলাচ্ছলেই, কিন্তু প্রকরণ-সিদ্ধ তালিম নেন না, স্বরলিপি পর্যন্ত শেখেন না, দেশলাইয়ের বাক্স পর্যন্ত আঁকতে শেখেন না। একইভাবে তিনি অঙ্কও শেখেননি, ধর্মতত্ত্ব-চর্চাতেও তাঁর ঝোঁক যতটা আগ্রহনিবিড়, ততটা চর্চাসমৃদ্ধ নয়। কোনোরকম যন্ত্রপাতির দিকে ঝোঁক ছিল না তাঁর (এমনকী বাদ্যযন্ত্রের দিকেও নয়।)। বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক 'রসসম্ভোগ'-এর দিক থেকে, চেতনার দিক থেকে, সাংস্কৃতিক আত্তীকরণের দিক থেকে, কিন্তু কখনোই নিবিষ্ট চর্চার দিক থেকে নয়।

ঔপনিবেশিক বাংলার রাজনীতির সঙ্গে তিনি ওতপ্রোত কিন্তু নিজের শ্রেণি-অবস্থানের নিরাপদ ভারসাম্য থেকে বিচ্যুত হন না কখনোই, 'হাটের ধূলা' লাগতে দেন না গায়ে। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ঘৃণায় ত্যাগ করেন নাইট্‌হুড, কিন্তু পরের বছরই জালিয়ানওয়ালার শহিদদের স্মরণস্তম্ভ নির্মাণের বিরোধিতা করেন এই যুক্তিতে যে 'হৃদয়ের মধ্যে প্রতিশোধের কলুষস্বপ্ন' পুষে রাখা অনুচিত! পরিণত বয়সে অবশ্য ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। বুর্জোয়া মানবতার প্রতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস, অনেক দেরিতে হলেও, অবশেষে দেউলে হয়ে গিয়েছিল। মহামানবের জন্মপ্রতীক্ষায় মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে রোমাঞ্চ দেখে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তবু, অনেক বাঁক, অনেক মোড় থাকলেও কখনও কোনো চূড়ান্ত প্যারাডাইম-বদল ঘটেনি তাঁর জীবনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন সবে মনে হচ্ছিল, তাঁর চিন্তা-চেতনায়-অবস্থানে ঘটতে চলেছে সেইরকম কোনো মেরুবদল,

তখনই প্রয়াণ হল তাঁর। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়, বনস্পতির মতোই ধীর, বিপুল কিন্তু অপ্রতিরোধ্য তাঁর বিবর্তন।[৬]

তার অর্থ এ নয় যে, তিনি ছিলেন পল্লবগ্রাহী। তাঁর সৃজনী প্রতিভার ধরনটাই ছিল এমন যে, কতটুকু রসদে তার চলবে তা সে নিজেই নির্ণয় করে নিতে পারত। রাজনীতিই হোক, ধর্মতত্ত্বই হোক, দর্শনই হোক আর বিজ্ঞানই হোক, সবটাই আসলে তাঁর কাছে মূল্যবান বিষয়-মাহাত্ম্যে নয়, তাঁর সৃজনী-প্রতিভার খোরাক হিসেবে। তাঁর সৃজনশীলতাকে চেতিয়ে তুলেই তা সার্থক ও নিঃশেষিত। কথাটা তাঁর ধর্মবোধ সম্বন্ধে বোধহয় সবচেয়ে বেশি করে প্রযোজ্য। জার্মানির বিখ্যাত প্রোটেস্টান্ট ধর্মতাত্ত্বিক রুডল্‌ফ অটো (১৮৬৯-১৯৩৭) ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-বিষয়ক বক্তৃতা শুনে চমৎকৃত হয়েছিলেন এই কারণে যে 'আমাদের সামনে কোনো ধর্মতাত্ত্বিক তত্ত্ব উপস্থাপন করতে চাননি তিনি, কিংবা ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসের তত্ত্বনির্যাস নিয়ে কোনো বক্তৃতাও দিতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত বোধকে মেলে ধরতে, আমাদের সেই বোধের অংশভাক্ করতে। সেই বোধ সম্পূর্ণই তাঁর নিজস্ব। ওই বিশেষ ব্যক্তিসত্তা থেকে, তার বিশিষ্ট চরিত্র থেকে আলাদা করে নিয়ে, কখনোই তাকে সর্বজনীন করে তোলা যাবে না।'[৭] সেই বোধ সর্বজনীন না হতে পারে, কিন্তু লক্ষ করবার বিষয় এই যে, তাঁর সেই একান্ত আপন আত্ম-উন্মোচনের প্রত্যক্ষতা সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতির ধর্মতত্ত্ববিদ অটোকে অমনভাবে স্পর্শ করেছিল তার ব্যক্তিগত, অন্তরতম, অপ্রাতিষ্ঠানিকতার গুণেই। মনে রাখতে হবে, ১৯৩০ সালেই রবীন্দ্রনাথের *The Religion of Man* প্রকাশিত হয়, যেটি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত হিবার্ট লেকচারের গ্রন্থরূপ। বাংলা *মানুষের ধর্ম* বেরোয় এর দু বছর পরে। বাংলা বইটি ইংরেজির অনুবাদ নয়, নানা দিক থেকে আলাদা।

অটোর সাক্ষ্য আমাদের বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে খুবই তাৎপর্যময় এই কারণে যে, তিনি আবার এক বিশেষ অর্থে নীড্‌হ্যামের আত্মিক গুরু। তাঁর বহুপঠিত *The Idea of the Holy* (মূল জার্মান, ১৯১৭; ইংরেজি অনুবাদ, ১৯২৩) নীড্‌হ্যামকে অল্পবয়সে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, তাঁর মনকে একটা স্বতন্ত্র ছাঁচে ঢেলে নিয়েছিল। পরিণত বয়সে নীড্‌হ্যাম এতদূর পর্যন্ত বলেছিলেন যে, শুদ্ধ-পবিত্রের জন্য মানবাত্মার যে-আকুতি, একমাত্র অটোই তার যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথ => অটো <= নীড্‌হ্যাম এই ত্রিভুজ নিয়ে আমরা একটু পরেই আবার আলোচনা করব।

নীড্‌হ্যামের লেখা রবীন্দ্রনাথ পড়েননি, এটা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। (তবে বামপন্থী 'তরুণ বিজ্ঞানী' গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য জুলিয়ান হাক্সলি-র জনবোধ্য বৈজ্ঞানিক লেখা তিনি মন দিয়ে পড়েছিলেন, তার প্রমাণ আছে।) কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখা নীড্‌হ্যাম খুব সম্ভব পড়েছিলেন, যদিও তার কোনো প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই। খুব হালকা কিছু পরোক্ষ সাক্ষ্য হয়তো আছে। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবর্ষে জে ডি বার্নাল রবীন্দ্রনাথ নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন।[৮] বার্নাল-নীড্‌হ্যামের অন্তরঙ্গতা এবং ধর্ম বিষয়ে তাঁদের মতভেদ কিংবদন্তি-সমান। বার্নালের বহু লেখা নীড্‌হ্যামের পরামর্শে সমৃদ্ধ, এবং ভাইসি ভার্সা। তা ছাড়া, ষাটের দশকে শান্তি আন্দোলনের সঙ্গে দুজনেই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ওপর বার্নালের ওই প্রবন্ধটি শান্তি আন্দোলনের আন্তর্জাতিক মুখপত্রেই প্রকাশিত হয়েছিল। প্রাচ্য-বিশেষজ্ঞ বন্ধু নীড্‌হ্যাম এ ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছিলেন, এমন অনুমান কি খুব অসঙ্গত? তবু, এটা অনুমানই। আসল সাক্ষ্যটা অভ্যন্তরীণ। নীড্‌হ্যামের সমাজতন্ত্র-ধর্ম-মানবিকতা সমন্বয়-তত্ত্বের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু ভাবনার আশ্চর্য গুঞ্জরন শোনা যায়। রবীন্দ্রনাথ পাঠ না করেই যদি তাঁর মনে ওই সমবেদন জেগে থাকে, তা হলে সেটা আরও বৃহৎ এবং মৌলিক কোনো অভিন্ন প্রভাবের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে। সেই অভিন্ন ভূমিটা কোথায়?

দুই

নীড্‌হ্যামের ধর্ম: পবিত্রতা ও নৈতিকতা

নীড্‌হ্যাম যখন কেম্ব্রিজের কীজ় (Caius) কলেজে ডাক্তারি পড়তে গেলেন, তখন বাবার প্রণোদনায় তিনি সেখানকার অ্যাংগ্লিক্যান চার্চ প্রভাবিত ছাত্রসঙ্ঘের সদস্য হন। সেখানে তাঁর নিজের সাক্ষ্য অনুযায়ী, যতটা না প্রচলিত অর্থে ধর্মের কথা হত, তার থেকে বেশি হত ভাববাদী দর্শন আর তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্বের আলোচনা। সে সব আলোচনা করতেন বাঘা বাঘা পণ্ডিতরা। তরুণ নীড্‌হ্যামের মনে তা তিন ধরনের ঢেউ জাগাত। এক, খ্রিস্ট ধর্মের বাইরে অন্যান্য ধর্মের ইতিহাস সম্বন্ধে কৌতূহল ও শ্রদ্ধা। দুই, হিউম্যানিস্ট বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে অপার মুগ্ধতা। তিন, সেই মুগ্ধতাকে বিজ্ঞানের ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার আগ্রহ। এর পরের পর্যায়ে দেখতে পাচ্ছি, তিনি ধর্মীয় জীবনের 'সেবামূলক' দিকটাতে আকৃষ্ট হচ্ছেন। সেটা অবশ্য খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে গিয়ে তাঁর বিজ্ঞান-সম্পৃক্ত ব্যক্তিমন একটা বিশিষ্ট গড়ন পেয়ে গেল। রহস্যময় অজানা আর বোধাতীতের ভয়, যা সাধারণভাবে সমস্ত ধর্মীয় আকর্ষণের মূলে কাজ করে, তিনি

তাকে কাটিয়ে উঠলেন। ধর্মকে তিনি আর যাই হোক, ভয়ের দিক থেকে দেখতেন না। অমুক কাজটা না করলে 'ভগবান পাপ দেবে' এই বালখিল্য ধর্মবোধ তাঁর কাছে হাস্যকর মনে হল। 'আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা— তরিতে পারি শকতি যেন রয়'— এটা নীড্‌হ্যামেরও কথা হতে পারত।

কিন্তু তাই বলে মনের দ্বন্দ্ব মেটানো সহজ হয়নি তাঁর পক্ষে। খ্রিস্টীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে তাঁর মধ্যে প্রচণ্ড দোলাচল জেগে ওঠে। ওইসব আনুষ্ঠানিক আচরণগুলির মধ্যে যে-প্রতীকধর্মিতা রয়েছে তার সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করে। অথচ, উচ্চারিত মন্ত্রগুলির ভাষা ও বক্তব্যে তাঁর বিজ্ঞানী মন প্রবলভাবে আহত হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি বোঝাপড়া করেন এইভাবে যে, ওগুলি শুধুই কবিতা, কবিতা হিসেবেই উপভোগ্য, অন্য কোনোভাবে বিশ্লেষ্য নয়: 'বৈজ্ঞানিক ছুরিকা দিয়ে তার ব্যবচ্ছেদ, কিংবা ভাষা-দার্শনিকের পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে তার বিশ্লেষণের কোনো প্রয়োজন নেই।'

নীড্‌হ্যামের মনের ধর্মীয় গতিধারা এখনো অব্দি বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারছি। সংবেদী, সমাজ-সচেতন বিজ্ঞানী-মনের অধিকারী নীড্‌হ্যাম বলেছেন ধর্ম সম্বন্ধে এই মুক্তমন আগ্রহ তাঁকে পরে অন্যান্য অনেক সুদূর সংস্কৃতির সঙ্গে সহজে আত্মীয়তা পাতাতে সাহায্য করেছিল। 'যারা লিঙ্গ আর যোনিকে পূজা করে, গোপিনীদের সঙ্গে কৃষ্ণের লীলার প্রতীকের মধ্যে যারা শুদ্ধ-পবিত্রতার অনির্বচনীয় গুণ অনুভব করে', তাদের সঙ্গে মানস-সখ্য গড়ে তুলতে অসুবিধে হয়নি তাঁর। অথচ তিনি ছিলেন অভিজাত ব্রিটিশ প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞানশিক্ষার উজ্জ্বল ফসল, উপরন্তু খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যে দীক্ষিত। তাঁর পক্ষে কৃষ্ণ-গোপিনীর লীলাকাহিনির মধ্যে শুদ্ধ-পবিত্র অনির্বচনীয়কে খুঁজে পাওয়া আশ্চর্য নয় কি? তাঁর বাবার পক্ষে সেটা কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না।

রুডল্‌ফ অটোর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত নীড্‌হ্যাম লিখছেন, জীবন অনেক রূপের, অনেক রকমের স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতার সমাহার— সংমিশ্রণ নয়, সমাহার। সেই সব অভিজ্ঞতাকে ভেঙে ভেঙে সব সময় যে একটি থেকে অন্যটিতে উপনীত হওয়া যাবেই, এমন নয়। যেমন, দার্শনিক বা অধিবিদ্যক অভিজ্ঞতা একরকম, বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা আরেকরকম, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা একরকম, নান্দনিক অভিজ্ঞতা আরেকরকম, ধর্মীয় অভিজ্ঞতা আবার অন্য এক রকম। সরলীকরণের মারফত এই সব অভিজ্ঞতার একটি থেকে শুরু করে অন্যটিতে পৌঁছনো যায় না ঠিকই, কিন্তু প্রত্যেকটিকেই অন্য যে কোনোটির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু সেই সব ব্যাখ্যা অনেক সময়েই নিতান্ত পরস্পরবিরোধী। এই সব পরস্পরবিরোধী অভিজ্ঞতা

মানুষের মধ্যে সহাবস্থান করে। সে সহাবস্থান তাঁর মতে মানবিক অস্তিত্বেরই একটা অঙ্গ। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলছেন, যার সঙ্গীতের বোধ নেই, তার কাছে বেঠোফেনের কোয়ার্টেট-এর মহত্ত্ব অনায়ত্ত। অভিজ্ঞতার ওই রূপটা থেকে সে বঞ্চিত। অনুরূপভাবে, সাহিত্যে নিমজ্জিত কোনো ব্যক্তির কাছে হয়তো গাণিতিক প্রমাণপদ্ধতির মহত্ত্ব, কিংবা বৈজ্ঞানিক নিয়মের আবিষ্কার বা প্রযুক্তির উন্নতি বিশেষ কোনো বার্তা বহন করে না। এই সব অভিজ্ঞতার মধ্যে কোনো একটি বা কয়েকটিকে অপরিহার্য বিবেচনা করে অন্যগুলিকে খাটো করা তাঁর মতে নিষ্প্রয়োজন। শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস-নৈতিকতা-ধর্ম এ সবই ব্রহ্মাণ্ড নামক এই 'প্রকাণ্ড কাণ্ডের' প্রতি সাড়া দেওয়ার একেকটি পথ। সব পথ সবার জন্য সুগম নয়, অন্তত সমান সুগম নয়।

এটা যে মানুষের অপূর্ণতা, সে কথা অবশ্য মানেন তিনি। স্পষ্টই জানান, মানুষের লক্ষ্য হল পূর্ণাঙ্গ আর পরিপূর্ণ হয়ে ওঠা, অর্থাৎ যে-ব্রহ্মাণ্ডে তার বসবাস তার প্রতি সাড়া দেওয়ার কোনো পথ থেকেই বঞ্চিত না হওয়া।[৯] সেই পূর্ণতা অর্জনই মানুষের চরম লক্ষ্য।

অটো, নীড্‌হ্যাম ও রবীন্দ্রনাথ

নীড্‌হ্যাম এই ধারণার সবচেয়ে বড়ো সমর্থন পেয়েছিলেন রুডল্‌ফ অটো-র কাছ থেকে। সেই সমর্থন পেয়ে, এবং নিজের জীবনযাপনের প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে তিনি এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছিলেন যে, ধর্ম বলতে কোনো মন্ত্রতন্ত্র, মত বা বিশেষ আচার-আচরণকে বোঝায় না, ধর্ম হল শুদ্ধ-পবিত্র অনির্বচনীয়ের (numinousness) একটা অনুভূতি। অটো-প্রচলিত numinous* শব্দটি নীড্‌হ্যামের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। আধ্যাত্মিক (spiritual) বা ঐশ্বরিক (divine) না বলে অসংখ্যবার তিনি এই শুদ্ধ-পবিত্র অনির্বচনীয় শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অটোর চিন্তাধারার এই দিকটি ব্যাখ্যা করে নীড্‌হ্যাম লিখছেন, এক দিকে পুরোহিত অন্য দিকে পয়গম্বর বা ভবিষ্যকথক (প্রফেট), এই দু দলের মধ্যে সঙ্ঘাত অতি প্রাচীন। ব্যতিক্রমহীনভাবে সমস্ত ধর্মের ইতিহাসে এটা লক্ষণীয়। বিশেষ বিশেষ স্থান, কাল, পাত্র অনুযায়ী এ সঙ্ঘাতের সুনির্দিষ্ট বহিঃপ্রকাশ হয়তো আলাদা হয়েছে, কিন্তু এর মূল বিবাদ্য বিষয়টি চিরকালই সব জায়গাতেই এক। স্থিতাবস্থার পুরোহিতরা কেবলই চেয়েছেন ঈশ্বর সত্তাটির চরিত্রকে নির্দিষ্ট একটা কাঠামো ও প্রণালীর মধ্যে ফেলে ব্যাখ্যা করতে, আর

*ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা নেই। তবু মনে হয়, এই 'নিউমিনাস' কি রবীন্দ্রনাথের 'সত্যের আনন্দরূপ'-এরই অনুরূপ একটি অভিব্যক্তি?

ভবিষ্যকথকরা কেবলই প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলে এসেছেন, ওরকম হয় না, ওটা ভুল। পাস্কাল-এর দৃষ্টান্ত তুলে অটো দেখিয়েছেন, চিন্তাশীল এবং সংবেদী মানুষেরা ওই ধরনের অধিবিদ্যক নিষ্প্রাণ তত্ত্ব নিয়ে কত অসন্তোষ জানিয়েছেন। ধর্মীয় মরমিয়াবাদীদের প্রসঙ্গ তুলে নীড্‌হ্যাম বলছেন, 'মরমিয়ারা বলেন, সেই এক এটাও নয়, ওটাও নয়, এমন কিছুই নয় যাকে কোনো ভাষায় বিশেষ্য দিয়ে চিহ্নিত করা যায়।' তা যথার্থই অনির্বচনীয়।

এটা কিন্তু রুডল্‌ফ অটোর চিন্তাভাবনার কেবল একটা দিক। অন্য দিকটা, যেটার কোনো উল্লেখ আমরা নীড্‌হ্যামে পাই না, সেটা যথেষ্ট আপত্তিকর, তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঔদ্ধত্য বেশ প্রকট। অটো মনে করতেন, শুদ্ধ-পবিত্র অনির্বচনীয়ের আকৃতির মধ্যে দিয়েই ধর্মের সূত্রপাত, কিন্তু ওই আকৃতিটুকুই ধর্ম নয়। সেই আকৃতি যখন ব্যক্তিমানুষের মনের বাইরে কোনো মূর্ত রূপকে আশ্রয় করে, তখনই তা ধর্ম হয়ে ওঠে। এবং সেই মূর্ত রূপ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়ে ক্রমাগত বিবর্তিত হতে হতে অবশেষে খ্রিস্টধর্মে, বিশেষত প্রোটেস্টান্ট ধর্মে তার চরম ও শ্রেষ্ঠ রূপ ধারণ করেছে। 'Christianity... stands out in complete superiority over all sister religions.'

ঠিক এই পাশ্চাত্য-কেন্দ্রিক ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধেই কিন্তু নীড্‌হ্যামের সারা জীবনের লড়াই। প্রাতিষ্ঠানিক খ্রিস্টধর্মের তথাকথিত সর্বশ্রেষ্ঠত্বের দাবি তাঁর কাছে অগ্রাহ্য তো বটেই, বরং প্রকৃতির প্রতি পূজাহীন মনোভাব পোষণ করে খ্রিস্টধর্ম যে প্রকৃতিকে যথেচ্ছ দোহনের পথ প্রশস্ত করেছে, সে কথা যুক্তি সহকারে প্রমাণ করেছেন তিনি। ইউরোপে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে প্রোটেস্টান্ট ধর্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে তিনি পৃথিবী গ্রহের বাস্তুসাম্যের সর্বনাশ ডেকে আনার জন্য উভয়কেই দায়ী করেছেন। পরিণত বয়সে যখন তিনি চিনের তাওবাদের গুণগ্রাহী হয়ে ওঠেন, তখন এই যুক্তিই দেন যে তাওবাদ প্রকৃতিকেই শুদ্ধ-পবিত্র জ্ঞান করে, প্রকৃতির বাইরে কোনো অতিলৌকিকের মধ্যে অনির্বচনীয়ের সন্ধান করে না। ওইখানেই খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে তার তফাত। শুধু তাই নয়, খ্রিস্টধর্মের গণ্ডি-বহির্ভূত অন্যান্য ধর্মের ও সংস্কৃতির সঙ্গে যেভাবে আত্মীয়তা বোধ করতেন নীড্‌হ্যাম, যার উল্লেখ আগেই করেছি, তা কখনোই সম্ভব হত না যদি তিনিও অটোর মতো মনে করতেন যে পৃথিবীর যাবতীয় 'ভগিনী-ধর্মের' মধ্যে খ্রিস্টধর্মই শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ বড়দা-স্থানীয়। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, তিনি অটোর চিন্তাভাবনার সেই অংশটুকুই পরিপাক করে নিয়েছিলেন যেটুকু ব্যক্তিমানুষের অনির্বচনীয় আকৃতির মধ্যে সত্যের আনন্দরূপের সন্ধান করে। রবীন্দ্রনাথের 'ধর্ম'কে স্বয়ং অটো যেমন

ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব অন্তর-প্রক্ষেপ বলে মনে করেছেন, এবং সেই কারণে প্রাতিষ্ঠানিক খ্রিস্টধর্ম-লালিত ঐতিহ্যের সঙ্গে তার মূলগত দূরত্ব অনুভব করেছেন, নীড্হ্যামের ধর্মও ঠিক তাই।

তিন

'বেগানা' রবীন্দ্রনাথ: প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা, পবিত্রতা, সৃজনশীলতা

দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনায় যে বিবর্তন ঘটে, তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা ও ব্যক্তিমানুষের নৈতিক মুক্তি। তার সঙ্গে অন্য একটা উপাদানও মেশে, এবং ক্রমে প্রবল হয়ে ওঠে: সেটা হল সৃজনশীলতা। সৃজন বলতে তাকেই বোঝায় যা বাইরের বাজারি প্রয়োজনের চাপে তৈরি হয়নি, যা ব্যক্তিমানুষের মনের অদম্য তাড়নার অবদান, যার মধ্যে ব্যক্তিমন বাজার-নিরপেক্ষভাবে সার্থকতা অনুভব করে। মার্ক্সের কথায়, যা মানুষের 'আত্মিক উৎপাদন' (spiritual production)। সেই আত্মিক উৎপাদনের তাড়নাতেই তা হয়ে ওঠে শুদ্ধ, পবিত্র, মালিন্যমুক্ত। সেই তাড়না আছে বলেই মানুষ অন্য সব প্রাণীর থেকে আলাদা: 'ইতিহাসে মানুষের সকল প্রয়োজনের মধ্যে, তাহার সমস্ত কাড়াকাড়ি মারামারি তাহার সমস্ত ব্যস্ততার মাঝখানে এই ধর্ম রহিয়াই গিয়াছে;— তাহা অন্নপান নহে, বসনভূষণ নহে, খ্যাতিপ্রতিপত্তি নহে, তাহা এমন কিছুই নহে যাহাকে বাদ দিলে মানুষের আবশ্যকের হিসাবে একটু কিছু গরমিল হয়; তাহাকে বাদ দিলেও শস্য ফলে, বৃষ্টি পড়ে, আগুন জ্বলে, নদী বহে; তাহাকে বাদ দিয়া পশুপক্ষীর কোনো অসুবিধাই ঘটে না; কিন্তু মানুষ তাহাকে বাদ দিতে পারিল না।'[১০] (১৯১১)

সেই তাড়নার নামই মানুষের ধর্ম। সে-ধর্ম কিন্তু একান্তভাবে ব্যক্তিমানুষেরই পালনীয়। প্রতিষ্ঠান সে-ধর্ম পালনের অন্তরায় শুধু নয়, বৈরি। ১৯২৩ সালে উইলিয়ম পীয়ার্সনকে একটি চিঠিতে লেখেন তিনি: 'ঈশ্বর-সাধকদের সঙ্ঘ মানুষের একটা মস্ত আশ্রয় সেকথা মানি, কিন্তু যে-মুহূর্তে তা একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় তখনই তা খিড়কি দরজা দিয়ে শয়তানকে ডেকে আনার পথ প্রশস্ত করে।'[১১] এর কিছুকাল পরে হেমন্তবালা দেবীকে লিখছেন: 'আমি গোড়া থেকেই একঘরের দলে ভিড়েছি, ঘরের কোণ-বিহারীদের মাঝখানে যারা বেগানা আমি সেই হা-ঘরেদের খাতায় নাম লিখিয়ে রাজপথে বেরিয়ে পড়লুম— ঘোরো যারা তারা মারতে আসবে, মারতে এসেই বেরোতে শিখবে। তুমি লিখেচ আমি পুরাতন ভারতের প্রতিকূল। রঘুনন্দনের ভারতটাই বুঝি পুরাতন ভারত? দেবীদাসের কৌলীন্যই বুঝি সনাতন কৌলীন্য? মহাভারত পড়েছ ত— পৌরাণিক যুগের আচার

আচমনে উপবাসে বুকের হাড় বের করা পুরাতন ভারতের সঙ্গে কোন্খানে তার মিল?' (১৯৩১)[১২] নিজের এই 'বেগানা' পরিচয় নিয়ে আর একটু কঠিন ভাষায় হেমন্তবালা দেবীকেই লিখছেন: 'আমি নিজেকে ব্রাহ্ম বলে গণ্যই করিনে। তোমার মা আশঙ্কা করেছিলেন, খৃষ্টান মিশনারীর মতো ব্রাহ্ম সমাজের আড়কাঠির কাজে বুঝি বা আমার উৎসাহ।... আমি তোমার আর কোন্ অনিষ্ট করতে পারি জানিনে, কিন্তু কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের দীক্ষা দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য। কেননা, আমি নিজেই যূথভ্রষ্ট, আমি ধর্ম-সম্প্রদায়ের তক্মাপরা ছাপ-মারাদের মধ্যে কেউ নই,— রাজার দত্ত উপাধি আমি ত্যাগ করেছি, সম্প্রদায়ের দত্ত উপাধিও আমার নেই।' (১৯৩২)[১৩]

এখানে রবীন্দ্রনাথ মূলত নৈতিকতার দিক থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করছেন। এটা কিন্তু তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম-বিরোধিতার একটা দিক মাত্র। এর অন্য দিকটা অন্তরের নান্দনিকতার ও আদর্শবোধের সঙ্গে যুক্ত। বাহিরের সত্তার সঙ্গে অন্তরের সৃজনী সত্তার অবিরাম সঙ্ঘাতের মধ্যে দিয়ে আঁধার-আলোয় এমন এক মোহনার ধারে এসে পৌঁছেছিলেন তিনি, যেখানে তাঁর সৃজনী সত্তা তাঁর নৈতিক সত্তার সঙ্গে মিলেছিল। প্রাতিষ্ঠানিকতা-মুক্ত, বৈষয়িক স্বার্থসাধনার তাগিদ-মুক্ত 'আত্মিক উৎপাদন'-এর মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিমানুষের শুদ্ধতা অর্জনের সেই আয়োজনকেই রবীন্দ্রনাথ বললেন ধর্ম। ১৯৩২-এ প্রকাশিত *মানুষের ধর্ম*-এর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, বিষয়বুদ্ধির বাইরে

> মানুষের আর-একটা দিক আছে...। সেখানে জীবনযাত্রার আদর্শে যাকে বলে ক্ষতি তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু সেই অমরতা। সেখানে বর্তমানকালের জন্য বস্তু সংগ্রহ করার চেয়ে অনিশ্চিত কালের উদ্দেশে আত্মত্যাগ করার মূল্য বেশি।... সেখানে আপন জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন সেই জীবনে মানুষ বাঁচতে চায়।... যা আমাদের ত্যাগের দিকে তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মানুষের ধর্ম।[১৪]

অধুনা, আত্মত্যাগ করার, অমরতা লাভের বা ওই 'বড়ো জীবন'-এ বাঁচবার প্রয়াসকেও জৈবধর্ম বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন একদল বিজ্ঞানী। 'স্বার্থপর জিন' তত্ত্বের প্রবক্তা রিচার্ড ডকিন্স এঁদের অন্যতম। এঁদের মতে, জিন সর্বদাই স্বার্থান্ধ, কিন্তু সেই স্বার্থান্ধতাই আবার মানুষকে *আপাত*-আত্মত্যাগে প্রবৃত্ত করে। অর্থাৎ যেটাকে আমরা আত্মত্যাগ মনে করছি, মহত্ত্ব মনে করছি, সেটা আসলে ত্যাগ নয়, সেটা প্রজাতি-স্বার্থরক্ষার জন্য অবশ্য-করণীয় একটি কাজ মাত্র। যে-ব্যক্তি পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ বা দেশের জন্য প্রাণ দিচ্ছে, সে আসলে তার সম-প্রজাতির অন্য বহু সদস্যের, অর্থাৎ তাদের জিনের, স্বার্থ রক্ষা করছে। সেও তার জিনের অন্ধ তাড়নাতেই সে কাজ করছে। যে-ব্যক্তি ওই কাজ করছে, তার জিন-গঠনে ওই

ধরনের জিনের প্রাবল্য আছে বলেই সে তা করে। মৌচাকের অন্য বাসিন্দাদের বাঁচাবার জন্যে হানাদারের দেহে হুল ফুটিয়ে একক-মৌমাছির মৃত্যুবরণের সঙ্গে এর তুলনা করেছেন ডকিন্‌স। ওই বিশেষ মৌমাছিরা ওই ধরনের কাজ করবার জন্যেই জিনের দ্বারা 'প্রোগ্রামিত'। বলা বাহুল্য, ডকিন্‌সদের এই মত রিডাক্‌শনিস্ট চিন্তাধারার চরম। স্টিভেন রোজ় প্রমুখ বহু জীববিজ্ঞানীই এর তীব্র বিরোধী।

আমাদের বর্তমান আলোচনায় এ প্রসঙ্গ তোলার কারণ আছে। ঠিক এই প্রশ্নটা রবীন্দ্রনাথ ১৯৩২ সালেই তুলেছিলেন। অবশ্য জিন নিয়ে নয়, 'জীবকোষ' নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। সেটাই স্বাভাবিক, কেননা তখনও জিন বিষয়ে কিছুই প্রায় জানা ছিল না, ডি এন এ-র জোড়া হেলিক্‌স গড়ন আবিষ্কার তো আরও অন্তত কুড়ি বছর পরের ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এইরকম:

> এক দিকে এই জীবকোষগুলি আপন আপন পৃথক জীবনে জীবিত, আর-এক দিকে তাদের মধ্যে একটি *গভীর নির্দেশ* আছে, *প্রেরণা* আছে, একটি ঐক্যতত্ত্ব আছে, সেটি অগোচর পদার্থ; সেই প্রেরণা সমগ্র দেহের দিকে, সেই ঐক্য সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত। মনে করা যেতে পারে, সেই সমগ্র দেহের উপলব্ধি অসংখ্য জীবকোষের অগম্য, অথচ সেই দেহের পরম রহস্যময় আহ্বান তাদের প্রত্যেকের কাছে দাবি করছে তাদের *আত্মনিবেদন*।[১৭]

এখানে প্রত্যেক জীবকোষের 'স্বতন্ত্র জন্ম, স্বতন্ত্র মরণ'-এর বাস্তব ঘটনাটিকে যথাযথ স্বীকৃতি দিয়েই রবীন্দ্রনাথ সমগ্র দেহের মধ্যে তাদের অন্বিত হবার এক 'প্রেরণা' বা 'ঐক্যতত্ত্ব'-র কথা তুলেছেন, যা কিনা সব কটি কোষের জন্মমৃত্যুর যোগফল নয়, তার অতিরিক্ত কিছু। ডকিন্‌সরা শুধু জিনের ক্রিয়ার মধ্যে থেকেই মানুষের যাবতীয় আচরণের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন; পূর্ণাত্মক সমগ্রবাদী রবীন্দ্রনাথ তাকে ছাপিয়ে গিয়ে একটি 'একটি গভীর নির্দেশের' কথা তুলেছিলেন। বলেছিলেন:

> যেখানে তারা [জীবকোষগুলি] নিজের জীবনসীমাকে অতিক্রম করে সমস্ত দেহের জীবনে সত্য সেখানে তারা আশ্চর্য, সেখানে তারা আপন স্বতন্ত্র জন্মমৃত্যুর মধ্যে বদ্ধ নয়। সেইখানেই তাদের সার্থকতা।[১৬]

রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী ছিলেন না, জীববিজ্ঞানের সাম্প্রতিকতম ঘটনাবলি সম্বন্ধে ভাসাভাসা ধারণা ছাড়া আর কিছু ছিল না তাঁর। কিন্তু সেইটুকু পুঁজির ওপর নির্ভর করেই তিনি একটা গভীর সমস্যার দিকে আলোকপাত করেছিলেন, যা আজ আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। নীড্‌হ্যাম কিন্তু বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর পরিমণ্ডলটা ছিল নিখাদ বৈজ্ঞানিক— সেখানে রাসায়নিক জীববিজ্ঞানের সঙ্গে পদার্থবিদ্যার সম্মিলন ঘটেছিল। ১৯৪১ সালে, জিনতত্ত্বের সঙ্গে জীববিজ্ঞানের বিবাহ পাকা হওয়ার আগে,

তিনি ভ্রূণবিদ্যার অঙ্গন থেকে এই সমস্যা নিয়ে যা বলেন তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের বৈজ্ঞানিক প্রতিধ্বনি শুনে আমরা চমৎকৃত হই। তাঁর উত্থাপিত প্রশ্নগুলি ছিল, গর্ভের মধ্যে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি কোন 'সামগ্রিক পরিকল্পনা' অনুসারে গড়ে ওঠে? কী করে তারা সুনির্দিষ্ট ছাঁদ পায়? এর আগে তিনি এক বিশেষ ধরনের 'সংগঠক অণু' নিয়ে সন্ধান করেছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, ওই ধরনের অণুই প্রতিটি স্তরে ভ্রূণের অঙ্গ গঠনের দায়িত্ব পালন করে, অর্থাৎ অংশের সঙ্গে সমগ্রের সাযুজ্য বজায় রাখে। রবীন্দ্রনাথ কথিত ওই 'গভীর নির্দেশ', ওই 'প্রেরণা'রই বৈজ্ঞানিক অনুবাদরূপে ধরা যেতে পারে নীড্হ্যামের এই ভাবনাকে। হয়তো হোয়াইট্হেডের দর্শনভাবনা এ ক্ষেত্রে তাঁকে প্রভাবিত করে থাকবে।

অতএব বলতে পারি, খণ্ডতার গণ্ডি কাটিয়ে পূর্ণতায়, দৈনন্দিনতার গণ্ডি কাটিয়ে বৃহত্তর জীবনে অন্বিত হওয়ার যে-আকূতিকে রবীন্দ্রনাথ মানুষের ধর্ম নামে অভিহিত করছেন, তার উপমা, এমনকী তার যুক্তিগুলোও তিনি বস্তুনিয়ম-শাসিত জৈব জগতের মধ্যে থেকেই পেয়ে যাচ্ছেন। তার জন্য বিজ্ঞানের আশ্রয় ত্যাগ করতে হল না তাঁকে।

সেই আশ্রয়কে ধরে রেখেই তিনি বৈষয়িক, অর্থাৎ খণ্ডিত লাভের তাড়না মুক্ত সৃজনের আনন্দকে বললেন মুক্তি, স্বাধীনতা। সেই মুক্তিই মানুষকে ওই 'বড়ো জীবন'-এর সঙ্গে অন্বিত করে। আধ্যাত্মিকতা, অর্থাৎ সত্যের আনন্দরূপের অনুসন্ধানে ব্যক্তিমানুষের কোনো অনির্বচনীয় অনুভূতি অবশ্যই সে-ধর্মের অঙ্গ। ঠিক যেমন নতুন আবিষ্কারের নেশায় বুঁদ কোনো বিজ্ঞানীর সাধনাও তার অঙ্গ; কবিতার মগ্নতা কিংবা সঙ্গীতসৃষ্টির উন্মাদনা, এমনকী খামোখা পাহাড়ে চড়তে গিয়ে প্রাণ দেওয়ার অবৈষয়িক পাগলামিও সেই ধর্মের অঙ্গ। আরো এক ধাপ এগিয়ে বলা যেতে পারে, মনপ্রাণ ঢেলে শুধু ভালোবেসে প্রিয়জনের একটি সংসার সৃজন করার মধ্যেও সেই মানুষেরই ধর্মের অভিব্যক্তি। মৈত্রেয়ীর মতো কোনো নারীকে তিনি সেই ধর্মের সাধনাতেই 'অমৃতা' হয়ে উঠতে দেখেন। ১৯০৮ সালের এক লেখায় মৈত্রেয়ীর অমর উক্তির প্রথা-বহির্ভূত ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, মৈত্রেয়ীর সত্যোপলব্ধি কোনো ধর্মসাধিকার নয়, নিতান্তই একজন ঘরোয়া ব্যক্তি-মানুষীর, একজন গৃহিণীর, যিনি ঘরসংসারের দৈনন্দিনতার মাঝখান থেকেই, সাধারণ জীবনের মধ্যে থেকেই ওই 'কষ্টিপাথর'টি পেয়েছেন, তাঁর numinous-এর খোঁজ পেয়েছেন। দিনযাপনের উপকরণ-সর্বস্বতাকে অতিক্রম করে মানুষের যে আত্মিক জীবন তার খোঁজ সবাই পায় না, যেমন কাত্যায়নী পায়নি। কিন্তু পাওয়া যায়, কেউ কেউ পায়। সেই খোঁজ পাবার জন্যে সংসার ছেড়ে যাওয়ার দরকার হয় না।[১৭] প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মেরও আশ্রয় নেওয়ার দরকার হয় না। গান কিংবা কবিতার মধ্যে দিয়েও তার খোঁজ মেলে— নীড্হ্যাম এর সঙ্গে রাজনীতিকেও যোগ করবেন।

একটু ঠাহর করে দেখলেই বোঝা যাবে, এইভাবে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে ওই ব্যবস্থার অনেকগুলো আক্রমণের খোঁচা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য এক বর্ম গড়ে নিলেন। প্রথমত, প্রতিষ্ঠান। পীয়ার্সনকে লেখা ওই চিঠিটা ভালো করে পড়লেই দেখা যাবে, তাঁর আপত্তি শুধু 'ধর্মীয়' প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেই নয়, যে কোনো বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেই, যে-ধরনের প্রতিষ্ঠান পুঁজিতান্ত্রিক সভ্যতার অভ্রান্ত লক্ষণ। বৃহৎ প্রতিষ্ঠান মাত্রেরই একটা নিজস্ব ঘূর্ণিটান থাকে, যা সম্মিলিত ব্যক্তিস্বার্থকে সঙ্ঘস্বার্থে রূপান্তরিত করে একটা মনুষ্যত্ব-বিরোধী মাত্রা অর্জন করে, এই তাঁর বক্তব্য। দ্বিতীয়ত, পণ্য-কলুষিত নৈতিকতা। মানুষের ও প্রকৃতির যাবতীয় উৎপাদনকেই, এমনকি সুন্দরকেও, পণ্যে রূপান্তরিত করার দ্বারা পুঁজিতন্ত্র মানুষের 'আত্মিক উৎপাদন'-এর চরম অবমূল্যায়ন ঘটায়। বাজার-সফলতার মানদণ্ডে ভালোমন্দের বিচার করতে গিয়ে মানুষের নৈতিক অধঃপতন ঘটে। এর বিপরীতে রবীন্দ্রনাথ জোর দেন ব্যক্তিমানুষের একান্ত নিজস্ব, অর্থাৎ বাজার-নিরপেক্ষ সৃজনশীলতার শুদ্ধতার ওপর, বাজারি মূলস্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতরানোর নৈতিক বলশালিতার ওপর।

মুনাফা-তাড়িত, মুনাফা-চালিত, মুনাফা-কৈবল্যে রাহুগ্রস্ত পুঁজিতন্ত্রের সর্বগ্রাসিতার হাত থেকে নিজের আত্মাকে বাঁচানোর এই প্রয়াসে উপনিষদ, বিশেষ করে ঈশোপনিষদ, তাঁর সহায় হল। তাঁর উপনিষদের ব্রহ্ম বাজারের ঈশ্বর নয়। সে-ব্রহ্ম নির্লিঙ্গ, সে-ব্রহ্ম 'তিনি' নয়, 'ইহা'। অর্থাৎ সেটা নৈর্ব্যক্তিক, অব্যাখ্যেয় একটি ধারণা, একটি অনির্বচনীয় অনুভব। সেই অনুভবে স্থিত হওয়ার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের পাঠ নেওয়ার, কিংবা কোনো গুরুর দেখানো পথে সাধনভজন করার দরকার পড়ে না, নিজের মনের আকুলতাই যথেষ্ট। প্রতিটি ব্যক্তিমন তাকে নিজের মতো করে সৃষ্টি করে নেয়। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান যেহেতু ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির মূল কারণ সম্বন্ধে অকাট্য কোনো ব্যাখ্যা দিতে অপারগ, তাই উপনিষদ-উক্ত ওই নৈর্ব্যক্তিক, ক্লীব-লিঙ্গে উচ্চারিত, প্রতিষ্ঠান-ঊর্ধ্ব ব্রহ্মকে স্বীকার করার জন্য তাঁর প্রিয় বিজ্ঞানের কাছ থেকেও খুব বেশি দূরে সরতে হল না তাঁকে। ব্যক্তিগত স্তরে তিনি তাকে পান্থজনের সখা বলে ডাকতেই পারেন, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। এইভাবে আস্তিকতা, বিজ্ঞান আর মানবিক নৈতিকতার প্রতি ভরসা বজায় রেখে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিস্বার্থে পূজিত ঈশ্বরের ধারণাটি বর্জন করলেন।

প্রতিষ্ঠান, বাজার-সর্বস্ব নৈতিকতা আর মুনাফা-কবলিত স্বার্থবোধ— পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের এই ত্রিফলা আক্রমণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তিনি গড়ে নিলেন তাঁর বর্ম, যার নাম মানুষের ধর্ম। কিন্তু যে-সমাজব্যবস্থা ওই আক্রমণ হানে তাকে উৎখাত করার পথ নিয়ে ভাবলেন না। সমাজ নিয়ে তিনি প্রচুর ভেবেছেন,

কিন্তু সমাজ বদলানোর রাজনৈতিক পন্থা নিয়ে বিশেষ কিছু ভাবেননি। গাঁধীজির সঙ্গে তাঁর বিরোধের মধ্যে থেকে ওই বিশেষ প্রশ্নটি নিয়ে তাঁর ভাবনাচিন্তার খুব একটা পরিচয় পাওয়া যায় কি? নীড্‌হ্যাম, আমরা এখনই দেখতে পাব, ঠিক সেই ভাবনাটাই ভেবেছিলেন।

চার

নীড্‌হ্যামের ধর্ম, নীড্‌হ্যামের মার্ক্সবাদ

নীড্‌হ্যামের ধর্মভাবনার বিবর্তন রবীন্দ্রনাথের তুলনায় একেবারেই ভিন্ন পথে ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবনের একেবারে বাইরের দিকের এক অবহেলিত কোণে ছিল রাজনীতির স্থান। নীড্‌হ্যামের জীবনেও প্রথমে তাই ছিল। কিন্তু ক্রমে রাজনীতি তাঁর অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন উভয়তই একেবারে কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে নিল। তাই নীড্‌হ্যামের ধর্মভাবনার বিবর্তন তাঁর রাজনৈতিক চেতনার উত্তরণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য, আর এই দু ধরনের বিবর্তনকে যুক্ত করে রেখেছিল তাঁর বৈজ্ঞানিক সত্তা। উচ্চশিক্ষিত ব্রিটিশ পরিবারের সন্তান হিসেবে তিনি নানা ধরনের বুর্জোয়া বিশেষাধিকার ভোগ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। সে অধিকারগুলো যে *বিশেষ* অধিকার, তা যে সর্বজনীন নয়, সে ব্যাপারে কৈশোরে, এমনকি যৌবনেও, তিনি সচেতন ছিলেন না। গরিব মানুষের প্রতি তাঁর জনদরদি উদারপন্থী চিকিৎসক পিতার মমতা ছিল, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাটার বিরুদ্ধে নালিশ ছিল না, বরং সেই ব্যবস্থাটাকেই তিনি আদর্শ মনে করতেন। বাবার এই স্থিতাবস্থা-পন্থী উদারনৈতিক ধর্মচেতনার প্রভাব তরুণ নীড্‌হ্যামকে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার প্রতি বিরূপ হয়ে দেয়নি। ১৯১৭-র বলশেভিক বিপ্লব আবছাভাবে তাঁর কিশোর মনে সেই ভাবনার ক্ষীণ উন্মেষ ঘটালেও কেম্ব্রিজে পড়ার সময় মূলত তাঁর বাবার প্রভাবেই তিনি বামপন্থী ছাত্র সংসদে যোগ না দিয়ে 'অ'-রাজনৈতিক ইউনিয়ন সোসাইটিতে যোগ দেন। কিন্তু শ্রেণিবিভক্ত সমাজে যেহেতু সদিচ্ছা-প্রণোদিত নিরপেক্ষতা বলে শেষ পর্যন্ত কিছু হয় না, তাই অবধারিতভাবেই, না বুঝে তিনি কিছুটা দক্ষিণপন্থী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯২৬ সালে যখন সারা ব্রিটেন সাধারণ ধর্মঘটে উত্তাল, তখন তিনি রাষ্ট্রীয় আবেদনে সাড়া দিয়ে 'সাংবিধানিক পথে ন্যায্যত স্থাপিত' সরকারের স্বেচ্ছাসেবী হয়ে ধর্মঘটী রেলশ্রমিকদের জায়গায় রেলগাড়ি চালানোর কাজে লাগেন। তিনি কিন্তু আদৌ শ্রমিকবিরোধী নন, শুধু স্থিতাবস্থা-পন্থী। তাঁর ধারণা, তিনি সত্যের পথেই আছেন। অবশেষে তাঁর জ্ঞানোদয় হল, যখন ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাজা দেওয়ার জন্য রেল কম্পানি তাঁর ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীর সাহায্য

চাইল। প্রতিবাদ করলেন তিনি, বললেন শ্রমিকশ্রেণির সঙ্গে তো তাঁর কোনো বিরোধ থাকতে পারে না। ক্রমে তিনি বুঝলেন, তিনি যা চান, সেই ন্যায্য সমাজের বাস্তবায়ন স্থিতাবস্থাকে বজায় রেখে কখনো সম্ভব নয়, এবং শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্ব বিনা তা অসম্ভব। তারপর তিরিশের দশকে দুনিয়াজোড়া ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে বিজ্ঞানীসমাজকে সংগঠিত করার সময় তিনি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কেন্দ্রীয় আবর্তের মধ্যে চলে আসেন। এই যে উত্তরণ ঘটল, এখানে দার্শনিক স্তরে তাঁর আদর্শের সঙ্গে তাঁর ধর্মবোধের বোঝাপড়া কীভাবে করলেন নীড্‌হ্যাম?

মানুষ সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমানুষ নয়, এবং সমাজ সমসত্ত্ব কতকগুলো অংশে বিভক্ত নয়, এটা উপলব্ধি করার পর তিনি নিবিষ্টভাবে তাঁর এতদিনকার অভিজ্ঞতা ও ধ্যানধারণার একটা সার্বিক বিশ্লেষণে রত হলেন। দেখলেন, অনেকগুলো দ্বন্দ্ব আর স্ববিরোধিতার মধ্যে দিয়ে চলেছেন তিনি। এটা আবিষ্কার করে তিনি বিমর্ষ হলেন না, পাপবোধে আক্রান্ত হলেন না। বরং বুঝলেন যে, তথাকথিত বিশুদ্ধ দর্শনের অঙ্গনে যেসব দ্বন্দ্ব অসমাধেয় বলে গণ্য, কাজে নামলে, বাস্তব অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে তাদের সমাধান হয়ে যায়। বস্তুত সেটাই ইতিহাসে যুগ যুগ ধরে ঘটে আসছে। অতি চমৎকার ভাষায় সেই উপলব্ধিটি ব্যক্ত করেছেন তিনি: '...ব্যবহারিক চিন্তার জগতে দ্বন্দ্ব আর সমাধানহীনতা মোটেই কোনো সর্বনাশা ব্যাপার নয়, কেবল ফর্মাল লজিকের ক্ষেত্রেই ওটা সর্বনাশা হয়ে ওঠে। কাজে নামলেই দেখা যায় উচ্চতর এক স্তরে সংশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে ঐসব দ্বন্দ্ব আর সমাধানহীনতার নিরসন হয়ে যাচ্ছে।'[১৮]

যেকোনো সমস্যার তাত্ত্বিক মোকাবিলায় নীড্‌হ্যাম সর্বদাই ইতিহাসের শরণাপন্ন হতেন। খুঁজে দেখতেন অতীতে মানুষ এই সব পরিস্থিতিতে কী করেছে, কী ভেবেছে, কী ভাবেনি, কী করেনি। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। ভাববাদী চিন্তানায়করা নিজ নিজ যুগে কীভাবে এই সমস্যার মোকাবিলা করেছেন তার ইতিহাস অনুসন্ধান করে তিনি দেখলেন, 'এইসব চিন্তাবিদ্‌রা সকলেই কিন্তু সমস্যার নিরসন খুঁজে পেয়েছেন ঐশ্বরিক মার্গে, তাঁরা কেউই মনে করেন নি যে ইহজগতে মানুষ সেই সমাধান আয়ত্ত করতে পারবে।'[১৯] ভবের সঙ্গে ভাবের মিলন তাঁদের মতে হবারই নয়।

নীড্‌হ্যাম কিন্তু ওইখানে থামলেন না। বিজ্ঞানী তিনি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতন্ত্র তাঁকে বোঝাল, প্রতিষ্ঠিত ভাবজগৎ, যা স্থিতাবস্থার ন্যায়পরতা বা অপরিবর্তনীয়তার সপক্ষে যুক্তি সন্ধানে ব্যস্ত, সেখানে এর কোনো উত্তর মিলবে না। এর উত্তর পেতে গেলে বদলাতে হবে চিন্তার প্যারাডাইম। সেই ভিন্ন প্যারাডাইম যার সন্ধান দিয়েছিলেন মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স। তাঁরা 'এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিয়ে দ্বন্দ্বসমূহের সমাধানকে একেবারে ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই স্থাপন

করলেন। দ্বন্দ্বের সমাধান কেবল স্বর্গলোকেই হয় না, এই ইহজগতেই হয়। তার কোনোটা হয়েছে অতীতে, কোনোটা হবে এখন, আর কোনোটা হবে ভবিষ্যতে। যাবতীয় ইতিহাস সমেত, মহাজাগতিক বিবর্তন, জৈব বিবর্তন ও সামাজিক বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করার এই হল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী পন্থা।'[২০]

কিন্তু নীড্হ্যামের নিউমিনাস? তার কী হবে? এই কাঠামোর মধ্যে কোথায় তার স্থান? নীড্হ্যাম বললেন, স্থান আছে বইকী। শুদ্ধ-পবিত্রকে, অনির্বচনীয়কেও এই ইহজগতের মধ্যেই স্থাপন করতে হবে। ১৯৩০ সালের এক লেখায় বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত রাশিয়ায় শ্রমিক-সহমর্মিতা সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করছেন: 'একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে সম্পদ আর সম্পদের সুবিধাগুলিকে বণ্টনের ওপরেই কমিউনিজ়মের মনোভাব নিবদ্ধ। কিন্তু একটি ধর্ম হিসেবে কমিউনিজ়ম তার ভিত গড়ে চলেছে শ্রমিকে-শ্রমিকে সুগভীর সহমর্মিতার ওপর। প্রতিদিনের জীবনে সেই সহমর্মিতা এক বিরাট ভূমিকা পালন করে।... সেই ভূমিকার বিরাটত্বকে স্বীকার করতে চায় না বাইরের পর্যবেক্ষকরা।'[২১] প্রায় রবীন্দ্রনাথের ঢঙেই তিনি বলছেন প্রতিদিনের জীবনেই মহতের আভাস পাই আমরা; অধিকাংশ লোক অবশ্য ধরতে পারে না সেই সত্যটা। প্রতিষ্ঠিত মার্ক্সবাদী চিন্তাপথ থেকে একটু সরে গিয়ে ১৯৩১ সালে তিনি বললেন: 'কমিউনিজ়মের কূট সমস্যাটা এইখানেই নিহিত— আজকের দুনিয়াতে যারা নিজেদের তাবৎ ধর্মের শত্রু বলে ঘোষণা করেছে, তারাই আসলে গস্পেল-এর বাণীকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছে। একথা আমি মনে না-করে পারি না যে গস্পেল-এর যিনি কেন্দ্রীয় চরিত্র তিনি এই ঘটনাতে স্বস্তি লাভ করেন, এতটাই স্বস্তি যা বেশির ভাগ খ্রিস্টানের কল্পনার বাইরে। কেননা অনিন্দনীয়ের (ঈশ্বরের রাজত্ব) আবির্ভাব যখন ঘটবে, তখন নিন্দনীয়ের (প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম) তিরোভাব ঘটবে। জন লিউয়িসের কথায় বলতে পারি, "ধর্মকে আগে মরতে হবে, একমাত্র তাহলেই ন্যায়পরায়ণ এক সমাজব্যবস্থায় পূত আত্মারূপে তার পুনর্জন্ম ঘটবে।" '[২২] অর্থাৎ উৎপন্ন সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, ন্যায়পরায়ণ এক সমাজব্যবস্থার মানবিক সম্পর্কগুলির অ-বৈষয়িকতার মধ্যেই শুদ্ধ-পবিত্রের অধিষ্ঠান।

১৯৩১-এর এই ভাবনা যে নেহাৎ সাময়িক উচ্ছ্বাস নয়, তার প্রমাণ হল, ১৯৭০ সালে চিনের বিপ্লবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন: '...মার্ক্সবাদের মধ্যে একটা কূট সমস্যা আছে— একদিকে তা যাবতীয় ধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে, অন্য দিকে তা অনুগামীদের উদ্দেশে বৈপ্লবিক আত্মত্যাগের আহ্বান জানায়। চিনে সেই আহ্বান সর্বতোভাবে সার্থক হয়েছে; এই আহ্বানের মধ্যে স্পষ্টভাবেই মূর্ত হয়ে ওঠে সেই শুদ্ধ-পবিত্র অনির্বচনীয়, সেই কলুষহীনতার বোধ।'[২৩] মাও জেদংকে তিনি

নন্দিত করেন এই ভাষায়: '...মাও জেদং যে সেই শুদ্ধ-পবিত্র অনির্বচনীয়ের মূর্ত রূপ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ চিনে নীতিশাস্ত্র সর্বদাই শুদ্ধ-পবিত্র অনির্বচনীয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ছিল।'[২৪]

চিনের বহু-বিতর্কিত সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে সমর্থন করেছিলেন তিনি। সেই সমর্থনের পেছনেও তাঁর প্রধান যুক্তি ছিল নৈতিকতা— ব্যক্তিমানুষের আত্মবিশ্লেষণ। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় আওয়াজ উঠেছিল: 'নিজের সঙ্গে লড়াই করো, বিশেষাধিকার বর্জন করো।' এই স্লোগানটিকে নীড্হ্যাম 'মার্ক্সবাদী চিন্তাধারায় অতীব বিশিষ্ট এক সংযোজন' বলে বর্ণনা করেছিলেন। কেননা এর মধ্যে দিয়ে 'মানুষের নিজের প্রতি এক দ্বান্দ্বিক মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে।... আমাদের বুঝতে হবে নিজের মধ্যে যেসব অশিব উপাদান রয়েছে সেগুলোর বিরুদ্ধেও লড়াই না-করলে আমাদের চলবে না।'[২৫]

নৈতিকতাকে হতে হবে শুদ্ধ-পবিত্র অনির্বচনীয়ের অনুসারী, অথচ তাকে অতিলৌকিক হলে চলবে না, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সঙ্গেও সম্পর্ক থাকলে চলবে না। বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদ্, মার্ক্সবাদ-অনুরাগী, সমাজতন্ত্রবাদী অথচ ব্যক্তিগত স্তরে অনির্বচনীয়ের উপাসক নীড্হ্যামের এতটাই চাহিদা। মার্ক্স বাদের পরিচিত গণ্ডির মধ্যে এর সন্ধান মিলল না। অনুসন্ধানী নীড্হ্যাম তাই শেষ পর্যন্ত তাওবাদের এক ভাষ্য রচনা করে বললেন, তাওবাদ সেই অনির্বচনীয়ের সাধনা করে বটে, কিন্তু তার জন্যে কোনো অতিলৌকিকের আশ্রয় নেয় না। লৌকিক প্রকৃতির মধ্যেই তা সেই অনির্বচনীয়কে পেয়ে যায়। সেখানে মানুষের 'অন্তর্জাত নৈতিকতা'র কথা বলা হয়, বাইরে থেকে 'দশ অনুশাসন' মুখস্থ করানো হয় না। এর সঙ্গে তিনি মেলালেন কন্ফুশীয় নীতিশাস্ত্রকে, যেখানে সমাজের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যক্তিমানুষের ইহলৌকিক আচরণকে কী করে অনিন্দ্য করে তোলা যায়, সেটাই প্রধান আলোচ্য। মাও জেদং-কে তিনি সেই ইহলৌকিক নীতিশাস্ত্রের আধুনিক অনুসারক মনে করতেন, আধুনিক যুগে সেই নীতিশাস্ত্রের সংস্কার করে যিনি মার্ক্সবাদের সঙ্গে তার অন্বয় সাধন করতে চেয়েছেন। রাজনীতির সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক স্থাপিত না হলে মানুষের মুক্তি নেই, এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল নীড্হ্যামের। মাওয়ের মধ্যে সেই সম্মিলনের চেহারা, সেই শুদ্ধ-পবিত্র অনির্বচনীয়ের প্রভা দেখতে পেয়েছিলেন তিনি।

উপসংহার

একদিকে প্রকৃতি-অতিক্রান্ত কলুষহীনতা, অন্য দিকে বাজারি তাড়নার শৃঙ্খলমুক্ত ব্যক্তিমানুষের একান্ত নিজস্ব আত্মিক সৃজনশীলতার মধ্যে মানুষের মুক্তির সন্ধান

করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই মুক্তি অর্জনের সাধনাকে বলেছিলেন মানুষের ধর্ম। কিন্তু তার জন্য সবার আগে এই মুনাফা-সর্বস্ব সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করা দরকার, এই উপলব্ধির দ্বারপ্রান্তে এসেও তিনি থমকে গিয়েছিলেন, বদলাতে পারেননি নিজের শ্রেণি-অবস্থান। জয়ী হয়েছিল তাঁর সেই জগদ্বিখ্যাত 'ইন্‌কন্‌সিস্টেন্সি'ই। পক্ষান্তরে, নীড্‌হ্যাম শ্রেণিহীন সমাজে মানুষে মানুষে সহমর্মিতার স্বাভাবিক বন্ধনের মধ্যে, লৌকিক প্রকৃতির মধ্যেই শুদ্ধ-পবিত্র অনির্বচনীয়ের, তাঁর 'নিউমিনাস'-এর সন্ধান করেছিলেন। সেই সমাজে পৌঁছবার যে-সংগ্রাম তাতে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়েছিলেন, বদলে ফেলেছিলেন নিজের শ্রেণি-অবস্থান। সেটাই ছিল তাঁর মানুষের ধর্ম।

২০০৭ সালের ঠিক এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে, শ্রেণিহীন সমাজ-স্থাপনের আশা যখন দূরপরাহত, তখন কেউ কেউ হয়তো বলবেন, রবীন্দ্রনাথের ওই থমকে-যাওয়াটাই দূরদর্শী এবং বাস্তবসম্মত; নীড্‌হ্যামের বহু-সম্মিলনের পথটাই বরং অবাস্তব দূরকল্পনায় আক্রান্ত। বিলম্বে-জাগত মুনাফা-সর্বস্বতার অহিফেনে আচ্ছন্ন আজকের চিন নীড্‌হ্যামের যাবতীয় নৈতিক মূল্যবোধের মূর্তিমান পরিহাস হয়ে মানুষের ধর্মকে বিদ্রূপ করে চলেছে। শুদ্ধ-পবিত্র অনির্বচনীয়ের সঙ্গে, নৈতিকতার সঙ্গে রাজনীতির আদৌ কোনো সম্পর্ক আছে, এ কথা শুনলে সেই ইঁদুর-শিকারিরা হাসবেও না। আর রাশিয়া? ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব মানুষের ধর্মের বিপরীত— রবীন্দ্রনাথের এই বাণীর যাথার্থ্য প্রমাণ করবার জন্যই যেন তারা অভ্যন্তর থেকেই নিজেদের শেষ করে দিল: '...শিক্ষাবিধি নিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে— কিন্তু ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেঁকে না— সজীব মনের তত্ত্বের সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তাহলে হয় একদিন ছাঁচ হবে ফেটে চুরমার, নয়, মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হয়ে, কিম্বা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।' (১৯৩০)[২৬]

তা হলে আপাতত কি জিতে গেলেন 'ইন্‌কন্‌সিস্টেন্ট' রবীন্দ্রনাথই? সে কথা বলার সময় বোধ হয় আসেনি। কারণ মনুষ্যত্বের কোন্ ছাঁচ গড়ে তুলে 'মুক্ত' আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নিঃসপত্ন দুনিয়া ভোগ করছে, সেই ভয়ংকর গোপন তথ্যটা নাকি ইদানীং জানাজানি হয়ে গেছে। ঠান্ডা লড়াইয়ের কুয়াশা কেটে যাওয়ার পর হারিকেন কাট্রিনার ঝড়ে তার মুখের আঁচল সরে গেছে, বেরিয়ে পড়েছে এক দানবের মুখ।

নীড্‌হ্যামের প্রয়োজন ফুরোয়নি।

[অবভাস ২০০৭]

স্মৃতি সতত স্নায়ুবন্দি?

নিয়ন্তা কে— প্রকৃতি অর্থাৎ জিন, না লালন-পরিবেশ? Nature, না nurture? মানুষের স্বভাবচরিত্র, দোষগুণ সবই জন্মগত (জিনগত), নাকি যে-পরিবেশে সে বড়ো হয়, সেটাই তাকে গড়ে?

এই বিতর্ক যুগের পর যুগ ধরে মানুষকে উদ্‌ব্যস্ত করে রেখে দিয়েছে। স্বাভাবিক, কেননা বিষয়টা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। যদি জিনই মানুষের যাবতীয় গুণ-দোষের, ক্ষমতা-অক্ষমতার নিয়ন্তা হয়, তা হলে কোনো 'বাহ্য' সংশোধনের সুযোগ আর থাকে না। যে পড়াশুনায় ভালো, সে তার জিনের জন্যেই ভালো, অর্থাৎ সে ভালো হয়েই জন্মেছে।[১] যে খারাপ, সে তার জিনের জন্যেই খারাপ, সে খারাপ হয়েই জন্মেছে। শত চেষ্টাতেও তাকে আর শোধরানো সম্ভব নয়। যে বড়োলোক, সে তার জিনের দেওয়া গুণাবলির দৌলতেই বড়োলোক; যে ভিখিরি, সে তার জিনের 'গুণে'ই ভিখিরি। এক কথায় এটাকে 'জৈনিক অদৃষ্টবাদ' বলা যেতে পারে। জন্মান্তর আর কর্মফলের যে-তত্ত্ব দিয়ে হিন্দুরা বাজি মাত করে, এটা তারই সঙ্গে

তুলনীয়। সমাজের যাঁরা পরিচালক, যাঁদের হাতে সকল ক্ষমতার চাবিকাঠি, তাঁদের কাছে এর চেয়ে সুখের বিষয় আর কী হতে পারে? কারণ একবার এই জৈনিক অদৃষ্টবাদকে 'বিজ্ঞানসম্মত' বলে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে, নিজেদের ক্ষমতা ও বিশেষাধিকারগুলোকে প্রকৃতিদত্ত, সুতরাং ন্যায্য ও অপরিবর্তনীয় বলে প্রচার করা যায়।

অপর দিকে, যদি প্রমাণ করা যায়, চরিত্র গঠনে, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে বিভিন্ন গুণাবলির উদ্ভবের পেছনে সামাজিক ও বাহ্য পরিবেশের প্রভাবটাও কিছু কম নয়, এমনকী হয়তো বেশি, তা হলে পিছিয়ে-থাকা মানুষ ডেঁটে বলতে পারে, বড়োলোকেরা বড়োলোক হয়েছে কোনো অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠত্বের কারণে নয়, স্রেফ কতকগুলো সুবিধেজনক বাহ্য পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে। সেই বাহ্য পরিস্থিতিগুলোকে নিজেদের অনুকূলে বদলে নিতে পারলে গরিবরাও বড়োলোক হতে পারবে, মানীগুণী হতে পারবে। গত শতকের সত্তরের দশকে কলকাতার দেয়ালে দেয়ালে স্লোগান দেখা যেত: সেদিন আর বেশি দূরে নেই যেদিন গরিবরা বড়োলোকদের গায়ের চামড়া দিয়ে পায়ের জুতো বানাবে। এই স্লোগানের ভেতরের কথা ঐটাই।

আপনাপন শ্রেণি ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী উভয় পক্ষই— যাদের 'চালকের দল' আর 'চালিতের দল' বলে খুব ব্যাপক দুটো ভাগে ভাগ করা যেতে পারে— জীববিজ্ঞানকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করে আসছে যুগ যুগ ধরে। হিটলারি সৌজাত্যবিদ্যা আর সোভিয়েত লাইসেংকো-বাদকে এর দুই চরম মেরু যেতে পারে। মাঝামাঝি জায়গায় আছেন সিরিল বার্ট-এর মতো বিজ্ঞানীরা, যাঁরা 'বিজ্ঞানসম্মত' বুদ্ধ্যঙ্কের (আই কিউ) রোলার চালিয়ে শ্রমিক-ঘরের কিংবা কালো ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চান। জীববিজ্ঞান যতদিন মূলত বর্ণনাত্মক স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন চালিতদের এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক দিক থেকে বিশেষ কিছু বলার থাকত না। কিন্তু যখন থেকে জীববিজ্ঞান বিশ্লেষণাত্মক স্তরে উন্নীত হল (ক্রিক্‌-ওয়াটসনের জোড়া-হেলিক্‌স আবিষ্কারকে তার ক্রান্তিসূচনা বলে ধরা যেতে পারে), তখন থেকেই চালিতদের হাতে অনেক তথ্য ও যুক্তি চলে এল।

বৈজ্ঞানিক যুক্তির স্তরে এই দ্বৈরথেরই এক আধুনিক রূপ হল রিচার্ড ডকিন্‌স-দের 'স্বার্থপর জিন' তত্ত্বের সঙ্গে স্টিভেন রোজ়-দের বিতর্ক। প্রাণীবিজ্ঞানী ডকিন্‌সের *The Selfish Gene* বইটির প্রথম সংস্করণ বেরিয়েছিল ১৯১৭ সালে।

সেই বইতে জৈনিক অদৃষ্টবাদের কড়াপাক রূপটি ফুটে ওঠে। স্বভাবতই এ নিয়ে তুমুল বিতর্ক বাধে। পরে ১৯১৭ সালের সংস্করণে ডকিন্‌স একটু ব্যাক-গিয়ার দিয়ে বলেন, জিন নিঃসন্দেহে সজীব প্রাণীর বিভিন্ন আচরণগত বৈশিষ্ট্যের সর্বপ্রধান নিয়ন্তা, কিন্তু জিনই *একমাত্র* নিয়ন্তা নয়।

এর ফলে 'প্রকৃতি-পরিবেশ' বিতর্ক এক নতুন মাত্রা পেল। যাঁরা প্রথম থেকেই উইলসন এবং ডকিন্‌সের ওই চরমপন্থী সমাজ-জীববৈজ্ঞানিক মতবাদের প্রবল বিরোধিতা করে আসছিলেন, স্টিভেন রোজ় তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। রিচার্ড লিওন্টিন এবং লিও কামিন-এর সঙ্গে যৌথভাবে সম্পাদিত তাঁর *Not in our Genes* বইটি খুবই বিখ্যাত। *The Selfish Gene*-এর ১৯১৭ সংস্করণে রোজ়-দের তোলা অনেক আপত্তির উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন ডকিন্‌স। কিছুকাল আগে প্রকাশিত রোজ়ের *Lifelines* বইটিতে এ বিতর্ক অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে।

কিন্তু বিজ্ঞানী হিসেবে রোজ়-এর আসল খ্যাতি অন্য জায়গায়। তিনি আজকে মস্তিষ্ক-স্নায়ুবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ্বের একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বলে স্বীকৃত। তাঁর গবেষণার সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রটি হল *স্মৃতি*। স্মৃতি কাকে বলে? স্মৃতি কতরকম হয়? স্মৃতি কীভাবে গড়ে ওঠে, কীভাবে কাজ করে? স্মৃতির নিবাস কোথায়? কী ধরনের পরীক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করলে এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকভাবে কিছু প্রাথমিক ধারণা গঠন করা যেতে পারে? এই সব অতি জটিল প্রশ্ন নিয়ে তিনি অনবদ্য গদ্যে আলোচনা করেছেন তাঁর *The Making of Memory (From Molecules to Mind)* বইয়ের সাম্প্রতিক (১৯১৭) সংস্করণে। রিচার্ড ডকিন্‌সের উচ্ছ্বসিত, অলঙ্কারবহুল, 'সাহিত্যিক' ঢঙ তাঁর নয়; তিনি লেখেন সংবৃত শৈলীতে, চাপা-ব্যঙ্গে মৃদু-আন্দোলিত এক উপভোগ্য গদ্যে। ব্যক্তিগত নানা প্রসঙ্গ আনেন, কিন্তু সেগুলো অনিবার্যতই তাঁর মূল বিষয়ের অনুগত হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানের দর্শন, বিজ্ঞানের সমাজতত্ত্ব (এই বিষয়টিতে স্টিভেনের স্ত্রী হিলারি রোজ়-এর অবদান বহুস্বীকৃত), সামরিক উদ্দেশ্যে গবেষণাকে চালিত করা, বৈজ্ঞানিক গবেষণার অর্থ-সরবরাহের পিছনে সামরিক শক্তির ভূমিকা ও বিজ্ঞানীদের নৈতিক অসহায়তা[২], এমনকী বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্দেশ্যে প্রাণিহত্যার নৈতিকতা[৩] ইত্যাদি প্রসঙ্গে গভীরদর্শী কিছু মন্তব্য করেছেন রোজ়। বর্তমান রচনায় আমরা অবশ্য সাধারণভাবে জিন-পরিবেশ বিতর্ক নিয়ে, এবং বিশেষভাবে মস্তিষ্কক্রিয়ার সঙ্গে স্মৃতির সম্পর্ক কী তা নিয়ে স্টিভেন রোজ়ের ধারণার ভিত্তিতে কিছু আলোচনার চেষ্টা করব।

ভুল প্রশ্ন

রোজের মতে 'প্রকৃতি *বনাম* পরিবেশ'— সমস্যার এই উপস্থাপনাটাই ভুল। কেননা, বাস্তবে ওইরকম স্বয়ংস্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ, যান্ত্রিক, অ-দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় কোনো কাজ করে না প্রকৃতি। তিনি বলছেন, আচরণগত দিক থেকে যাকে বলা হয় অভিজ্ঞতা, জীববিজ্ঞানের ভাষায় তার নাম হল নমনীয়তা *(plasticity)*। এরই সঙ্গে অন্য একটি গুণ যুক্ত না হলে সপ্রাণ জীব কিছুতেই পরিবেশের সঙ্গে যথাযথভাবে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে না। সেটি হল সুনির্দিষ্টতা *(specificity)*। স্পষ্টতই এ দুটি গুণ পরস্পর বিপরীত। সুনির্দিষ্টতার তাৎপর্য হল, পরিবর্তনহীনভাবে একই ক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা। আর নমনীয়তার তাৎপর্য হল, পরিবর্তনের সাপেক্ষে প্রতিক্রিয়াকে কেবলই বদলাতে বদলাতে চলা। এই দুই বিপরীতধর্মী গুণের দ্বান্দ্বিক টানা-পোড়েনে বজায় থাকে প্রাণীর সুস্থিতি *(stability)*। প্রকৃতির কেবলই বদলে-চলা উদ্দীপনার সঙ্গে তাল রেখে প্রতিনিয়ত যে সঠিকভাবে সাড়া দিতে পারবে, যে সঠিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে, সেই হবে সফল। এই শিক্ষাগ্রহণের প্রক্রিয়াটা নির্ভর করে নমনীয়তা আর সুনির্দিষ্টতা— ওই দুই গুণের ওপরে। জীববৈজ্ঞানিক অর্থে 'সফল' কোনো প্রাণী প্রকৃতির কাছ থেকে যে অপরিবর্তনীয় জিনসম্ভার নিয়ে জন্মাচ্ছে, সেই সব জিনই তাকে পটু করে তুলছে পরিবেশের পরিবর্তন অনুযায়ী সঠিকভাবে নমনীয়ভাবে সাড়া দিতে। জিনের নির্দেশের সুনির্দিষ্টতা, আর প্রাণীর আচরণের নমনীয়তা, এই দুটো জিনিস একটাই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার অঙ্গ। সুতরাং প্রকৃতি *বনাম* পরিবেশ নয়, প্রশ্নটা হওয়া উচিত প্রকৃতি *এবং* পরিবেশ।

উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। রোজ় বলছেন, বাইরের জগৎ সম্বন্ধে আমাদের মস্তিষ্ক যেসব তথ্য গ্রহণ করে, তার অনেকটাই আসে চোখের মারফত। অথচ আমাদের মাথা আর চোখের অবস্থান এমনই যে বহির্বিশ্বের সাপেক্ষে তা কেবলই বদলে বদলে যায়। মজার ব্যাপার এই যে তা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু ত্রিমাত্রিকভাবে বহির্বিশ্বের সাপেক্ষে নিজেদের অবস্থানকে সুস্থিতভাবে বুঝে নিতে পারি, সেই অনুযায়ী চলাফেরা করতে পারি, কাজকর্ম করতে পারি, সিদ্ধান্ত নিতে পারি, এমনকী প্রকৃতিকে বদলাতেও পারি। আরও বড়ো কথা হল, আমাদের শরীরের কোষগুলি মরে যায়, তার জায়গায় আসে নতুন কোষ। সারা জীবন ধরে আমাদের শরীরের অণুগুলি বদলে বদলে যায়। তবু, এত সব উত্থানপতনের মধ্যেও আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে এই সব স্মৃতি, এই সব অভিজ্ঞতা, সুশৃঙ্খলভাবে ধরা থাকে সারা জীবন। যখন এর ব্যত্যয় ঘটে তখনই অ্যালঝাইমার্স বা অনুরূপ কোনো স্মৃতিঘটিত রোগ দেখা দেয়। এটা কী করে হয়, তার পুরো উত্তর এখনো জানে না জীববিজ্ঞান,

কিন্তু ঘটনাটা অনস্বীকার্য।[৪]

স্মৃতির উপমা

অভিজ্ঞতা, স্মৃতি আর শিক্ষাগ্রহণ— এই তিনটি ব্যাপার যেন হাত ধরাধরি করে চলে। কাকে বলে স্মৃতি? এ প্রশ্নের জীববৈজ্ঞানিক উত্তর খোঁজার আগে রোজ় একটা কথা পরিষ্কার করে নেন যে, একজন ব্যক্তিমানুষের স্মৃতি কোনো সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। তাঁর কথায়ঃ 'আমাদের স্মৃতি আমাদের নিজস্ব, সেটা ঠিক; কিন্তু আমাদের মস্তিষ্কের ভেতরকার স্মৃতি সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডগুলো বাইরের পরিবেশের দ্বারাই প্রভাবিত হয়— যে পরিবেশ সামূহিক, সামাজিক।' কীভাবে আমাদের স্মৃতিকে ব্যবহার করব, প্রযুক্তি (যা সামাজিকভাবে উদ্ভব লাভ করে) তাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। এই ই-মেল, ভয়েস-মেল, মোবাইল ফোনের যুগে আমরা স্মৃতি ব্যাপারটাকে যেভাবে কাজে লাগাচ্ছি, আগে তা ভাবতেই পারতাম না। আবার, লিখন আবিষ্কার হওয়ার আগে স্মৃতিকে আমরা যেভাবে ব্যবহার করতাম, আজকের দিনে তা অভাবনীয়। যখন ভাবি গোটা ঋক্‌বেদ মানুষের স্মরণে আঁকা ছিল, তখন অভিভূত হয়ে পড়তে হয়। সক্রেটিস নাকি মনে করতেন, অলিখিত আকারে যে স্মৃতি মানুষের মনে থাকে, সেটাই শুদ্ধ, সেটাই মানবিক স্মৃতি, কেননা তার সবটাই মানুষের মনের মধ্যে থাকে; অপরদিকে লিখিত স্মৃতি মানেই হচ্ছে, মনের ভেতরকার শুদ্ধ একটা জিনিসকে বাইরে এনে জাত খোয়ানো! জ়াইরে-র এক চারণকবিকে তাঁর অঞ্চলের এক বীর নায়কের কাহিনীগুলি বলতে বলায় তিনি থ। আলাদা করে ওসব কাহিনি তিনি কী করে বলবেন? পুরো বীরগাথা তাঁর কণ্ঠস্থ, সেই গাথা তিনি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গেয়ে শোনাতে পারেন, কিন্তু তার থেকে কাহিনি অংশটুকু আলাদা করে বলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এ-ও এক ধরনের 'শুদ্ধ' স্মৃতি। এখান থেকেও বোঝা যায়, সামাজিকভাবে উদ্ভূত প্রযুক্তি কীভাবে স্মৃতির ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে।

স্মৃতি নিয়ে মানুষ যুগে যুগে কী ভেবেছে, স্মরণশক্তিকে কীভাবে কাজে লাগিয়েছে, তার একটি কালানুক্রমিক, বিশ্লেষণাত্মক, মনোগ্রাহী ধারাবিবরণী দিয়েছেন রোজ়।[৫] তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার সুযোগ এখানে নেই, আমাদের বর্তমান প্রয়োজন অনুসারে কেবল একটি বিশেষ দিকের প্রতি তাকাব। রোজ় যে জিনিসটাকে 'স্মৃতির উপমা' ('metaphors of memory') নাম দিয়েছেন, বিজ্ঞানের ইতিহাসে মোটের উপর তার তিনটে রূপ দেখতে পাওয়া যায়: ১) কাব্যিক উপমা, ২) ভাবাত্মক (evocative) উপমা এবং ৩) গঠনগত বা সংস্থানিক উপমা।

কাব্যিক উপমার সুপরিচিত উদাহরণ হল রাদারফোর্ডের পরমাণু-কেন্দ্রকের বর্ণনা। তাঁর বর্ণনায়, কেন্দ্রকের চারপাশে ইলেকট্রনগুলি ঠিক সেইভাবেই

পাক খাচ্ছে যেভাবে সূর্যকে ঘিরে পাক খায় গ্রহেরা। এটা নিছক উপমাই। একটা পরিচিত প্রক্রিয়ার উপমা। এমন একটা কিছু, স্মৃতিতে যার অবস্থান খুব দৃঢ়। সৌরজগতের সঙ্গে তুলনা দিয়ে দৃষ্টি-অগোচর পরমাণু-জগতের একটি 'দৃশ্য' ছবি যেন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন রাদারফোর্ড, যাতে ওই তত্ত্বের অবধারণ সহজ হয়।

স্মৃতির *ভাবাত্মক* উপমার দৃষ্টান্ত হিসেবে রোজ উল্লেখ করেছেন প্রাক্-কোপার্নিকাস ভূকেন্দ্রিক তত্ত্বের। অ্যারিস্টটলীয় তত্ত্বের প্রভাবে তখন মনে করা হত, যা কিছু চলছে, হয় কোনো কিছু তাকে ঠেলছে, না হয় টানছে। তাই সেখানে ঘোড়ায় টানা অগ্নিরথের উপমার সাহায্যে পৃথিবীর চারপাশে সূর্যের পরিক্রমণকে 'ব্যাখ্যা' করা হত। চেনা কল্পনার অনুষঙ্গে অচেনা জগতের চলনকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই উদাহরণে।

গঠনগত উপমার ব্যাপারটি অনেক জটিল ও বাস্তবনিষ্ঠ। সতেরো শতকে উইলিয়াম হার্ভে রক্তের সংবহনের ব্যাপারটি প্রমাণ করলেন, বললেন, হৃৎপিণ্ড জিনিসটা আসলে একটা পাম্প। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্তকে তা কেবলই পাম্প করে সারা দেহে সংবহন করে চলেছে। এই উপমা আগের দুটি উদাহরণের চেয়ে অনেক সুনির্দিষ্ট এবং বিশিষ্ট। সংবহনতন্ত্রের মধ্যে হৃৎপিণ্ড জিনিসটা যে-কাজ করে, তার সঙ্গে একটা সত্যিকারের পাম্পের কাজকর্মের বাস্তবিকই অনেক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সে পাম্প আজকের যুগের, এমনকি ওয়াটের যুগের পাম্প নয়। হার্ভের যুগে যেসব পাম্প চালু ছিল, তাতে একেকটা প্রকোষ্ঠকে একবার ভর্তি একবার খালি করার পদ্ধতি প্রয়োগ করা হত। হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠগুলিতেও রক্ত একবার ঢোকে, একবার বেরোয়। এখানে উপমান আর উপমেয়ের মধ্যে বাস্তবসঙ্গতি অনেক বেশি।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগঠনে বা ব্যাখ্যায় এই তিন রকমের উপমার ব্যবহার লক্ষ করেছেন রোজ়। এই তিনটি ক্ষেত্রেই স্মৃতির ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। তিনটি ক্ষেত্রেই স্মৃতিতে আগে থেকেই যার উপস্থিতি প্রবল, এমন কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করে অন্য একটা তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য, ব্যাখ্যেয় জিনিসটা যাতে মনের মধ্যে একটা স্পষ্টগ্রাহ্য রূপ ধারণ করে এবং চেনাজানা অন্যান্য তত্ত্বের সঙ্গে যাতে তা সমঞ্জস হয়।

স্মৃতি কী?

অনুষঙ্গ পদ্ধতিতে একটা চেনা বা জানা জিনিসের সঙ্গে অন্য একটা কিছুকে জুড়ে দিতে পারলে, মনে রাখার কাজটা সহজ হয়, এটা প্রমাণিত। এই ব্যাপারটা যে কোনো না কোনোভাবে স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত, তা অনেক কাল ধরেই একরকম করে জানা ছিল। স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে বার্তা পরিবহণ কীভাবে ঘটে? শরীরে মোটামুটি

দু ধরনের যোগাযোগ-ব্যবস্থা রয়েছে। একটি হল, রাসায়নিক বার্তা প্রেরণের ধীরগতি-ডাকব্যবস্থা। অন্যটি, স্নায়বিক বার্তা-প্রেরণের দ্রুতগতি বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা। এই দুই ব্যবস্থার সক্রিয় সমন্বয়ে আমরা বাইরের জগতের সঙ্গে কারবার করি। সেই সক্রিয় সমন্বয়টা এইভাবে কাজ করে: কোনো একটা স্নায়ুর প্রান্তে, কিংবা দুটি স্নায়ুর সন্ধিতে বাইরে থেকে একটি বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা (স্পন্দ, pulse) এসে পৌঁছনো মাত্রই একটি রাসায়নিক পদার্থ বেরিয়ে আসে। সেই রাসায়নিক পদার্থ আবার অন্য একটি কোষকে উদ্দীপিত করে। এমনিভাবে রিলে রেসের কায়দায় একটা থেকে অন্য কোষে বার্তা এগিয়ে চলে। উদ্দিষ্ট স্নায়ুতে গিয়ে সেই বার্তা পৌঁছবার পর, প্রয়োজনীয় ক্রিয়া ঘটানোর নির্দেশ চলে যায় নির্দিষ্ট অঙ্গের পেশিতে। সে তখন সক্রিয় হয়। ষাটের দশকের মাঝামাঝি এই স্নায়ুক্রিয়ার চর্চার মধ্যে থেকে স্মৃতি সম্বন্ধে কতকগুলো তাত্ত্বিক প্রস্তাব গড়ে ওঠে। জে ডি বার্নাল-এর 'ইতিহাসে বিজ্ঞান'-এর ১৯৬৯ সংস্করণে পাচ্ছি, সম্ভবত 'স্মৃতি হল একটা আলোকচিত্রের মতো জিনিস; তফাত এই যে, সে-আলোকচিত্র সিলভার নাইট্রেটের বদলে নিউক্লেয়িক অ্যাসিডে ছাপা হয়, এবং প্রয়োজনমতো উপযুক্ত উদ্দীপনার সাহায্যে তাদের বার বার জাগিয়ে তোলা যায়।' বার্নাল আরেকটা কথাও বলেছিলেন: 'তবে স্মৃতি যে কেবল একরকমেরই হয়, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। হয়তো স্বল্পমেয়াদি আর দীর্ঘমেয়াদি, দু রকমেরই স্মৃতি আছে।'

গত প্রায় চল্লিশ বছরের গবেষণার ভিত্তিতে এখন নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, স্মৃতি সত্যিই দু রকমের হয়: স্বল্পমেয়াদি আর দীর্ঘমেয়াদি। শুধু তাই নয়, এর আরও অনেক বিভাগ-উপবিভাগ তৈরি করা হয়েছে। একভাগে আছে (কেমন করে) how-ঘটিত স্মৃতি, আরেক ভাগে আছে (কী করে) what ঘটিত স্মৃতি। প্রথমটিকে বলা হচ্ছে procedural বা কর্মপদ্ধতি ঘটিত স্মৃতি, দ্বিতীয়টিকে declarative বা ঘোষণাত্মক স্মৃতি। একটা কাজ— যেমন সাইকেল চড়া— শিখে নিয়ে তাকে মনে রাখাটা হল কর্মপদ্ধতিগত স্মৃতি; আর সাইকেল বস্তুটা কী, কী তার বৈশিষ্ট্য, এক কথায়, সাইকেল কাকে বলে, তা জানাটা পড়ছে ঘোষণাত্মক স্মৃতির আওতায়। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, এই দু ধরনের স্মৃতি দু ভাবে কাজ করে। সাইকেল চড়া একবার শিখলে কেউ ভোলে না। কিন্তু, দেখা গেছে, মস্তিষ্কে আঘাত লাগলে অনেক সময় সাইকেল কাকে বলে সেটাই মানুষ মনে করতে পারে না। আবার এ-ও দেখা গেছে, স্মৃতিভ্রংশের রোগীরা চটপট নতুন নতুন কাজ শিখে ফেলতে পারেন, কিন্তু সেই শেখার প্রক্রিয়াটা মনে করতে পারেন না। তার মানে, how-এর জ্ঞান যত সহজে মনে রাখা যায়, what-এর জ্ঞান তত সহজে মনে রাখা যায় না। ও দুটো স্মৃতির কাজের ধরন আলাদা।

মানুষের জীবনে এই ঘোষণাত্মক স্মৃতির ভূমিকা অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে অনেক বেশি। অন্যান্য প্রাণীর জীবনে কর্মপদ্ধতিমূলক স্মৃতির ভূমিকাই প্রধান। অন্য সব

প্রাণীর তুলনায় মানুষের একটা মৌলিক পার্থক্য এই যে, মানুষ কথা বলতে পারে, যে-কারণে মানুষের বেলায় *বাচিক* স্মৃতির ভূমিকা সমধিক। বাচিক স্মৃতির তাৎপর্য এই যে বাহ্য ক্রিয়াত্মক আচরণ ছাড়াই শিক্ষা গ্রহণ করা ও তা স্মৃতিবদ্ধ করার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। ওইখানেই মানুষের অপরিসীম শ্রেষ্ঠত্ব। তবে রোজ় মনে করিয়ে দিয়েছেন, ভাষার মাধ্যমে স্মরণ করার এই ক্ষমতাটাকে আমরা যতই রহস্যময় মনে করি না কেন, জীববিজ্ঞানের বিচারে পায়রাদের শত শত কিলোমিটার পথ চিনে ঘরে ফেরা, কিংবা কুকুরদের অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় হাজার হাজার স্বতন্ত্র গন্ধ মনে রাখার ক্ষমতাটা এর চেয়ে কিছু কম 'রহস্যময়' নয়।

বরং স্মৃতির যে-বৈশিষ্ট্যটি একেবারে নির্ভেজাল মানবীয়, তা হল এর *সামাজিক* চরিত্র। মানবীয় স্মৃতির এই সামাজিক বৈশিষ্ট্যের দৌলতেই আমরা প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে স্মৃতির নতুন নতুন 'কৃত্রিম' রূপ গড়ে নিতে পেরেছি, যা অন্য কোনো প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের এই সামাজিক বৈশিষ্ট্যই তাকে 'জৈনিক অদৃষ্টবাদ'-এর খপ্পর থেকে মুক্ত করেছে। স্মৃতির এই কৃত্রিম রূপগুলির সুবাদেই মানুষ 'যৌথ স্মৃতি' নামক একটা জিনিস গড়ে তুলতে পারে। এটির অভাবেই অন্য সব প্রাণীর প্রতিটি একক জীবন জন্মের সঙ্গে শুরু আর মৃত্যুর সঙ্গে শেষ হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কিংবা হিটলারের জীবন তাঁদের মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়নি। তাঁদের কণ্ঠ, তাঁদের স্থির ও চলমান ছবি, তাঁদের রচনা, তাঁদের কীর্তি সবই কোটি কোটি মানুষের স্মৃতিতে জেগে রয়েছে প্রযুক্তির সাহায্যে। বস্তুত, যাকে আমরা বলি ধর্ম, ঐতিহ্য, মতবাদ, সে সবই তো এই সামাজিক, যৌথ স্মৃতির ফসল। কী-কী জিনিস স্মরণে রাখতে হবে, কেমন করে রাখতে হবে, কীভাবে তাকে সঞ্চারিত করে দিতে হবে, এ সবই তো মানুষ সামাজিকভাবেই ঠিক করে। সেখান থেকেই বাধে চিন্তাধারার সঙ্ঘাত। মার্ক্স যেটাকে বলেছিলেন উপরিকাঠামো, সেটাও এক অর্থে এই সামাজিক স্মৃতিগঠনের প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। সুতরাং বলা যায়, ব্যক্তিজীবনের গণ্ডি পেরিয়ে সামাজিক জীবনের যে যৌথ-স্মৃতি, সেটাই মানুষকে মানুষ করেছে, অন্য যাবতীয় প্রাণীর থেকে আলাদা করে দিয়েছে। এর বেশির ভাগটারই আধার হল ঘোষণাত্মক স্মৃতি।

এই ঘোষণাত্মক স্মৃতিরও আবার দুটি উপবিভাগ আছে: ঘটনাভিত্তিক (episodic) ও ভাষার্থভিত্তিক (semantic)। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যা শিখছি (হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি!) ও মনে রাখছি, সেটা হল ঘটনাভিত্তিক স্মৃতি। আর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার বাইরের যা-কিছু জানছি ও মনে রাখছি, তা হল ভাষার্থভিত্তিক স্মৃতি। ১৯১৭-য় রুশ বিপ্লব হয়েছিল, এটা আমার ভাষার্থভিত্তিক স্মৃতি, আর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরে দাঙ্গা হয়েছিল, এটা আমার ঘটনাভিত্তিক স্মৃতি।

স্মৃতির এই বর্গীকরণের পেছনে প্রাথমিক পর্যায়ে স্নায়ুবিজ্ঞানী অপেক্ষা মনস্তত্ত্ববিদদের অবদানই বেশি ছিল। এই শ্রেণিবিভাগকে মেনে নিয়ে স্টিভেন রোজের মতো স্নায়ুবিজ্ঞানীরা দুটি মৌলিক প্রশ্ন তুললেন। এক, এই যে এত রকমের স্মৃতি, এদের কাজ করার জন্য কি মস্তিষ্কে আলাদা আলাদা জায়গা নির্দিষ্ট আছে, নাকি গোটা মস্তিষ্কটাই এই সবকটা স্মৃতিপ্রক্রিয়ার সঙ্গে আগাগোড়া জড়িত? দুই, স্মৃতি গঠন করা মানেই হল পরিবর্তন, শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় পরিবর্তন। তাই যদি হয়, তা হলে এই পরিবর্তনগুলো কি স্মৃতির উপরি-উক্ত বিশেষ বিশেষ ধরন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়? এই দ্বিতীয় প্রশ্নটিই স্টিভেন রোজের গবেষণার বিশেষ ক্ষেত্র।

কুক্কুট-মস্তিষ্ক: রোজের গবেষণা

এই গবেষণায় রোজ পূর্বসূরিদের ও সহকর্মীদের সাহায্য নিয়ে এক বিচিত্র পরীক্ষানিরীক্ষার ধারা গড়ে তুললেন। গত তিরিশ বছর ধরে এই কাজেই তাঁর দিন কাটছে।

ডিম-ফুটে সদ্য বেরনো মুরগি-ছানাদের তিনি পাভলভীয় পদ্ধতিতে কয়েকটা কাজ শেখান। যেমন, একটা কাঠির মুখে মিষ্টি-জল লাগানো লাল পুঁতি বসিয়ে ছানাটার মুখের সামনে ধরেন। সে ঠোকরায়। স্বাদটা তার ভালো লাগে। সে বারবার ঠোকরায়। অবশেষে মিষ্টি-জল বিহীন শুধু লাল পুঁতি বসানো কাঠিতেও ঠোকরায়। পরে তেতো-জল মাখানো সবুজ পুঁতি নিয়ে তার সামনে ধরেন। সে ঠোকরায়। স্বাদটা তার ভালো লাগে না। সে বিরক্ত হয়ে সরে যায়। অবশেষে সবুজ পুঁতি লাগানো কাঠি দেখলেই সে সরে যায়। এবার তেতো-মিষ্টি কোনো কিছুই না দিয়ে শুধু পুঁতি বসানো কাঠি তার সামনে ধরা হয়। ছানাটা প্রথমে একটু ইতস্তত করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুঁতির ধারেকাছেও আসে না। সে 'শিখে' গেছে। ভালো-মন্দের প্রভেদ করতে জেনে গেছে। সিদ্ধান্ত নিতে শিখে গেছে।

এইবার ওই 'শিক্ষিত' ছানাদের মস্তিষ্ক আলাদা করে নিয়ে স্বাভাবিক, অর্থাৎ 'অ-শিক্ষিত' (বা শুধুই প্রকৃতির হাতে শিক্ষিত) মুরগি ছানাদের মস্তিষ্কের সঙ্গে তাদের তুলনা করে রোজ দেখতে থাকেন, মস্তিষ্কের কোন কোন অংশে কী ধরনের প্রাণ-রাসায়নিক ও কাঠামোগত পরিবর্তন এসেছে। সেই পরিবর্তনগুলোই স্মৃতি। এর জন্য তাদের মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট অঞ্চলে তেজস্ক্রিয় সন্ধায়ক ইনজেক্ট করতে হয়। তার সাহায্যে বোঝা যায়, ওই শিক্ষাগ্রহণের প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের কোন জায়গায় কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে। সেই সব পরিবর্তনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, তাদের নিয়ে সূক্ষ্ম-জটিল নানারকমের পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে থেকে হয়তো একদিন মানুষের স্মৃতি

নিয়েও সুনির্দিষ্ট কোনো তত্ত্ব প্রণয়ন করা যাবে, এরকমই আশা তাঁর।[৬] তবে সে অনেক শতাব্দীর না হোক, অনেক দশকের মনীষীর কাজ তো বটেই। তবে এরই মধ্যে অন্তত কিছু ভ্রান্ত ধারণার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেছে। যেমন, এক সময় একটা ভাবনা চালু হয়েছিল যে, মস্তিষ্কে স্মৃতির ভারপ্রাপ্ত একটা কোনো বিশেষ অণু থাকে, যাকে স্মৃতি-অণু বলা হয়েছিল। কিন্তু ওরকম কিছু যে হয় না, স্মৃতি যে একটা বহুমাত্রিক চলমান প্রক্রিয়া, তা যে একটা কোনো বিশেষ করিৎকর্মা অণুর কেরামতির ব্যাপার নয়, সেটা এখন বোঝা গেছে। আরেকটা জিনিসও মোটামুটি পরিষ্কার করে জানা গেছে। সেটা এই যে, শিক্ষাগ্রহণ করবার (যেমন তেতো-মিষ্টি প্রভেদ করবার, এবং সে-প্রভেদ মনে রেখে দেওয়ার) সুনির্দিষ্ট দৈহিক উপকরণগুলো প্রকৃতির কাছ থেকে, অর্থাৎ জিনের কাছ থেকে পেয়েই জীব জন্মায়; কিন্তু সেই উপকরণগুলো দিয়ে সে ঠিক কী শিখবে, কখন ও কেমনভাবে শিখবে, কত ভালো করে শিখবে, এবং শিখে কোন কাজে লাগাবে, সেটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তার পরিবেশের ওপর। সেটা মোটেই পূর্ব-নির্দিষ্ট নয়। অচেনা পরিবেশের প্রয়োজন অনুযায়ী, অপরিচিত উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়ায় নিজের আচরণকে বদলে নেওয়ার ক্ষমতা যে-জীবের যত বেশি, যে যত নিখুঁতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, সে তত বেশি সফল হবে।

সুতরাং আমরা যেখান থেকে আরম্ভ করেছিলাম, সেখানেই এসে শেষ করতে পারি। প্রশ্নটা জিন *বনাম* পরিবেশ নিয়ে নয়, জিন *এবং* পরিবেশ নিয়ে। এরই নিরন্তর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ভেসে-ডুবে, আঘাত খেয়ে বেঁচে, কিংবা আঘাত খেয়ে মরে, সংশয়ের ঠেলায় হাবুডুবু খেতে খেতে, এগিয়ে চলেছি আমরা, কালের স্রোতে, রসের স্রোতে, স্মৃতিরও স্রোতে। স্মৃতিভারে কে পড়ে থাকবে, কী পড়ে থাকবে, আর স্মৃতিভারমুক্ত কে কোথায় গিয়ে ঠেকবে, কে জানে!

সূত্রনির্দেশ

১. বিদ্যাসাগরের অনন্যতার মূলে তাঁর জিনের অবদানই সমধিক বলে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল: '...সে চরিত্রের ছাঁচ ছিল ভালো। ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বপুরুষের মধ্যে মহত্ত্বের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত ছিল।' এই কথা বলে রবীন্দ্রনাথ সবিস্তার বিদ্যাসাগরের ঠাকুরদাদা, বাবা ও মা-র চরিত্র—বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে ভুল হয়তো কিছু নেই; তবু কয়েকটা প্রশ্ন আছে। এক, ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যান্য ভাইবোনের মধ্যে ওই মহত্ত্ব প্রকাশ পেল না কেন? তাঁদেরও তো 'ছাঁচ' ওই একই। দুই, যাঁদের কাছ থেকে তিনি ওই ছাঁচ আহরণ করলেন, সেই পিতা-মাতা উভয়ের সঙ্গেই পরিণত বয়সে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক অত খারাপ হয়ে গেল কেন? কেন তিনি পত্র লিখে উভয়কেই জানালেন, 'আর আমার ক্ষণকালের জন্যও সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই'? তিন, বিদ্যাসাগরের পুত্র 'শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী' হল কেন? জিনকে ছাপিয়ে এখানে বাহ্য ঘটনাবলিই কি প্রধান হয়ে উঠল না?

২. রোজ় নিজে তাঁর গবেষণার জন্য সামরিক তহবিল থেকে কোনো টাকা নেন না, যদিও তিনি ভালো করেই জানেন যে, শেষ পর্যন্ত সব গবেষণাকেই সাম্রাজ্যবাদী সামরিক স্বার্থে কাজে লাগানো হবে। সেইখানেই তাঁর মতো বিজ্ঞানীদের অসহায়তা।

৩. রোজ় জানিয়েছেন, ব্রিটেনের প্রাণী-অধিকার সংরক্ষণ আন্দোলনের এক কর্মিণী তাঁকে জানান, ভাইরাসদেরও আত্মা আছে, সুতরাং তাদেরও মারবার অধিকার নেই মানুষের। আমাদের দেশের জৈনপন্থীরা এ থেকে উৎসাহ পাবেন আশা করি।

৪. এই বিষয়টিতে সোভিয়েত রাশিয়াতে পাভলভের ছাত্র ও প্র-ছাত্ররা যে-অতি মূল্যবান গবেষণা করেছেন, সে সম্পর্কে ব্রিটেন ও আমেরিকার স্নায়ুবিজ্ঞানীদের অজ্ঞতা রোজ়কে পীড়া দিয়েছে। তাঁর মতে সে অজ্ঞতার প্রধান কারণ হল, ইংরেজি ছাড়া অন্য কোনো ভাষা না-জানা। এক সময় ইংরেজি ছাড়া অন্য অন্তত দুটি ভাষা বিজ্ঞানীদের জানতে হত, তাতে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান লাভবান হত। সে পাট বহুকাল হল চুকে গেছে। তাই রুশ ভাষায় প্রকাশিত অমূল্য গবেষণা পাঠ কবার কোনো দায় বোধ করেন না সাহেব বিজ্ঞানীরা, বিশেষত বলশেভিক আমলের 'কমিউনিস্ট' গবেষণা! সব মিলিয়ে পিছিয়ে যায় গবেষণা। বহুকাল আগে আবিষ্কৃত তথ্য বা তত্ত্ব ফিরে ফিরতি করে আবিষ্কার করতে হয়।

৫. এই পর্যায়ে তাঁব বিবরণ শেষ হয়েছে কম্পিউটারের 'কৃত্রিম বুদ্ধি' সংক্রান্ত আলোচনায়। সে আলোচনা অত্যন্ত মূল্যবান, কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে একটু দূবাগত মনে হতে পারে, সেই বিবেচনায় সেটিকে আপাতত আওতার বাইরে রাখা হল। আসলে ওটি একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়।

৬. বিখ্যাত স্নায়ু-শারীরতত্ত্ববিদ সার জন এক্‌লেস একটি অদ্ভুত দাবি কবেছেন। তিনি বলছেন, ক্রিয়াগত দিক থেকে মানুষের মস্তিষ্কের ডান ও বাম অংশের মধ্যে যে-অপ্রতিসাম্য দেখা যায়, তা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে নেই। এখান থেকে, দেকার্তীয় ধরনে তিনি এই সিদ্ধান্ত করেন যে, মানুষের মস্তিষ্কের ওই বাম অর্ধাংশেই নাকি 'আত্মা'র অধিষ্ঠান। মজার ব্যাপার হল, রোজ় তাঁর গবেষণা থেকে দেখতে পেয়েছেন যে, মুরগিদের ছোট্ট মস্তিষ্কেও অনুরূপ ডান-বাম অসমতা আছে। তা যদি হয়, রোজ় রসিকতা করে বলেছেন, 'সার জন আর আমার এইসব মুরগি, উভয়েরই আত্মা থাকবার সমান সম্ভাবনা!' এটা আবার দেকার্তীয় মতের সঙ্গে বেমানান, কেননা তাঁর মতে একমাত্র মানুষেরই আত্মা আছে, বাকি সব প্রাণী নিছক যন্ত্র। যে কারণে তিনি এতদূর পর্যন্ত বলেছিলেন যে, জ্যান্ত-জন্তুকে কাটলে সে যে-আর্তনাদ করে, সেটা আসলে জং-ধরা মেশিনের ক্যাঁচক্যাঁচ ছাড়া আর কিছু নয়! দেকার্তের এবং সার জনের এই আত্মার ধারণাটি আবার ভারতীয় ঐতিহ্যের আত্মার সঙ্গে মিলবে না। ফলে বিজ্ঞানের মধ্যে একে ঠাঁই করে দিতে হলে অদ্ভুত এক হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। কেননা বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যই হল তার সর্বজনীনতা। বিজ্ঞানের মধ্যে প্রাক্-বৈজ্ঞানিক ধর্মীয় বা দার্শনিক ধ্যানধারণা আমদানি করলে কী ধরনের গাড্ডায় পড়তে হয়, এটি তার এক অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

(পর্বান্তর, অক্টোবর ২০০৪)

বিজ্ঞানের দুই মুখ

লিও জ়িলার্ড (Leo Szilard, 1898-1919) আর এডওয়ার্ড টেলার (Edward Teller, 1908-1920) দুই দিক্‌পাল বিজ্ঞানী। দুজনেরই জন্ম হাঙ্গেরিতে। দুজনেরই শিক্ষার বনেদ তৈরি হয় বুদাপেস্টে। দুজনেই পদার্থবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা পেয়েছেন জার্মানিতে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কয়েকজন পদার্থবিদের কাছে। জ়িলার্ড পড়েছেন আইনস্টাইন, ফন লাউ আর প্ল্যাঙ্ক-এর কাছে, টেলার হাইজ়েনবর্গের কাছে। দুজনেই ফ্যাসিস্টদের গুঁতো খেয়ে উদ্বাস্তু হয়ে কয়েক ঘাটের জল খেয়ে অবশেষে আমেরিকায় গিয়ে কাজ করেছেন। পরমাণু বোমা তৈরির ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দুজনেরই নাম। সাংস্কৃতিক পটভূমি, কার্যক্ষেত্র আর কেরিয়ারের এই মিল চোখে পড়ার মতো।

তবে এঁদের বাকি ইতিহাসটা অমিলের। বিজ্ঞানকে, যুদ্ধকে, শান্তিকে, কর্তৃপক্ষকে দুজনে সম্পূর্ণ আলাদা চোখে দেখেছেন। জ়িলার্ডের কাছে বিজ্ঞান মানুষের শত্রুদের হারিয়ে দেওয়ার হাতিয়ার— সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধজয়ের উপকরণ নয়। ১৯৩২ সালে একটি বিজ্ঞান অধিবেশনে তিনি চিন আক্রমণের প্রতিবাদে জাপানকে বৈজ্ঞানিক দিক থেকে বয়কটের ডাক

দিয়েছিলেন। পরমাণু ফিশনের ঘটনাটি আবিষ্কৃত হওয়ার আগেই তিনি পরমাণু বোমার মূল ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছিলেন, পৃথিবীতে তিনিই প্রথম। গোপনীয়তা রক্ষার জন্য ব্রিটিশ নৌবাহিনীর নামে তার একটি পেটেন্টও নেন ১৯৩৪ সালে। তারপর যখন পরমাণু ফিশনের তত্ত্ব জানা গেল, আর একই সঙ্গে শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তখন তিনি ছুটে গিয়েছিলেন মাস্টারমশাই আইনস্টাইনের কাছে। টেলারও সে দিন সঙ্গী ছিলেন তাঁর। জ়িলার্ডের মুসাবিদা করা চিঠিতে সই করেন আইনস্টাইন, আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে বোঝান যে, এখনি যদি পরমাণু বোমা তৈরি করা না যায়, তা হলে জার্মান ফ্যাশিস্টরা সে-বোমা আগে বানিয়ে ফেলবে। আর তা যদি হয়, তা হলে সভ্যতা বলে আর কিছু থাকবে না। এরই পরিণতিতে অবশেষে মানহাটান প্রকল্প, পরমাণু বোমা নির্মাণ ও জাপানে নিক্ষেপ।

সাধারণভাবে ইতিহাস এইটুকুই বলে। কিন্তু জীবনেরই মতো ইতিহাসে কোনো কিছুই আসলে অত সরল নয়। মানহাটান প্রজেক্ট চলতে চলতেই রুশ বাহিনীর অসীম বীরত্ব ও আত্মত্যাগের ফলে ফ্যাশিস্টরা জোর ধাক্কা খায়। বার্নাল, ব্ল্যাকেট, পেরুৎজ়, জুকারম্যান ও আরো অনেক বিজ্ঞানীর সক্রিয় সহায়তায় ফ্রান্সেও সম্মিলিত ফ্যাশি-বিরোধী শক্তি জিতে যায়। ৭ই মে ১৯৪৫ নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করে জার্মানি। জ়িলার্ড, যিনি ছিলেন পরমাণু বোমার সবচেয়ে বড়ো প্রবক্তা, এইবার তিনি বললেন, যে-উদ্দেশ্যে ওই বোমা তৈরির কথা ভাবা হয়েছিল, সে-উদ্দেশ্য তো সফল, ফ্যাশিস্ট জার্মানি তো পরাজিত। ও দিকে যুদ্ধের পূর্ব অঙ্গনে জাপানও তো হার স্বীকার করল বলে। কাজেই আর দরকার নেই ওই বোমার। এখনই বন্ধ করে দেওয়া হোক মানহাটান প্রজেক্ট। প্রধানত জ়িলার্ডেরই উদ্যোগে একদল বিজ্ঞানী পেশ করলেন বোমা-বিরোধী 'ফ্র্যাঙ্ক রিপোর্ট'। কিন্তু না, কোনো ফল হয়নি। ততদিনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বুঝে গেছে, ওই অস্ত্র আগে হাতে আসা মানে হল যুদ্ধের পর সে-ই হবে দুনিয়ার অধীশ্বর; শুধু ফ্যাসিস্টদেরই নয়, 'গণতান্ত্রিক' সহযোগীদেরও পকেটে পুরতে পারবে। জ়িলার্ড বললেন, তার মানে তো পৃথিবীতে নিরন্তর পারমাণবিক অস্ত্র-প্রতিযোগিতা চলবে। সে তো সর্বনেশে ব্যাপার। তাঁর মনে তখনও আশা, একবার যদি প্রেসিডেন্ট রুজ়ভেল্টের সঙ্গে সরাসরি দেখা করা যায়, তা হলে হয়তো ফল হবে। সেই উদ্দেশ্যে আবার আইনস্টাইনকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে প্রেসিডেন্টের স্ত্রী এলীনর-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে রুজ়ভেল্টের সঙ্গে মিটিংয়ের দিন ঠিক করলেন তিনি। কিন্তু হায়, যা হতে পারত এক ঐতিহাসিক মিটিং, তার মাত্র কয়েকদিন আগে মারা গেলেন রুজ়ভেল্ট। তাতেও হাল ছাড়লেন না জ়িলার্ড। পরবর্তী ট্রুম্যান প্রশাসনের কাছে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। তারা পাত্তাই দিল না তাঁকে। উলটে পরমাণু-বোমার বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য তিনি হয়ে উঠলেন

সন্দেহভাজন। অবশ্য ফৌজি কর্তাদের সঙ্গে কোনোদিনই তাঁর বনত না। মানহাটানে জেনারেল গ্রোভ্‌সের সঙ্গে তাঁর খিটিরমিটির লেগেই থাকত।

শেষ পর্যন্ত বোমা পড়ল জাপানে। বেদনায়, দুঃখে, অপমানে ম্লান হয়ে গিয়েছিল জ়িলার্ডের মুখ। বুঝেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সঙ্গে মানবিক যুক্তি আর বিবেকের ভাষায় কথা বলা যায় না।

জ়িলার্ড যখন বিবেকের সঙ্গে বিজ্ঞানকে মেলাতে না পারার যন্ত্রণায় কাতর, ঠিক সে সময়ে টেলার ব্যক্তিগত উচ্চাশায় বিভোর হয়ে পরমাণু বোমার পরবর্তী পর্যায়ের হাইড্রোজেন বোমা বানানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। একের পর এক দরবার করে যাচ্ছেন তিনি। বোঝাবার চেষ্টা করছেন, কমিউনিস্ট শয়তানগুলোকে শায়েস্তা করার জন্য আরো অনেক অনেক অস্ত্রের ভাণ্ডার গড়ে তোলা দরকার। যুদ্ধের পর সোভিয়েট রাশিয়া তার প্রথম পরমাণু বোমাটি পরীক্ষা করা মাত্রই কপাল খুলে গেল তাঁর। সেনেটে ওপেনহাইমার-এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে পথের কাঁটা সরিয়ে ফেললেন তিনি। লস অ্যালামস-এ প্রায় সমস্ত পদার্থবিদের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল তাঁর, কেননা এঁরা অনেকেই চাননি, হাইড্রোজেন বোমা তৈরি হোক। কিন্তু তাতে দমবার পাত্র নন টেলার। লস অ্যালামসের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে, অনেক তদ্বির করে লিভারমোরে নিজের ঘাঁটি গাড়লেন। মার্কিন সরকার দু-হাত ভরে সাহায্য করল। তিনি হলেন মার্কিন হাইড্রোজেন বোমার 'জনক', মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নয়নের মণি। ফন নিউমান-এর 'গেম থিওরি' তত্ত্বকে যুদ্ধে প্রয়োগের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা তিনিই। বহুলাংশে তাঁরই প্রণোদনায় গড়ে উঠেছিল 'কাউন্টার-ফোর্স স্ট্র্যাটেজি'র তত্ত্ব। যার মূল কথা হল: শত্রুর লড়াই করার ক্ষমতাটাকেই নষ্ট করে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনের তুলনায় বহু বহু গুণ বেশি বোমা ফেলা। এর দরুন যে 'বাড়তি' প্রাণনাশ হবে, তাকে ওঁরা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার বলতেন, 'বোনাস-কিল' বা 'ওভার-কিল', সেটাকে অঙ্ক কষে মাপতেন ! পৃথিবীটাকে বার-পঁচিশেক ধ্বংস করে দেওয়ার মতো বোমা হাতে থাকা সত্ত্বেও কেন যে আরো আরো বোমা বানিয়েই চলতে হয়, তার অন্তত একটা কারণ হল ওই 'কাউন্টার-ফোর্স স্ট্র্যাটেজি'র তত্ত্ব।

সেই থেকে ১৯৩২ সালে মৃত্যুকাল পর্যন্ত মানুষ মারবার জন্য বিজ্ঞানকে কত সুন্দরভাবে কাজে লাগানো যায়, কী করে আমেরিকার সামরিক হাত শক্ত ও অজেয় করা যায়, লিভারমোর ল্যাবরেটরিতে সেটাই ছিল তাঁর ইষ্টমন্ত্র। পরে লস অ্যালামসের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি মিটিয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের তত্ত্বকে আরও নিখুঁত করে তোলার জন্য একাধিক বই লেখেন তিনি। সেই সঙ্গে একের পর এক নতুন ধরনের অস্ত্র বানিয়ে চলেন। রেগ্যানের আমলের কুখ্যাত 'স্টার ওয়ার' প্রকল্পের অন্যতম

প্রবক্তা ও সহায়ক তিনিই। কৃতজ্ঞ রেগ্যান তাঁর গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন অজস্র বড়ো বড়ো মেডেল। ইরাকের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধে নিক্তিমাপা লক্ষ্যবস্তুতে রকেট হানবার যে-সূক্ষ্ম কারিগরি, তার পেছনেও তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। এ সব নিয়ে পরম গর্বিত ছিলেন তিনি। জীবনের একেবারে শেষ দিকে এক সাক্ষাৎকারে বলেন (মূল ইংরেজিতে উদ্ধৃতি দেওয়াই ভালো): I really do not have many regrets, because I have consciously and consistently tried to exercise only one essential influence at the [Livermore] Laboratory— that the role of nuclear arms, and more generally the role of advanced technology in arms for the future, should be carried out in two laboratories rather than one. My original intention was to produce competition so that all the mistakes would not be committed in one place, and that, by competition and collaboration, the development of technology for future military uses should be better controlled and better balanced. [ভাবানুবাদ: আমার বাস্তবিকই তেমন কোনো আফসোস নেই। কারণ আমি সচেতনভাবে এক নাগাড়ে, লিভারমোর লেবরেটরিতে কেবল একটা প্রভাবই খাটাতে চেয়েছি— যাতে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এবং সাধারণভাবে ভবিষ্যতে অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষেত্রে অগ্রসর প্রযুক্তির ভূমিকা নিয়ে দুটো লেবরেটরিতেই কাজ হয়, একটা লেবরেটরিতে নয়। আমার আদি উদ্দেশ্য ছিল প্রতিযোগিতা তৈরি করা, যাতে করে এক জায়গায় সবগুলো ভুলের পুনরাবৃত্তি না হয়; তা ছাড়া, প্রতিযোগিতা আর সহযোগিতার সমন্বয়ে ভবিষ্যতে সামরিক উদ্দেশ্যে প্রযুক্তির বিকাশ যাতে আরও সুনিয়ন্ত্রিত ও সুষম পথে ঘটতে পারে।] বরং মানুষ মারার লক্ষ্যে আরও কিছু করা বাকি রয়ে গিয়েছিল বলেই যেন কিছু আফসোস ছিল তাঁর। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পর্বে সাম্রাজ্যবাদের সেবায় নিযুক্ত বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম মেধাবী ও সবচেয়ে অমানবিক মুখটি টেলারের, এ কথা বললে ভুল হবে না।

আর জিলার্ড? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি যখন দেখলেন, বিবেক ও যুক্তির কথায় শাসকরা কান দেবে না, তখন মনের দুঃখে তিনি পদার্থবিদ্যার চর্চাই ছেড়ে দিলেন। কেননা, মার্কিন চাপে তখন পদার্থবিদ্যার প্রায় সমস্ত গবেষণাই পারমাণবিক যুদ্ধপ্রক্রিয়ার লক্ষ্যে চালিত হচ্ছিল। প্রৌঢ় বয়সে খাতা পেনসিল নিয়ে মলিকিউলার বায়োলজির ক্লাসে ভর্তি হলেন। অচিরেই তিনি ওই ক্ষেত্রেও রীতিমত বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। এরই মধ্যে, ঠান্ডা লড়াইয়ের উত্তেজনা কমানোর জন্য প্রথমে স্ট্যালিন, পরে ক্রুশ্চেভের সঙ্গে দেখা করলেন, যোগ দিলেন পরমাণু অস্ত্র-বিরোধী পাগ্‌ওয়াশ আন্দোলনে। যুদ্ধ নির্মূল করার প্রয়াসে স্থাপন করলেন 'কাউন্সিল ফর এ লিভেব্‌ল

ওয়ার্ল্ড' (পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তোলার সংস্থা)। ১৯৬২ সালের কিউবা-সঙ্কট নিরসনেও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন জ়িলার্ড।

এ থেকে আমরা কী শিখব? অন্তত একটা কথা তো অবশ্যই শিখব যে, বিজ্ঞানচর্চা আপনা থেকেই মানুষের মঙ্গলে লাগে না। তাকে মানুষের মঙ্গলমুখী করে তুলতে হয় সচেতনভাবে, চেষ্টা করে। নইলে এই সাম্রাজ্যবাদী বাজারি স্বার্থে পরিচালিত দুনিয়ায় তা মানুষের সর্বনাশ ঘটাবে। আরো শিখব, বিজ্ঞানীদের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া বিজ্ঞানকে সাম্রাজ্যবাদের মুঠো থেকে বার করে আনা সম্ভব নয়। সেইখানেই লিও জ়িলার্ডের মতো মহানুভব বিজ্ঞানী, তাঁর শান্তিবাদী নরমপন্থী ভূমিকা নিয়েই, আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আর সেই কারণেই, শত প্রতিভা সত্ত্বেও এডওয়ার্ড টেলারের মতো জঙ্গী বিজ্ঞানী আমাদের কাছে ধিক্কারের পাত্র হয়ে থাকবেন।

বিজ্ঞানের এই দুটো মুখই বাস্তব— একটা মানবিক, অন্যটা দানবিক। এর মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হবে। খুব সচেতনভাবে।

আমরা যথেষ্ট সচেতন কি?

[মানবমন]

পাঁচটি বই: অনেক প্রশ্ন, কিছু উত্তর

প্রশ্ন যদি ওঠে: এঁরা কি মহাপুরুষ

সুনীত দে। দে পাবলিশিং, ৬০/৬/১সি, শ্যামপুকুর স্ট্রিট, কলকাতা-৪, ২০০৪। ২৬৪ পৃষ্ঠা, দাম একশো টাকা।

বইটি নিম্নলিখিত অধ্যায়সমূহে বিভক্ত: দেশদ্রোহী রাণী রাসমণি, কিছু প্রাসঙ্গিক কথা, মন্দিরনির্মাণ ও জাগ্রতকরণ, রসুল রামকৃষ্ণ চরিত (জন্মরহস্য, শ্রুতিধর রামকৃষ্ণ, ভাবসমাধি না হিস্টিরিয়া, নারীসুলভ লক্ষণ, রসুল রামকৃষ্ণ এবং জাতপাত, বিয়ে এবং সারদা পুজো, রামকৃষ্ণ উত্থানের আর একটি কারণ, নিজেকে ভগবান ভাবা, নারীবিদ্বেষ, লোকশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ, যত মত তত পথ, টাকা মাটি মাটি টাকা, রামকৃষ্ণ এবং সেকালের মহাপুরুষেরা, স্বাধীনতা সংগ্রামে রামকৃষ্ণ মিশন)।

সুনীতবাবু রামকৃষ্ণ-ফেনোমেনন নিয়ে (অংশত সারদাকে নিয়েও) অকুতোভয়ে আলোচনা করেছেন। অজস্র তথ্য একেবারে মূল আকর-সূত্র থেকে আহরণ করে তিনি দেখিয়েছেন, কত মিথ্যে, কত অর্ধসত্য, কতরকম ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ওপর ওই 'মিথ'টি গড়ে তোলা হয়েছে। রামকৃষ্ণ-বিরোধী নয়, রামকৃষ্ণ-ভক্তদেরই বই থেকে তুলে তুলে

নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করেছেন লেখক। দু-একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। রামকৃষ্ণ অ-ব্রাহ্মণদের হাতে অন্নগ্রহণের ব্যাপারে অতি-সংবেদী ছিলেন (ব্যতিক্রম বিবেকানন্দ), এমনকী তাঁরা পরম ভক্ত ও আচারনিষ্ঠ হলেও। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল জানিয়েছেন, অ-ব্রাহ্মণ ভক্ত লাটু ও গোপাল রামকৃষ্ণের খাট ছুঁয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বলে মৃত্যুশয্যাশয়ী রামকৃষ্ণ পায়েস খেতে অস্বীকার করেন (পৃঃ ৬৬)। অথচ শ্রীম 'কথামৃতে' রামকৃষ্ণের এই ছুঁৎমার্গের ব্যাপারটা 'সচেতনভাবে প্রায় এড়িয়েই গেছেন।' কারণ তাঁর তৈরি 'মিথ'-এ ওটা বেমানান। 'আবার স্বামী সারদানন্দ, অক্ষয় সেন অথবা বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালদের মনে হয়েছে এ আর এমন কি ব্যাপার, তাঁরা লিখে রেখেছেন।' (পৃঃ ১২) অর্থাৎ এঁদের পছন্দসই 'মিথ'-এর সঙ্গে এটা মানানসই।

মিথ বলে, থিয়েটারের অভিনেত্রীদের তিনি পরম স্নেহ করতেন। আসল ঘটনা হল, বারণ করা সত্ত্বেও তাঁদের কেউ কেউ রামকৃষ্ণের পা ছুঁয়ে প্রণাম করায় 'দক্ষিণেশ্বরে এসে আমাদের বললেন — "ওরে, পাটা বড় জ্বালা করছে রে।" রামলাল দাদা তাই শুনে গঙ্গাজল এনে পা ধুয়ে দিলেন, তবে সে জ্বলুনি কমে' (চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, 'শ্রীশ্রী লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা', দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১৫৭-৫৮)। যাঁরা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিনোদিনী।

এমনকী ম্যাক্স মূলর পর্যন্ত তাঁর 'রামকৃষ্ণ-জীবন ও বাণী' (বাংলা অনুবাদ: সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়) বইতে লিখেছেন, রামকৃষ্ণের জীবনীর মধ্যে 'এমন সব অদ্ভুত অতিশয়োক্তি ও স্ববিরোধী কথাবার্তা আছে যাতে তাঁর চরিত্র ও জাগতিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে একটি সত্য ও নির্ভুল ধারণা গঠন করা অসম্ভব বলে মনে হয়।' বিখ্যাত ভৈরবী ব্রাহ্মণীর চরিত্রটাই তাঁর বানানো বলে মনে হয়েছে। এইভাবে রামকৃষ্ণ ভক্তদের লেখা অজস্র জীবনী ঘেঁটে লেখক রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রচারিত বহু কাহিনির অ-নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ করেন।

এর পর রামকৃষ্ণ-জীবনের বিভিন্ন সুপরিচিত ঘটনাকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন— তত্ত্বের আলোকে নয়, সহজ কাণ্ডজ্ঞানের নিরিখে। রামকৃষ্ণের জন্মকালে তাঁর পিতা ক্ষুদিরামের বয়স একষট্টি, মাতা চন্দ্রার বয়স পঁয়তাল্লিশ। এই বয়েসের পুরুষের পিতা হওয়ার ঘটনা খুব বিরল নয়, কিন্তু ওই বয়সের মহিলার মা হওয়া খুব একটা শোনা যায় না। আশ্চর্যের ঘটনা এই যে চন্দ্রা দেবী প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে (ক্ষুদিরামের প্রায় পঁয়ষট্টি) আবার একটি সন্তানের জন্ম দেন। তাঁর এই অস্বাভাবিক— কিন্তু অসম্ভাব্য নয়— অতি-উর্বরতার ঘটনাটি খুবই ব্যতিক্রমী (এবং গ্রাম্য পরিবেশে লজ্জার ব্যাপার) হওয়ায় 'অলৌকিক' অযৌন জননের মিথ চালু করা হয়। আসল ঘটনাটা অবশ্য চন্দ্রা দেবী নিজে জানতেন, নইলে পুত্রের ফিট হলে আর

পাঁচ জনের মতো ওটাকে ভাবসমাধি না বলে 'ওঝা দিয়ে ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থা' ('লীলাপ্রসঙ্গ') করবেন কেন? তাঁর বড়ো মেয়ে, অর্থাৎ গদাধরের দিদিরও ব্যামো ছিল। গঙ্গাধরের পিসি রামশীলা দেবীরও মাঝে মাঝে ভর হত। দেখে, বালক গদাধর বলতেন, 'পিসীর ঘাড়ে যে আছে সে যদি আমার ঘাড়ে চাপে তো বেশ হয়' ('লীলাপ্রসঙ্গ')। শুধু তাই নয়, তাঁর ভাইঝি লক্ষ্মীমণি দেবীরও ভর হত। তিনিও গুরুমা বনেছিলেন। (সূত্র: কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী')। হিস্টিরিয়া রোগ জিন-বাহিত হোক বা না হোক, চাটুজ্যে পরিবারের মধ্যে ওই জাতীয় রোগের প্রাদুর্ভাব যে খুবই বেশি ছিল, সেটা স্পষ্ট। হিস্টিরিয়া রোগ সম্বন্ধে গিরীন্দ্রশেখর বসুর ১৯২৫ সালের মন্তব্য: 'ইহাতে নানা শারীরিক লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে— পেট ব্যথা, মাথায় ব্যথা, বুক ধড়ফড় করা, হাত-পা অসাড় হইয়া যাওয়া, ফিট, পক্ষাঘাতের ন্যায় লক্ষণ, অন্ধতা, বধিরতা ইত্যাদি। শারীরিক লক্ষণ ব্যতীত অনেক প্রকার মানসিক লক্ষণও প্রকাশ পায়; রোগী অকারণে বা সামান্য কারণে হাসে বা কাঁদে; এক বিষয়ে অতিরিক্ত স্বার্থপরতা, অপর বিষয়ে অদ্ভুত নিঃস্বার্থ ভাব দেখায়, কখন কখন পাগলের ন্যায় কথাবার্তা বলে; কখনও বা বহুদিন যাবৎ নিশ্চল অবস্থায় থাকে।' (পৃঃ ৬০-৬১, 'অগ্রন্থিত গিরীন্দ্রশেখর', সম্পাদক: অমিতরঞ্জন বসু)।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে 'ছোটো ভট্‌চায'-এর ওই সব শারীরিক ও মানসিক লক্ষণগুলিকে মথুরবাবু শূদ্র রাসমণির প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের দেবতা সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অসীম ঘৃণা কাটাবার উপায় হিসেবে ব্যবহার করলেন: "অদ্ভুত পূজক পাইয়াছি, দেবী বোধ হয় শীঘ্রই জাগ্রতা হইয়া উঠিবেন" (পৃঃ ৬৩, ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য, 'ঠাকুর রামকৃষ্ণ', দ্বিতীয় সংস্করণ)। এর পরের পর্বে চলল গদাধরকে মথুরের একটানা 'সাজেস্‌শন'— তুমি সাক্ষাৎ ভগবান, তুমি সাক্ষাৎ ভগবান। তোমার ইচ্ছা হলেই লাল জবার গাছে সাদা ফুল ফোটে (হায় মেন্ডেল!)। মথুরবাবুর 'সাজেস্‌শনে' কাজ দিল। নিউরোটিক, দুর্বল, বাল্যাবধি হিস্টিরিক পরিবেশে মানুষ, স্বয়ং হিস্টিরিয়ার লক্ষণাক্রান্ত এই দরিদ্র, গ্রাম্য, মেধাবী, শ্রুতিধর (এবং সেই সুবাদে মৌখিক পুরাণশাস্ত্রে সুপণ্ডিত), সুগায়ক, মিষ্টভাষী ব্রাহ্মণ তরুণটি অবশেষে অটো-সাজেস্‌শন দিতে লাগলেন: হ্যাঁ, আমি সাক্ষাৎ ভগবান; যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ। চলল প্রচার, তৈরি হল মিথ। মথুরবাবুর স্ট্র্যাটেজি সফল হল।

রামকৃষ্ণের শরীরে ও হাবভাবে নারীসুলভ লক্ষণ, বিশেষত gynaecomastia, বেশ প্রকট ছিল। সেটা হরমোনের অস্বাভাবিকতা কি না, সে প্রশ্ন তুলেছেন লেখক। এ ছাড়া, পুরুষ ভক্তদের উলঙ্গ শরীর নিয়ে তাঁর অতিরিক্ত আগ্রহের অনেক

উদাহরণ দিয়েছেন তিনি। স্বামী অখণ্ডানন্দ-র 'স্মৃতিকথা'য় পড়ি: 'সন্ধ্যার পর আরতি হয়ে গেলে তিনি একেবারে উলঙ্গ হয়ে পশ্চিম দিকের বারান্দায় আমাকে একখানা মাদুর দিয়ে বললেন, "পাত।" তারপর একটি বালিশ এনে শুলেন। এর আগেই আমার কোমরের কাপড়ের বাঁধ খুলে দিতে বললেন। বললেন, "মার কাছে যেন ছেলে"।' (পৃঃ ৫০)। আরো অদ্ভুত সব ঘটনার বিবরণ পাই। বিবাহিত, জোয়ান পুরুষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ 'খেলতে খেলতে দৌড়ে এসে আমার কোলে বসে মাই খায়' (লীলামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ)। বেদনাদায়ক, কিন্তু প্রত্যাশিত তথ্যটি এই যে, 'স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্ত্রী বিশ্বেশ্বরী দেবীকে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল।' (পৃঃ ৮৩)। এরকম তাঁর আরও অনেক শিষ্যও নাকি নিজেদের মধ্যে করতেন। যেমন স্বামী অভেদানন্দ নাকি স্বামী সারদানন্দের স্তন চোষণ করতেন (সূত্র: স্বামী অখণ্ডানন্দ, 'স্বামী অন্নদানন্দ', প্রথম সংস্করণ)। রামকৃষ্ণ-শিষ্যদের মধ্যে 'নাগ মহাশয়' (যাঁর প্রশংসায় স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ আপ্লুত) 'দুবার বিয়ে করেছিলেন। আবার বউয়ের সাথে এক বিছানায় শোবার ভয়ে গাছে চড়ে বসে থাকতেন।... পিতার অনুরোধে এক সাধক তাঁকে সংসারী হয়ে সন্তান উৎপাদনে মনোযোগী হতে অনুরোধ করেন। নাগমশায়... একখণ্ড ইঁট নিয়ে নিজের মাথায় আঘাত করে রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়ে বসেন।' অথচ ওই পিতাই রেগে গিয়ে 'তুই ব্যাঙ খা' বলাতে তিনি পিতৃসত্য রক্ষার্থে সত্যি সত্যি মরা ব্যাঙ খেয়েছিলেন। (পৃঃ ৫৫-৫৬)।

যৌনতাকে, এমনকি জীবনকে সুস্থভাবে উপভোগ করার এই অক্ষমতা ফ্রয়েডীয় মতে শৈশবের স্বাভাবিক বিকাশ-পর্বের কোনো ত্রুটির সঙ্গে জড়িত। যাদের শৈশবে কোনো ব্যাহত পর্ব থাকে, তারা 'পরিণত বয়সেও নিজ স্ত্রী বা স্বামীকে ভালবাসিতে পারে না, এবং সংসারে নানা অশান্তির সৃষ্টি হয়। এই কাম-পরিণতির প্রতিবন্ধকতায় বিভিন্ন কামবিকৃতির উদ্ভব হয়।... নানা ধর্মে এবং খ্রিস্টান ও দেশীয় সাধুদের মধ্যে যে শরীর-নিগ্রহ ও বৈরাগ্যের বিধান আছে, তাহার মূলেও ওই বিকৃতি।' (গিরীন্দ্রশেখর, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৮০)।

সমাজভীতি, বাস্তব জগৎ-ভীতি, আত্মভীতি, নারীভীতি ("স্ত্রীলোক গায়ে ঠেকলে অসুখ হয়; যেখানে ঠেকে সেখানটা ঝনঝন করে, যেন শিঙি মাছের কাঁটা বিঁধল"— কথামৃত), অমূলপ্রত্যক্ষ, অমূলশ্রবণ— সব মিলিয়ে এ এক ভয়ানক শ্বাসরোধকারী, মানবতা-বিরোধী, অসুস্থ পরিবেশ। রামকৃষ্ণ-ভক্তরা নিজেরাই সবিস্তারে, সগর্বে এই সব বিকৃত আচরণের বর্ণনা ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। এঁরা অনেকেই সুশিক্ষিত ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ। এঁরাও কোনো না কোনোভাবে মানসিক রোগে আক্রান্ত বলে সুনীতবাবু মনে করেন। গিরীন্দ্রশেখরের মন্তব্য হয়তো

তাঁর এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করবে: 'এই সকল রোগীর সঙ্গে কথাবার্তা বলিলে হঠাৎ তাঁহাদের মানসিক বিকৃতির সন্ধান পাওয়া যায় না। অপর সকল বিষয়েই তাঁহারা যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবেন, কিন্তু কোনরূপে তর্কের দ্বারা তাঁহাদের বদ্ধমূল ধারণাগুলির উচ্ছেদ সাধন করা যাইবে না।' (ঐ, পৃঃ ৬৩) ঔপচারিক ধর্মসাধনার আধারে এইসব বিকৃতি সামাজিক অর্থে সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠল, প্রচারের মহিমায় লক্ষ লক্ষ বাঙালির কাছে সুস্থ আদর্শের পরাকাষ্ঠা বলে পূজিত হল। ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি যাকে 'schizoid সমাজ' বলতেন, তারই লক্ষণ এগুলো। আমাদের সমাজের এই বেদনাদায়ক দিকটির তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস সাধারণ পাঠকদের সামনে মেলে ধরবার জন্য সুনীতবাবু অবশ্যই সাধুবাদ দাবি করতে পারেন।

তবে সে-সাধুবাদ অকুণ্ঠ নয়। কারণ, বাহাত্তরটি আকর-গ্রন্থ (যার একটিরও প্রকাশ-কাল ও প্রায় কোনোটিরই প্রকাশকের নাম উল্লেখ করেননি তিনি) এবং কয়েক হাজার 'উদ্বোধন' ঘেঁটে যে-অমূল্য তথ্যসম্ভার তিনি উদ্ঘাটন করেছেন, তার প্রতি সুবিচার করার মতো উপযুক্ত ভাষার ও তত্ত্বের অবকাঠামো তাঁর আয়ত্তে নেই। তাঁর গদ্য কখনো কখনো মুদ্রণের অযোগ্য পর্যায়ে চলে যায়। মাঝে মাঝেই তিনি তথ্যের সীমা থেকে বেরিয়ে গিয়ে নানারকম ব্যক্তিগত মন্তব্য করেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ইদানীং ইংরেজি ও বাংলাতে যে মূল্যবান কাজ হয়েছে, তিনি সেগুলির সঙ্গেও বিশেষ পরিচিত বলে মনে হয় না। পরের সংস্করণে এই সব ত্রুটি তাঁকে দূর করতেই হবে। আর সেই সঙ্গে সূচিপত্র আর নির্ঘণ্ট যোগ করতে হবে। শুধু সাহস ও কাণ্ডজ্ঞান নয়, তাঁকে মননেরও অধিকারী হতে হবে। নইলে তাঁর এত পরিশ্রম বৃথা যাবে।

অগ্রন্থিত গিরীন্দ্রশেখর (গিরীন্দ্রশেখর বসুর নির্বাচিত রচনা)

সম্পাদক: অমিতরঞ্জন বসু; কথামুখ: আশিস নন্দী। ১৯০ পৃষ্ঠা (+ ছ-টি পূর্ণপৃষ্ঠা ফোটোগ্রাফ)। গ্রন্থালয়, ২০০১। দাম আশি টাকা।

লুম্বিনী পার্কের প্রতিষ্ঠাতা গিরীন্দ্রশেখরের 'স্বপ্ন' বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের একটি ক্ল্যাসিক। কিন্তু 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী' প্রভৃতি কাগজে প্রকাশিত তাঁর অন্যান্য বাংলা রচনার সঙ্গে আমরা পরিচিত ছিলাম না। সম্পাদক অমিতরঞ্জন বসুর কল্যাণে সেই পরিচিতি এতদিনে ঘটল। 'অগ্রন্থিত গিরীন্দ্রশেখর' বইটি থেকে ওপরে ইতিমধ্যেই কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছি। তা থেকে গিরীন্দ্রশেখরের জনবোধ্য বিজ্ঞানরচনার প্রাঞ্জল বস্তুনিষ্ঠ রীতি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই পাঠকের কিছু ধারণা জন্মেছে।

সম্পাদকের সুলিখিত নাতিদীর্ঘ 'অবতরণিকা'-য় গিরীন্দ্রশেখরের এই বাংলা প্রবন্ধগুলি পাঠক কোন চোখে পড়বেন তার ধরতাই দেওয়া হয়েছে। সঙ্কলিত

প্রবন্ধগুলি দুভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে রয়েছে মনস্তত্ত্ব ও মনশ্চিকিৎসা বিষয়ক ছ-টি প্রবন্ধ। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ইচ্ছাকৃত বিকৃতি এড়িয়ে পুরাণের মধ্যে নিহিত ভারতের প্রাচীন 'ইতবৃত্ত' কীভাবে পাঠ করতে হবে সে বিষয়ে পাঁচটি প্রবন্ধ। এ ছাড়া পরিশিষ্টে রয়েছে মূল্যবান কিছু ছবি, একটি 'পদ্যপত্র' এবং 'বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র'। আদিত্যরূপ চক্রবর্তী-কৃত প্রচ্ছদটি সুপরিকল্পিত। গিরীন্দ্রশেখরের একটু আউট-অব-ফোকাস, কিছুটা প্রস্তরমূর্তি-সদৃশ সাদা-কালো ফোটাগ্রাফটি সম্পাদকের মনোভঙ্গিটিকে নিমেষে স্পষ্ট করে দেয়।

গিরীন্দ্রশেখর ভারতের প্রথম ফ্রয়েডীয় 'মনশ্চিকিৎসক' (psychiatrist-এর অমিতরঞ্জন-কৃত এই বাংলাটি ভারি সুন্দর হয়েছে) শুধু নন, তিনি ফ্রয়েডের তত্ত্বকে ছাড়িয়ে গিয়ে মৌলিক ভাবনাচিন্তা ও কাজ করেছিলেন, এটাই তাঁর সবচেয়ে বড়ো পরিচয়। আশিস নন্দী-র ছোটো কিন্তু অত্যন্ত গভীরদর্শী 'কথামুখ'টি এ বইয়ের মর্যাদা বাড়িয়েছে। ফ্রয়েডের তত্ত্বের সঙ্গে গিরীন্দ্রের নিজস্ব ধ্যানধারণার মোকাবিলার (সংঘাতের?) মধ্যে তিনি দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছেন। এক, তাঁর কট্টর ক্লিনিক্যাল অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। "মানসিক রোগীরা তাঁর কাছে কোনদিনই বইয়ে পড়া বিদ্যার প্রতিফলন বা 'উপাত্ত' ছিলেন না", আক্ষরিক অর্থেই রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে আসতেন তিনি। চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাসে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধ বহু পুরনো। কপোলকল্পিত, অপরীক্ষিত দূরকল্পনাভিত্তিক দর্শনকে চিকিৎসাবিদ্যার ঘাড়ে চাপানোর বিরুদ্ধে লড়াই— যদিচ ব্যর্থ লড়াই— করেছিলেন হিপোক্রেটিস ঘরানা। চরক সংহিতার মধ্যে গায়ের জোরে অবান্তর কথা ঢুকিয়ে দিয়ে বৈদ্য-বৈরী ব্রাহ্মণরা আয়ুর্বেদের বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতাবাদের বিরুদ্ধতা করেছিলেন। ইউরোপে রেনেসাঁসের যুগে ক্ষতচিকিৎসায় যিনি যুগান্তর এনেছিলেন, সেই ফরাসি শল্যচিকিৎসাবিদ আঁব্রোআজ় পারে (Ambroise Paré) স্বচক্ষে যা দেখতেন, স্বহস্তে যা করতেন তারই বিবরণ লিখতেন চলতি ফরাসি ভাষায়। ফরাসিতে না লিখে তাঁর উপায় ছিল না, কারণ তিনি পুঁথিগত লাতিনাশ্রিত বিদ্যার প্রসাদবঞ্চিত ছিলেন। জন লকের গুরু ডাক্তার সিডেন্‌হ্যামের চিকিৎসাদর্শনের মধ্যে এই ক্লিনিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। লক নিজে ছিলেন ওস্তাদ সার্জন। তাঁর বিজ্ঞান-দর্শনের ওপর বিশেষ ছাপ ফেলেছিল শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে লিভারের সিস্ট কেটে বাদ দিয়ে রোগীকে সুস্থ করে তোলার বাস্তব অভিজ্ঞতা। তখন এটা নিয়ম ছিল না, ছিল নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। দেহ-চিকিৎসার ক্ষেত্রেই যদি দুই দৃষ্টিভঙ্গির সঙঘাত এত প্রচণ্ড ও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে, তা হলে মনশ্চিকিৎসার ক্ষেত্রে তার তীব্রতা সহজেই অনুমেয়। কেননা, প্রত্যক্ষবাদী ফ্রয়েডের অভ্যুত্থানের আগে অব্দি মনস্তত্ত্ব অধিবিদ্যা আর ধর্মতত্ত্বের কবলে আচ্ছন্ন ছিল। অনুরূপভাবে, গিরীন্দ্রশেখরও যদৃচ্ছ

দূরকল্পনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে রোগ পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়েই মনশ্চিকিৎসায় ব্রতী হন— *ফ্রয়েড পড়বার আগেই* (পৃঃ ১৪)। এই দৃষ্টিভঙ্গি তিনি কীভাবে রপ্ত করেছিলেন, তার 'ইতবৃত্ত' নিয়ে আলোচনা থাকলে আমরা উপকৃত হতাম। কারণ গিরীন্দ্রশেখরের প্রকৃত মৌলিকত্ব ওইখানেই।

আশিস নন্দী কথিত দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হল: ''ভারতীয় 'উচ্চ' ও লোকসংস্কৃতির মাধমে একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে'' তাঁর ব্যবহারিক জ্ঞানকে সাজিয়ে ফেলার প্রচেষ্টা (পৃঃ ১২)। আশিসবাবুর মতে এইভাবেই ইউরোপীয়দের চাপিয়ে দেওয়া প্যারাডাইমের বাইরে গিয়ে মৌলিক এক তত্ত্বকাঠামোর অনুসন্ধান করছিলেন গিরীন্দ্র। প্রশ্ন হচ্ছে, শুধু 'ইউরোপীয় ঐতিহ্য' বললে কিছু বোঝা যায় কি? বার্ক্‌লি আর বেকন, দুজনেই তো ইউরোপীয় দার্শনিক; কিন্তু বিদ্যাসাগর বার্ক্‌লিকে ছেড়ে বেকন আর মিল-কে গ্রহণ করেছিলেন— পাশ্চাত্য প্রাচ্যবাদীদের প্রবল বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে। অনুরূপভাবে, পাভ্‌লভও তো স্নায়ুতন্ত্র-ভিত্তিক মনস্তত্ত্বের ইউরোপীয় ঘরানার অংশীদার, কিন্তু গিরীন্দ্রশেখর পাভ্‌লভ সম্বন্ধে আগ্রহ দেখাননি, যেহেতু পশ্চিম ইউরোপীয় মনস্তত্ত্বের ঐতিহ্যে পাভলভের প্রভাব স্বীকৃত হয়েছে অনেক পরে। অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে তিনি ইউরোপীয় মূলস্রোতের দ্বারাই প্রভাবিত। তবে বৈদান্তিক প্রভাবে তাঁর নিজস্ব দার্শনিক ঝোঁকটা ছিল মনের অবস্তুবাদী ব্যাখ্যার দিকে। সেই প্রবণতা খুব অনায়াসেই অভিজ্ঞতাবাদ-বিরহিত মায়াবাদী কিংবা বিশুদ্ধ যুক্তিভিত্তিক সাংখ্যদর্শনের মধ্যে আশ্রয় খুঁজে পায়। বৈদান্তিক প্রমাণপদ্ধতি নিয়ে (পৃঃ ৫৬), ভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার ঔপনিষদিক নিদান (পৃঃ ৮৯, ৯৫) নিয়ে, আত্মার ক্রিয়াপদ্ধতি নিয়ে অতি উচ্চাঙ্গের আলোচনা করেছেন গিরীন্দ্রশেখর, কিন্তু কখনো লোকায়ত বা চার্বাক দর্শন নিয়ে কথা বলেননি। এটাও তো পশ্চিমী প্রাচ্যবাদ-আরোপিত বাঁধাধরা প্যাটার্ন। ব্যালান্টাইন তো বিদ্যাসাগরকে এরকম কথাই বলেছিলেন। এর মধ্যে খুব মৌলিকত্ব আছে কি? ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ, রাধাকৃষ্ণন প্রমুখের হাতে বহু-ব্যবহৃত হয়ে হয়ে এই প্যাটার্ন কিছুটা অনুজ্জ্বল ও ভোঁতা, এমনকী অনুৎপাদক হয়ে পড়েনি কি? গিরীন্দ্রশেখরের কিছু কিছু মন্তব্য হুবহু বিবেকানন্দের প্রতিধ্বনি। যেমন, 'হিন্দুশাস্ত্রের আদর্শের দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই হিসাবে [মনকে অন্তর্মুখী করা] মনোবিজ্ঞানের স্থান সকল বিজ্ঞানের উপরে। আত্মার সাক্ষাৎকার চেষ্টাই হিন্দুধর্মের চরম উপদেশ।... একমাত্র মনোবিদ্যাই বিভিন্ন বিজ্ঞানের মধ্যে সাত্ত্বিক বিদ্যা, অন্যান্য সমস্ত বিজ্ঞান রাজসিক। তাহারা মনকে বহির্মুখ করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত করে। মনোবিদ্যা মনকে অন্তর্মুখ করে ও আত্মজ্ঞান লাভে সহায়ক হয়। (পৃঃ ৯৭) এখানে সংজ্ঞা (প্রমাণের তো প্রশ্নই ওঠে না) ব্যতিরেকেই কতকগুলো entity-কে ধরে নেন গিরীন্দ্র। বৈজ্ঞানিক rigour বলতে যা বোঝায়,

তাঁর অন্যান্য লেখায় যার নিদর্শন ভূরিভূরি, তার চিহ্নমাত্র এখানে নেই। বুঝতে পারি, এখানে বিজ্ঞানের বদলে অন্য একটা কিছু তাঁর আলোচ্য, যদিও ভেকটা বিজ্ঞানের। এর একটি চরম নিদর্শন:

> আমরা মস্তিষ্কে দয়া, মায়া ইত্যাদি মনোভাব অনুভব করি না। এই সকল মনোভাবের সহিত যে-সকল সংবেদন জড়িত থাকে হৃদয়ের উপরেই তাহাদের স্থান নির্দেশ করিয়া থাকি। এই জন্য দয়ালুকে 'সহৃদয়' ব্যক্তি বলি। হিন্দুশাস্ত্রকারগণও হৃদয়কে রাগদ্বেষ আদির উৎপত্তিস্থান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। দেখা যাইতেছে, শারীরশাস্ত্রবিদের কাছে যাহা সত্য, মনোবিদের কাছে তাহা সত্য না হইতেও পারে। (পৃঃ ১০১)

কী দাঁড়াল? দয়া, মায়া ইত্যাদি মনোভাবের সঙ্গে জড়িত সংবেদনগুলির অধিষ্ঠান তা হলে হৃৎপিণ্ডে? সহৃদয় শব্দটা তা হলে আক্ষরিক অর্থে বুঝতে হবে? আর শুধু হিন্দুশাস্ত্রকারগণ কেন, সঠিক বৈজ্ঞানিক ধারণার অভাবে প্যারাসেল্‌সস-এর যুগে ইউরোপীয়রাও তো ওইরকম ভাবত, যদিও প্যারাসেল্‌সস প্রকাশ্যে গ্যালেনের পিণ্ডি চটকেছিলেন (প্রসঙ্গত, পিণ্ডির অবস্থান শরীরে কোথায়?)। Lily-livered, chicken/lion-hearted প্রভৃতি আলঙ্কারিক বাগ্‌ধারার মধ্যে তার পরিচয় আজও রয়ে গেছে।

অথচ, এই মানুষই যখন সুনির্দিষ্ট ক্লিনিক্যাল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, কিংবা নিখাদ বৈজ্ঞানিক কোনো তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রবন্ধ লেখেন, তখন তাঁর যুক্তি ও ভাষার ঠাসবুনোট বাঁধুনি মুগ্ধ করে। আবার বলি, ওইখানেই তাঁর আসল মৌলিকত্ব।

আর একটি কথা। জীবনের সায়াহ্নপর্বে যখন ফ্রয়েড তাঁর চিকিৎসা-লব্ধ ধ্যানধারণাকে নৃতত্ত্ব আর ধর্মের অঙ্গনেও প্রয়োগ করতে প্রয়াসী হলেন, তখন তাঁর ব্যাখ্যাসমূহ খোলাখুলিভাবেই পুরাণকথাশ্রয়ী হয়ে ওঠে। টোটেম আর টাবু-র ইতিহাস ঘেঁটে, নৃতত্ত্বের চর্চা করে তিনিও কি গিরীন্দ্রশেখরের মতোই মনস্তত্ত্ব-পুরাণ মেশানো একটি কাঠামো তৈরি করতে চাইছিলেন না? অর্থাৎ এই প্রক্রিয়াটা ভারতীয় ইউরোপীয় নির্বিশেষেই ঘটছিল। এখানে চিন্তার গতিপথকে নিয়ন্ত্রণ করছিল নির্দিষ্ট সমাজে যার যার নির্দিষ্ট দার্শনিক অবস্থান। গিরীন্দ্রের সেই দার্শনিক অবস্থানের স্পষ্টতর পরিচয় পাই বইয়ের দ্বিতীয় অংশে। সেখানে তিনি বলেন, পুরাণের মধ্যেই ভারতের 'ইতবৃত্ত' লিপিবদ্ধ আছে। যদি আমরা মাথা থেকে সাহেবদের ঢোকানো ভুল ধারণাগুলো বিদায় করতে পারি, তা হলেই তার যথাযথ পাঠোদ্ধার করতে পারব। পৌরাণিক অতিশয়োক্তির মধ্যে থেকে আসল সত্য কী করে পাঠ করতে হয়, তার ফর্মুলা বুঝিয়ে দিয়েছেন (যেমন, ৬৬০০০ বছর মানে হল ৬৬ বছর, ইত্যাদি) । 'বৈজ্ঞানিক' ইতিহাস-চর্চা, পুরাতাত্ত্বিক খনন-নিদর্শনভিত্তিক চর্চা যার অন্যতম

প্রধান অঙ্গ, তার প্রতি তিনি খুব সদয় ছিলেন না। ইতিহাসের ফলিত চর্চায় যাঁরা নিযুক্ত, তাঁরা বলতে পারবেন, তাঁর এই সব চিন্তাভাবনার বাস্তব উপযোগিতা কতখানি।

সব মিলিয়ে সম্পাদক অমিতরঞ্জন বসুকে ধন্যবাদ জানাব এমন একটি সু-সম্পাদিত, সু-মুদ্রিত (যদিও, বাঙালি পাঠকদের আবহমান কপালদোষে বেশ কিছু ছাপার ভুল-লাঞ্ছিত), প্ররোচনাদায়ক বই উপহার দেওয়ার জন্য। শেষ করার আগে আরেকবার স্মরণ করব আশিস নন্দীর *'কথামুখ'*কে। গিরীন্দ্রশেখরের ভাবনাচিন্তার উথালপাতালের এই ইতিবৃত্ত আমাদের সাংস্কৃতিক-দার্শনিক ইতিহাস পুনর্গঠনের কাজে লাগবে, এ কথা বলার পর তিনি মন্তব্য করেন, 'এর জন্য আগামী প্রজন্মকে অমিতরঞ্জনকে ধন্যবাদও দিতে হবে, সংকলনটিকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টাও করতে হবে।' নিগূঢ় তাৎপর্যমণ্ডিত এই হেঁয়ালি-বাক্যটির মধ্যে গিরীন্দ্রশেখরের সত্যিকারের মূল্যায়নের সূত্র লুকিয়ে আছে।

[মানবমন]

বিজ্ঞান সমাজ মানুষ, 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'

সংকলন। মনফকিরা। দাম একশো টাকা

অস্বীকার করে লাভ নেই, সাধারণ্যে বিজ্ঞানীদের ভাবরূপটা এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক পরদানশিনতার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। দেশের সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, এমনকী বিজ্ঞাননীতি, কোনো ব্যাপারেই আমরা সচরাচর বিজ্ঞানীদের সুচিন্তিত মত জানতে পারি না। কিন্তু এটা যে মোটেই বিজ্ঞানীদের একমাত্র রূপ নয়, এমনকী হয়তো প্রধান রূপও নয়, তার প্রমাণ 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' (বি ও বি) পত্রিকা থেকে সু-চয়িত কুড়িটি প্রবন্ধের এই ১৬৫ পৃষ্ঠার ছিমছাম পেপারব্যাক। প্রায় তিরিশ বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে চলেছে বি ও বি। নিজেদের 'বিজ্ঞানকর্মী' বলেন এঁরা। হয়তো বলতে চান, তাঁরা বিজ্ঞানের গজদন্তমিনারের লোক নন, বরং যাঁরা গজদন্তের কারুকর্মী, তাঁদেরই সগোত্র।

'সংকলন প্রসঙ্গে' শীর্ষক প্রবেশিকাটিতে 'মোটা দাগে রচনাগুলির বিষয়সূত্র' ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে: 'বিজ্ঞানের ইতিহাস— আন্তর্জাতিকতা—ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক— ধর্মীয় জেহাদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান— বিজ্ঞানী-মন ও মানসিকতা— ভারতীয় ঐতিহ্যে, নীতিপ্রণয়নে ও রূপায়ণে বিজ্ঞান— বিজ্ঞানের সীমা।' স্বতন্ত্র ডিসিপ্লিন হিসেবে বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে চর্চার মূলাধারটি চমৎকার ব্যক্ত হয়েছে মণীন্দ্র মজুমদারের 'বিজ্ঞানের ইতিহাসের ভূমিকা' (১৯৩২) প্রবন্ধে:

'বিজ্ঞানের ইতিহাসের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। পদ্ধতি আর ধারাও তার স্বতন্ত্র। কয়েকজন বৈজ্ঞানিক আর কয়েকজন ঐতিহাসিক এক জায়গায় হলেই বিজ্ঞানের ইতিহাস লেখা হতে পারে না। এর জন্য ইতিহাস এবং অর্থনীতির ধারণা থাকা যেমন প্রয়োজন, তেমনি দর্শন ও সমাজবিদ্যাও কিছু জানতে হবে।' (পৃঃ ২৩)। খানিকটা এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই সত্যবান রায় 'ভারতীয় বিজ্ঞান-ঐতিহ্য পঠনের রূপরেখা' (১৯৩২) আঁকতে চেয়েছেন। অনেক জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তিনি। যেমন, 'ভারতীয় বিজ্ঞানের অঙ্কুর— বিশেষত শারীরবিদ্যা ও অ্যালকেমির ক্ষেত্রে... তন্ত্রসাধনাতেই নিহিত' থাকা সত্ত্বেও কেন সেই 'ম্যাজিক বিজ্ঞানের দ্বারপ্রান্তে উন্নীত হতে পারল না।' তাঁর মতে, 'ঔপনিষদিক একেশ্বরবাদ বা পরম ব্রহ্মের কল্পনা উন্নততর লজিকের স্বাক্ষর রাখলেও দৈহিক শ্রমের সঙ্গে ম্যাজিকের অনন্বয় (alienation)-কে প্রতিস্থাপন করতে ব্যর্থ হল' বলেই এই ঘটনাটা ঘটল। একই কারণে, 'উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদন ব্যবস্থা থেকেও মুখ ফিরিয়ে থাকার জন্য সাংখ্য বা মীমাংসা দর্শনের নিরীশ্বর চিন্তাও বিজ্ঞানকে যোগাতে পারেনি প্রগতির রসদ' (পৃঃ ১০২)। ম্যাজিক থেকে বিজ্ঞানে উত্তরণ ভারতে কেন ঘটল না, তার আলোচনায় কথাটা ভাবার মতো। বিজ্ঞানের বস্তুগত, মতাদর্শগত, দার্শনিক ও নৈতিক সীমাবদ্ধতা নিয়ে স্টিভেন রোজ়-এর 'লিমিট্স টু সায়েন্স' (১৯৩২) প্রবন্ধটির চমৎকার অনুবাদ করেছেন সুরঞ্জন কর। শেষ করেছেন এইভাবে: 'এসব বিষয়ের মীমাংসার একমাত্র পথ হল, কী ধরণের বিজ্ঞান চর্চা করা হবে, সে সিদ্ধান্ত গঠনের প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ।... এর ফলে হয়তো এক নতুন বিজ্ঞানের উদ্ভবও দেখতে পাব, যা হবে অনেক বেশি সমগ্রতাবাদী ও মানবকেন্দ্রিক' (পৃঃ ১৬৪)।

সোভিয়েত রাশিয়া, চিন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশ নতুন কোনও বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ গড়তে না পারায় আশাহত হলেও অমিতাভ বসুরায় ('দেবতার ব্যাধি', ১৯৩২) নিরাশাবাদী নন, কারণ 'একমাত্র বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে দেখলেই এই উপলব্ধিতে পৌঁছনো যায় যে, সব মানুষ সমান...' (পৃঃ ৩৩-৩৫)। এক দিকে এই বিশ্বজনীনতা, অন্য দিকে প্রায় সমস্ত বিজ্ঞান গবেষণাই আমেরিকায় কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ার স্ববিরোধী প্রবণতাটিকে সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিকতা' (১৯৩২) প্রবন্ধে: 'এই ঔপনিবেশিক শোষণের হাত থেকে ইউরোপও রেহাই পায়নি।... এমনকী কয়েক দশক আগেও যে-ইউরোপে কোয়ান্টাম তত্ত্বের জন্ম হল, সেই ইউরোপ আজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে' (পৃঃ ৪২-৪৩)। বিশ্বের এই মার্কিনায়নের পরিপ্রেক্ষিতে শুভেন্দু দাশগুপ্ত বিজ্ঞানের সর্বশক্তিমান বিশ্বজনীন ভাবরূপকে চ্যালেঞ্জ করেছেন 'একজন অবিজ্ঞানীর বিজ্ঞানপ্রশ্ন' (১৯৩২) প্রবন্ধে: কেননা এখন 'নতুন নিয়মে এক বিজ্ঞান,

এক প্রযুক্তি, এক পণ্য। যার বিজ্ঞান, তার প্রযুক্তি, তার পণ্যের মৌরসি পাট্টা।... অন্য কারও জমিতে ঢোকা বারণ।... যেহেতু বিজ্ঞান আর সামাজিক জ্ঞান নয়, ব্যক্তিজ্ঞান বা সংস্থার জ্ঞান, সেহেতু জ্ঞান-সম্পত্তির ধারণা' (পৃঃ ৭২-৭৩)।

'বিজ্ঞান বনাম ব্যক্তিমানস— রামানুজন-সত্যেন্দ্রনাথ-জগদীশচন্দ্র' (১৯৩২) প্রবন্ধে অভিজিৎ লাহিড়ী খুব স্পর্শকাতর ও প্রয়োজনীয় একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে, উক্ত তিন বিজ্ঞানীই 'নিজের অন্তর্জগৎকে আঁকড়ে থাকায় তাঁদের প্রতিভার আনুপাতিক গুণ ও পরিমাণমতো সৃজনশীল কাজ রেখে যেতে পারেন নি।' রামানুজনের ক্ষেত্রে কথাটা বহুস্বীকৃত। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ বসু? অভিজিৎ বলছেন, ফরাসি ভাষা জানা সত্ত্বেও মারি কুরি-কে সে-কথা মুখ ফুটে না বলাটা বসুর এক ধরনের 'ইনহিবিশন'। তাঁর গবেষণা ''শুধু কোয়ান্টম সংখ্যায়নেই নয়, গোটা কোয়ান্টম তত্ত্বের গঠনে এক প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ 'লিংক'-এর কাজ'' করা সত্ত্বেও মনের ওই একই দ্বিধাবশত তিনি ইউরোপে এসে 'নিজেকে গুটিয়ে রাখলেন'। জগদীশচন্দ্রের ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত সহজে ব্যাখ্যা করা যায়। 'পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে মডেল ধরে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেরই বিপরীত' এক আধুনিক ভারতীয় বিজ্ঞানকে রূপ দিতে গিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে 'খোলাখুলি ভাবে ধর্মীয় রহস্যবাদী মতাদর্শের অধীন' করে ফেলেন। কিন্তু অভিজিৎ যখন বলেন, 'লড়াইটা প্রধানত সংঘটিত হয় বিজ্ঞানীর অন্তর্লোকেই' (পৃঃ ১১২-১১৮), তখন শঙ্কা হয়, তিনি ভুল জায়গায় একটু বেশি জোর দিয়ে ফেলছেন না তো?

অতিরিক্ত ছড়িয়ে ফেলায় সৌমেন গুহের ক্রুদ্ধ কিন্তু মূল্যবান 'সভ্য অন্ধবিশ্বাস' (১৯৩২; আসলে দুটি প্রবন্ধ) কিছুটা লক্ষ্যভ্রষ্ট। নানা বিষয়ে তাঁর বিস্তৃত পঠনের চিহ্ন রয়েছে লেখাটিতে। বিজয় সরকার (বিজ্ঞানকর্মীদের আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি, ১৯৩২), রবীন মজুমদার (বিজ্ঞান আন্দোলনের সন্ধানে, ১৯৩২), রবীন চক্রবর্তী (গণবিজ্ঞান আন্দোলন : ভাবনা ও অভিজ্ঞতা, ১৯৩২) এবং প্রদীপ দত্ত (জনবিজ্ঞান : এক নতুন জীবনচর্চা, ১৯৩২) এ দেশে বিজ্ঞান আন্দোলনের আদর্শগত, রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও ব্যবহারিক নানা দিক নিয়ে গভীরদর্শী আলোচনা করেছেন। শান্তনু দত্ত, দিলীপ হোতা এবং পার্থপ্রতিম মজুমদারের লেখাগুলিতে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-বিরোধিতার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেহারাটি ফুটে উঠেছে। বিজ্ঞান, অপবিজ্ঞান, কুসংস্কার, অলৌকিকতা নিয়ে সুখপাঠ্য আলোচনা করেছেন কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিদ্যুৎ বিশ্বাস। ভারতের সায়েন্স পলিসির মতো একটি প্রায়-অনালোচিত বিষয়ে তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধ লিখেছেন সুব্রত ভট্টাচার্য ও অভিজিৎ লাহিড়ী (ভারতীয় বিজ্ঞাননীতি: প্রণয়নে ও রূপায়ণে, ১৯৩২)।

এই বইটি বেরোবার পর অন্তত দুটি মিথের অবসান হওয়া উচিত। এক, বিজ্ঞানীরা নিজের কাজে এতই নিমগ্ন যে, তাঁরা বাকি বিশ্ব সম্বন্ধে অনীহ বা অজ্ঞ। দুই, বিজ্ঞানীরা বাংলা লিখতে পারেন না।

চক্রব্যূহে বৈজ্ঞানিক

স্বাতী ভট্টাচার্য। মিত্র ও ঘোষ। দাম একশো টাকা

গত দু দশক ধরে বাংলা ভাষায় সিরিয়াস বিজ্ঞান-আলোচনার পরিসর, পরিমাণ ও উৎকর্ষ কিছুটা বাড়বার শুভলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এ ধরনের লেখার প্রতি পাঠকদের আগ্রহও বাড়ছে। হয়তো শহর-মফস্‌সল-গ্রামগঞ্জ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা কিছু চালচুলোহীন জিদ্দিবাজ বিজ্ঞান-আন্দোলনকারীর একগুঁয়েমির কিঞ্চিৎ সুফল আমরা পেতে আরম্ভ করেছি।

স্বাতী ভট্টাচার্যের বইটি সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার্য। এর মধ্যে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের ইতিহাস চর্চার 'ছোট্ট নদী'টির বাঁকগুলি বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। বোঝা যায়, কোথায় তা স্রোতস্বিনী আর কোথায় উপলাহত। বইটিতে রয়েছে তেরোটি প্রবন্ধ। বাংলা ভূখণ্ডে যেসব চিকিৎসাবিজ্ঞানী (সকলেই বাঙালি নন, যথা রোনাল্ড রস, রামনাথ চোপড়া) বড়, এমনকী মাঝারি মাপের কাজ করেছেন, তাঁদের নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছেন তিনি। বিশেষ করে চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের বেছে নেওয়ার কারণ এই যে, ভারতে বিজ্ঞানের ইতিহাস লেখার সময় বিংশ শতকের প্রথম দুই দশকের 'মেডিক্যাল গবেষণাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দেওয়া হয়।' অথচ, যে-সময় মেঘনাদ সাহার বিখ্যাত 'আয়োনাইজেশন' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, সেই সময়েই (১৯২০) 'উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী হাতে পেলেন তাঁর দীর্ঘ সাধনার ফল, ইউরিয়া স্টিবামিন।' আমাদের বিজ্ঞান-ইতিহাস চর্চার এই একঝোঁকা ত্রুটিকে শুধরে নেওয়ার উদ্দেশ্যেই বইটি লিখিত। উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ছাড়া আর যাঁদের নিয়ে তিনি লিখেছেন, তাঁরা হলেন : ভারতীয় ভেষজ-উদ্ভিদের রাসায়নিক ধর্ম-বিশ্লেষক কানাইলাল দে (১৮৩১-?), পুষ্টি-বিশেষজ্ঞ চুনীলাল বসু (১৮৬১-১৯২০), 'বেঙ্গল ফর্সেপ্স'-খ্যাত কেদারনাথ দাস (১৮৬৭-১৯৩৬), 'ভারতীয় ফার্মাকোলজির জনক' রামনাথ চোপড়া (১৮৮২-১৯৩৬), ভেষজ-বিশ্লেষক সুধাময় ঘোষ (১৮৯০-১৯৩৬), বিখ্যাত ক্যান্সার-বিশেষজ্ঞ সুবোধচন্দ্র মিত্র (১৮৯৬-১৯৩৬), কলেরা জীবাণুর বিষক্রিয়া-গবেষক শম্ভুনাথ দে (১৯১৫-১৯৩৬), পৃথিবীর দ্বিতীয় নলজাতকের স্রষ্টা সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯৩১-১৯৩৬) এবং কলেরা ও পেটের অসুখে 'ও আর এস'-এর কার্যকারিতা প্রদর্শক দিলীপ মহলানবিশ (জ. ১৯৩৬)।

মাঝখানে, কিছুটা প্রক্ষিপ্তভাবে এসে পড়েছে দুটি অধ্যায়: 'উপনিবেশের বিজ্ঞানচর্চা: জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র' এবং 'বিজ্ঞান ও স্বদেশচেতনা: মেঘনাদ, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানচন্দ্র।' উপনিবেশের বিজ্ঞানচর্চার তাত্ত্বিক মডেল সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য আগে থেকে পরিষ্কার করে এঁচে না-নিয়েই সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এ অংশটি মূল রচনাধারা থেকে কিছুটা সরে গেছে। ছিঁড়ে-যাওয়া সুতোর খেই অবশ্য সহজেই ধরে নেন তিনি, স্বচ্ছন্দে চলতে থাকে তাঁর ন্যারেটিভ। সেই ন্যারেটিভের ধাঁচটি বোঝবার জন্য তাঁর আলোচিত অনেকগুলি চরিত্রের মধ্য থেকে বেছে নেব উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে।

বেশ মুনশিয়ানার সঙ্গে উপেন্দ্রনাথের জটিল সত্তার বক্তানিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করেছেন স্বাতী। এক দিকে তাঁর বৈজ্ঞানিক সত্তা, যা উপনিবেশের কর্তাদের কাছ থেকে বাধা পেয়েও হার মানেনি। অথচ মানুষটি ছিলেন ব্রিটিশ-অন্ত প্রাণ। বীণা দাশের মতো বিপ্লবীকে 'assassin' অভিধা দেন, ১৯৩৪ সালে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিপ্লবীদের ধরবার জন্যে সরকারকে দশ হাজার টাকা 'দান' করে কৃতার্থ হন। তিক্ত পরিহাস এই যে, ইনিও কিন্তু জাতীয়তাবাদী প্রফুল্লচন্দ্রের বিখ্যাত ছাত্রগোষ্ঠীরই সদস্য। তবে শুধু ওষুধ তো অসুখ সারায় না : ইউরিয়া স্টিবামিন চালু হওয়ার পরেও ব্রিটিশ সরকারের সৌজন্যে কালাজ্বর কমেনি, বরং বেড়েছিল, 'কারণ ওষুধের অভাব নয়, চিকিৎসার সুযোগের অভাব।'

মন্ত্রগুপ্তি আধুনিক বিজ্ঞানের আদর্শবিরোধী। অথচ 'ইউরিয়া স্টিবামিনের ফর্মুলা ছেলেদের ছাড়া কারওকে শেখাননি তিনি', এমনকী পেটেন্টও নেননি— 'খুব সম্ভব পেটেন্ট সম্বন্ধে তৎকালীন অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্যের কারণে'। অথচ অন্য সংস্থা যখন ইউরিয়া স্টিবামিন বানাতে শুরু করল, তখন 'মনোপলির অধিকারের ভিত্তিতে তাদের নামে মামলা করেন' উপেন্দ্রনাথ। রফা হল আদালতের বাইরে। তার পরই 'ইউরিয়া স্টিবামিন-ব্রহ্মচারী' নামে বাজারে ওষুধ ছাড়েন তিনি। বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, 'প্রখর বাজারবুদ্ধি', ঔপনিবেশিক প্রভুর পদলেহন এবং প্রাক্-বৈজ্ঞানিক কৌম শামানসুলভ মনোভাব—এই চতুর্গুণের সমন্বয় তাঁকে একস্বতন্ত্র গোত্রে স্থাপন করেছে। এই বহুমাত্রিক চিত্রটি স্বাতীর বিশ্লেষণে সুন্দর ফুটেছে।

আমার নির্বাচিত দ্বিতীয় নিদর্শনটি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের। উপেন্দ্রনাথের একেবারে বিপরীত মেরুর মানুষ ইনি—আদর্শবাদী, কাজ-পাগল, অর্থ-উদাসীন, সংসার-জীবনে, এমনকী বিজ্ঞানকর্মেও কিঞ্চিৎ এলোমেলো। উপেন্দ্রনাথ বাধা পেয়েছিলেন উপনিবেশের কর্তাদের কাছ থেকে; সুভাষ বাধা পেয়েছিলেন স্বাধীন দেশের প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে, সহকর্মীদের কাছ থেকে। ১৯৭৮ সালে স্ত্রীরোগ ও

প্রসূতি বিশেষজ্ঞদের যে-সভায় সুভাষ তাঁর কাজের বিবরণ পেশ করেন, সেখানে তাঁর সহ-পেশিরা, যাঁরা এই বইতে 'কাঁকড়া' নামে উল্লিখিত, তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে 'বুজরুক' বলেন, 'মেরে যন্ত্র গুঁড়িয়ে' দেওয়ার ভয় দেখান। কোন ভয়াবহ রাজনীতির তাড়নায় তখনকার পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁর জাপান কনফারেন্সে যাওয়া বাতিল করে দেয়, কেন একজন হরমোন-বিশেষজ্ঞকে বদলি হতে হল চক্ষু-চিকিৎসা বিভাগে, সে ইতিহাস কি কোনো দিন উন্মোচিত হবে? এ প্রসঙ্গে সংবেদনশীল স্বাতী। কিন্তু রমেন মজুমদার 'যুগান্তরে' (৫ অক্টোবর ১৯৭৮) যে প্রতিবেদনটি লিখেছিলেন, এমনকী 'নলজাতক' নামে যে বইটি লিখেছিলেন (১৯৭৯), তার কোনো উল্লেখ নেই কেন তাঁর বইয়ে? (এই তথ্য দুটি সুবীরকুমার সেনের সৌজন্যে পেয়েছি।)

১৯৮১ সালে সুভাষের আত্মহত্যা নিয়ে J'accuse বলে গর্জে ওঠার মতো কোনো বাঙালি এমিল জোলার দেখা মেলেনি। আজও মিলেছে কি?

হায়দরাবাদে ১৯৭৯ সালে তাঁর গবেষণাপত্র কিন্তু বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। তার পর কলকাতায় বসল 'ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন'—ইনকুইজ়িশনও বলা যায়। রেডিওফিজ়িক্স, নিউক্লিয়ার ফিজ়িক্স, স্ত্রী-রোগবিদ্যা, শারীরবৃত্ত প্রভৃতি বিষয়ের বিশারদদের নিয়ে গঠিত সেই কমিটি সুভাষের দাবিকে 'অবিশ্বাস্য' বলে খারিজ করে দিল। যাঁরা সেই কমিটির সদস্য ছিলেন, তাঁরা অনেকেই স্বনামধন্য। কিন্তু ওই 'ভুলটি' (ভুল শব্দটাই সৌজন্যসম্মত) করার জন্য তাঁরা কি কেউ কোনো দিন ক্ষমা চেয়েছেন? কারণ, 'আজ যে সত্য প্রকাশিত তা হল, সুভাষ অন্তত তিনটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন, যেগুলি এখন সারা বিশ্বে কৃত্রিম প্রজননে ব্যবহৃত হচ্ছে।' তাই বলে এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, সুভাষ নিজেও কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতন্ত্র যথাযথ অনুসরণ করেননি। 'গবেষণার প্রতিটি ধাপে যেভাবে নথিপত্র, তথ্য-প্রমাণ রাখা প্রয়োজন', সুভাষ তা রাখেননি। রাখলে এত সমস্যা হয়তো হত না।

চক্রব্যূহে বৈজ্ঞানিক-এ একটা চট্‌জলদি দ্রুতলিখনের ভঙ্গি আছে, যেটা খবরের কাগজে মানায়, সিরিয়াস বিজ্ঞানের বইতে মানায় না। অমুক অমুক 'সভাতেও তিনি তাঁর গবেষণাপত্র রাখেন'— এই বাংলা পীড়া দেয়। পেশ করেন বললে ক্ষতি কী? বেতার তরঙ্গের 'প্রমাণ' বা গাছের প্রাণের 'প্রমাণ' কথাটাও অস্বস্তিকর। হয়তো তিনি বোঝাতে চেয়েছেন প্রদর্শন—ডিমনস্ট্রেশন।

আর একটি কথা, বাংলায় লেখা বইটিতে আগাগোড়াই লম্বা লম্বা অননূদিত ইংরেজি উদ্ধৃতি কেন? হিপ্‌নসিস সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনায় পাভলভপন্থী মনোচিকিৎসক ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্বন্ধে দু-এক কথা অবশ্যই বাঞ্ছনীয় ছিল। দু-একটি পরিভাষার ভুলও আছে; জিনাস-এর বাংলা গণ (গোত্র নয়), আর স্পিশিজ়-এর বাংলা প্রজাতি (বংশ নয়)। ওষধি মানে যে-গাছ একবার ফল দিয়ে

মারা যায়। যে গাছ থেকে ওষুধ পাওয়া যায়, তাকে হয়তো ঔষধি বলা যেতে পারে, কিন্তু ওষধি কখনও নয়। আর একটি অমার্জনীয় অবয়বগত ত্রুটি হল নির্ঘণ্টের অনুপস্থিতি।

স্বাতীর লেখার বড় গুণ প্রাঞ্জলতা, বিষয়নিষ্ঠতা আর নিয়ন্ত্রিত আবেগ। প্রজ্ঞা ও পরিশ্রম দিয়ে শমিত করে নিলে তাঁর লেখা বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠবে।

কামারের এক ঘা

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, পাভলভ ইন্‌স্টিটিউট, ৯৮ মহাত্মা গান্ধি রোড কলকাতা ৭০০০০৭। দাম একশো টাকা

যেটাকে বলা হয় বিজ্ঞান আন্দোলন, নয় নয় করে তার বয়স নেহাত কম হল না। কিন্তু বিজ্ঞান আন্দোলন ব্যাপারটা কী, তা জিজ্ঞাসা করলে এখনও খুব পরিষ্কার কোনো উত্তর পাওয়া যাবে মনে হয় না। কারও কাছে বিজ্ঞান-আন্দোলন মানে বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্ব অ-বিশেষজ্ঞের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কারো কাছে, হাতেকলমে বিজ্ঞানের কিছু কিছু অনুশীলনের সুযোগ করে দেওয়াটাই সে আন্দোলনের কাজ। কেউ বা ধর্মান্ধতা-মুক্তি, প্রকৃতি পাঠ, পরিবেশ রক্ষা, জিন-প্রযুক্তি-বিরোধিতা কিংবা কুসংস্কার-দূরীকরণকে বিজ্ঞান-আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য মনে করে। অল্প দু-চারজন মনে করে, এই নোংরা সমাজটাকে বদলে সুস্থ কোনো সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার যে রাজনৈতিক লড়াই, তারই অঙ্গ হিসেবে চালাতে হবে বিজ্ঞান আন্দোলন। এ ছাড়াও আছে এক ধরনের দু-নম্বরি বিজ্ঞান-আন্দোলন যা সরকারি মতবাদকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কিছু লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। বিশ্বব্যাপী এইড্‌স-প্রতিরোধ ব্যবসার স্বদেশি মুৎসুদ্দিগিরিও অনেক বিজ্ঞান-আন্দোলককে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত আশ্রয়ে 'এক দান লুডো' খেলার সুযোগ করে দিয়েছে বলে শুনতে পাই।

এই সব দু-নম্বরি 'আন্দোলন'কে বাদ দিলে, বাকি সবগুলোর মধ্যেই কিছু না কিছু সত্য আছে। সেই সত্য উপাদানগুলোর লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক কষলে দেখা যাবে, ব্যক্তিমানুষের নিজস্ব বিচারবোধ জাগিয়ে তোলাই হল এদের অভিন্ন ন্যূনতম লক্ষ্য। অথচ ঠিক সেই জায়গাতেই আমাদের সব ধরনের বিজ্ঞান আন্দোলনের সবচেয়ে বড়ো ঘাটতি। সাধারণভাবে যেকোনো ব্যাপারে, আক্ষরিক অর্থেই জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠের মধ্যে দিয়ে কীভাবে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া কাজ করে চলে,

সেই সামগ্রিক বিজ্ঞানবোধ আয়ত্ত করাটা বেশ কঠিন। তার জন্য বিজ্ঞানের পদ্ধতিতন্ত্র সম্বন্ধে প্রাথমিক কিছু ধারণা থাকা দরকার। শুধু কাণ্ডজ্ঞান এর জন্য যথেষ্ট নয়, এর জন্য দরকার সচেতন অভিনিবেশ। জানা দরকার কিছু দর্শন।

আর ঠিক সেই কাজটার জন্যই অপরিহার্য হল রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের *কামারের এক ঘা*। ওপরে যে-যে সমস্যার কথা বললাম, তার সব কটিই এ বইতে আলোচিত— গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ আকারে নয়, প্রায় যেন গল্পের আকারে। ২৯২ পৃষ্ঠার বইটি সাতটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগটির নাম: কামারের এক ঘা। কেন এই নাম? পিছন-মলাটে তার ব্যাখ্যা রয়েছে: 'এক এক করে কি এত ভুল ধারণা কাটানো সম্ভব? না, স্যাকরার ঠুকঠাক দিয়ে কিচ্ছু হবে না, চাই কামারের জোরালো ঘা। দরকার এক বিকল্প জীবনদর্শন— যা দিয়ে মোকাবেলা করা যাবে পাহাড়প্রমাণ অজ্ঞতার।' *কামারের এক ঘা* সেই বিকল্প জীবনদর্শন খোঁজার বই।

দ্বিতীয় বিভাগের নাম **'নীতিবোধ'**। ঈশ্বরবাদীর নীতিবোধ আর নিরীশ্বরবাদীর নীতিবোধ নিশ্চয়ই একরকম হবে না। পরলোকের ভয় থেকে মুক্ত মানুষের সুস্থ নীতিবোধের ভিত্তিটা কী— এই প্রশ্ন এখানে আলোচিত হয়েছে। কিছু তত্ত্বকথা আর কিছু ঘটনার মধ্যে দিয়ে।

অল্পবয়সী যারা আন্দোলন-'টান্দোলন' করে, তাদের একটা কথা প্রায়ই শুনতে হয়: কী হবে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে? বনের মোষ তাড়ানোর প্রয়োজন এবং তার ব্যবহারিক বাস্তব সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তৃতীয় ভাগে, যার নামই হল **বনের মোষ তাড়াতে ...**

বনের মোষের পরে অবধারিতভাবেই এসে পড়ে **ঘরের কথা**। কিন্তু এ ঘর অন্য ঘর। এ হল ভাবের ঘর। 'যে বিকল্প জীবনদর্শনের কথা বলা হচ্ছে, তার সবই কি বিদেশ থেকে আমদানি? বাঙলার নিজস্ব ঐতিহ্যে কি তার কিছুই নেই?' হিন্দুত্ববাদীদের মতে, ভারতের সব কিছুই ঈশ্বর ও ধর্ম সংশ্লিষ্ট। বস্তুবাদী, জীবনমুখী এবং বিজ্ঞাননিষ্ঠ যাবতীয় ভাবনাই নাকি তাদের মতে বিদেশ থেকে আমদানি। এ যে কত বড় মিথ্যে, তা প্রকাশ করে দিয়েছেন রামকৃষ্ণবাবু। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় কিন্তু সযত্ন-বিস্মৃত মানুষের পরিচয় নতুন করে মেলে ধরেছেন আমাদের সামনে। শুধু এই কারণেই বইটি অপরিহার্য বলে গণ্য হতে পারে।

ধর্ম নিয়ে, ইতিহাস নিয়ে, জাতীয়তাবাদ নিয়ে কী অকথ্য নোংরামি চলে, গত বছর পনেরোর ভারত তার নিকৃষ্টতম উদাহরণ। একজন হৃদয়বান যুক্তিবাদীর বেদনাবিদ্ধ, ক্রুদ্ধ চোখে এই ঘৃণ্যতা কীভাবে প্রতিভাত হয়, তার পরিচয় পাওয়া যাবে পঞ্চম ভাগে, যার নাম **হা রাম**।

ষষ্ঠ ভাগটি (ভারতের ঐতিহ্য) সম্ভবত এই বইয়ের সমৃদ্ধতম অংশ। এখানে লেখক তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের বারিধি মন্থন করে দেখিয়েছেন ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই রয়েছে অন্য এক ধারা— 'পাণিনি, চরক, সুশ্রুত, আর্যভট' প্রমুখ মহামনীষী যার প্রতিনিধি। ভারতের শাসকসম্প্রদায় কখনোই চায় না, এই সব মহামনীষীর বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিনিষ্ঠ ভাবধারা সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছাক। তারা চায় লোকে এই বহুপ্রচারিত মিথ্যেটাকেই আঁকড়ে থাক যে ভারতীয় সভ্যতা = আধ্যাত্মিকতা, আর পাশ্চাত্য সভ্যতা = ঐহিকতা। এই ভুল ধারণাটা বহু বিজ্ঞান-আন্দোলনকারীকেও প্রভাবিত করেছে, এটা ঘটনা। এই অবাস্তব ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী তাত্ত্বিক বোমা নিক্ষেপ করেছেন চার্বাক ও লোকায়ত বিশেষজ্ঞ রামকৃষ্ণবাবু।

শেষের অধ্যায়টির নাম থেকেই (সাত-সতেরো) বোঝা যায়, রকমারি বিষয়ে কিছু মন্তব্য এখানে হাজির করা হয়েছে। যেমন, 'ঠাকুরঘরের নতুন দেবী: সন্তোষী মা', 'বেদ বেকারি মহেশ যোগী', 'শিশুর অনন্ত জিজ্ঞাসা' ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, প্রসঙ্গ গুলি যত রকমারিই হোক, উদ্দেশ্যের তির একই মুখে ছুটে চলে → অযুক্তি, অজ্ঞতা, আর অসাধুতার সদর-ঘাঁটিতে তোপ দাগা।

বইটি নিয়ে দুটি আপত্তি আছে: একটি প্রকরণগত, একটি অবয়বগত। এ বইতে নাম ও বিষয় নির্ঘণ্ট থাকা বিশেষ দরকার ছিল। এর অভাবে বইটির ব্যবহারযোগ্যতা কিছুটা মার খেয়েছে। দ্বিতীয়ত, এমন একটি জোরালো নামওয়ালা বইয়ের মলাট এত দুর্বল কেন? এক স্যাকরাই যেন কামারের প্রক্সি দিচ্ছে, এই মেজাজটাই ফুটে বেরিয়েছে মলাটে। আসল গণ্ডগোলটা হয়েছে ছবি, রং আর হরফের আপেক্ষিক বিষম সংস্থাপনে। ফলে বইটির বিস্ফোরক গুরুত্ব মলাটের মধ্যে প্রতিফলিত হয়নি।

তবে এ সবই গৌণ এবং মেরামতযোগ্য ত্রুটি। বিষয়মাহাত্ম্যে *কামারের এক ঘা*-কে খুব অনায়াসেই আজকের বিজ্ঞান-আন্দোলনের অপরিহার্য হ্যান্ডবুক বলা যেতে পারে। এমন একটি সর্বার্থসাধক বইয়ের জন্য বিজ্ঞান-আন্দোলনের কর্মীরা অনেকদিন অপেক্ষা করেছিলেন। রচনাশৈলীর দিক থেকেও বইটি দৃষ্টান্তস্বরূপ। ভাষা নিয়ে চালবাজি নেই কোথাও, কখনও মনে হয় না যে লেখক গম্ভীর চালে 'হে বালকগণ ও স্নেহের হিজি বিজ বিজ' বলে জ্ঞান দিচ্ছেন। অথচ অসাধু শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার সময় তাঁর ভাষা নির্মম শ্লেষে ঝলসে উঠেছে বারবার। মনে পড়ে লু শুনের সেই বিখ্যাত দ্বিপদী:

> দুর্ধর্ষ শৌর্যে আমি অনায়াসে রুখে দিই সহস্র উদ্যত অঙ্গুলি,
> বলদের মতো আমি ঘাড় গুঁজে শিশুদের সেবা করে চলি।

[পরিপ্রশ্ন]

রাজশেখরের গীতাভাষ্য: 'নির্বর্ণ স্বচ্ছ দৃষ্টি'?

গীতা নিয়ে হিন্দু বাঙালিদের উচ্ছ্বাস যেমন প্রবল, তেমনি গীতা নিয়ে বাঙালি ভাবুকদের অস্বস্তির ইতিহাসটাও কিছু কম দীর্ঘ নয়। সুদূর ১৮৮৩ সালে অক্ষয় দত্ত লিখেছিলেন: 'ঐ প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য কি জান? জীবাত্মার ধ্বংস হয় না, অতএব যত ইচ্ছা নরহত্যা কর, তাহাতে কিছুমাত্র পাতক নাই।'[১] গীতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অস্বস্তি এতখানিই যে ১৯০৯ সালে অজিত চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: 'আমাকে লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে আমি আজ পর্যন্ত গীতা ভাল করে তলিয়ে পড়ি নি— দুতিনবার আরম্ভ করেছিলুম কিন্তু বাধা পেয়ে শেষ করতে পারিনি।' অস্বস্তির কারণ ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'গীতার মধ্যে কোনো একটা বিশেষ সময়ের বিশেষ প্রয়োজনের সুর আছে, তাই ওর নিত্য অংশের সঙ্গে ক্ষণিক অংশ জড়িয়ে গিয়ে কিছু যেন বিরোধ বাধিয়ে দিয়েছে— কোনো একজন মহাপুরুষের বাক্যকে কোনো একটা সংকীর্ণ ব্যবহারে লাগাবার চেষ্টা করলে যেরকমটি হয় গীতায় সেরকম একটা টানাটানি আছে। অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবার জন্যে আত্মার

অনশ্বরত্ব সম্বন্ধে যে উপদেশ আছে তার মধ্যেও বিশুদ্ধ সত্যের সরলতা নেই।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর মতো করে এই টানাটানির একটা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাও দেওয়ার চেষ্টা করেছেন: 'আমার মনে হয় বৌদ্ধ উপদেশে ভারতবর্ষকে যখন নিষ্ক্রিয় করে তুলেছিল— যখন অহিংসা ধর্মের সাত্ত্বিকতা কেবলমাত্র negative লক্ষণাক্রান্ত সুতরাং পূর্ণ সত্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল তখন কোনো একজন মনস্বী, পূর্বতন গুরুর উপদেশকে কর্মোৎসাহকরভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। সম্মুখে একটি সাময়িক প্রয়োজন অত্যন্ত উৎকটভাবে থাকাতে ব্যাখ্যাটির মধ্যে খুব উচ্চভাবের সঙ্গেও তর্কচাতুরী খানিকটা না মিশে পারেনি। গীতার সঙ্গে সঙ্গে সেই ইতিহাসটি যদি দেখতে পাওয়া যেত তাহলে বোঝবার পক্ষে ভারি সুবিধা হত।'[২]

১৯৪৮ সালে গিরীন্দ্রশেখর বসু 'গীতার অষ্টম অধ্যায়ের উত্তরায়ণে ও দক্ষিণায়ণে মৃত্যুর ফলবিভেদ সম্বন্ধে' লেখেন যে, 'যুক্তিবাদীর পক্ষে শ্লোকটির (৮/২৪-২৫) অর্থ বুঝিতে পারিলাম না বলাই সংগত।'[৩] মনোবিকলনবাদী গিরীন্দ্রশেখরের গীতা-বিশ্লেষণ রীতিমতো অভিনব, তা স্বতন্ত্র অভিনিবেশ দাবি করে। এখানে সে অবকাশ নেই, তবু খুব সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলা যেতে পারে। তাঁর মতে গীতা সমেত যাবতীয় ভারতীয় দার্শনিক রচনার মূলে যত না আছে দার্শনিক জিজ্ঞাসা, তার চেয়ে বেশি আছে বিশেষ বিশেষ ঋষির বিশেষ বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার অবিকল, প্রসাধনহীন প্রক্ষেপণ। সেই কারণে অত্যন্ত প্রগাঢ় অন্তর্দৃষ্টিময় উপলব্ধির পাশাপাশি দেখা যায় একেবারে হাস্যকর রকমের ছেলেমানুষির ('childish and even silly') সহাবস্থান। তাঁর মতে মনস্তত্ত্বসম্মতভাবে দেখলে ভারতীয় দর্শনের অনেক দুর্বোধ্যতার কারণ ব্যাখ্যা সহজ হয়ে ওঠে। তিনি আরও বলছেন, গীতায় চার ধরনের ঈশ্বর-অন্বেষীর কথা বলা হয়েছে। ১) যারা বিপদ্গ্রস্ত; ২) যারা জ্ঞানপিপাসু; ৩) যাদের মধ্যে ধনসম্পদ আহরণের ও সুখভোগের প্রবল উচ্চাশা রয়েছে এবং ৪) যারা প্রজ্ঞাবান। প্রথম ধরনটি নিয়ে আলোচনা সহজবোধ্য কারণেই নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয় ধরনের লোক সম্বন্ধে গিরীন্দ্রশেখর বলছেন, শিশু যেমন তার নিরাপত্তার জন্য পিতার কাছে আশ্রয় খোঁজে, এঁরাও তেমনি ঈশ্বরের কাছে আশ্রয় খোঁজেন। ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞান তত্ত্বের অবতারণা করে তিনি বলেন, এটি শৈশবের অবচেতন নিরাপত্তা-কামী প্রবণতারই প্রাপ্তবয়স্ক প্রক্ষেপ মাত্র। এই ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন: 'এই অবস্থানে দাঁড়িয়ে বলা যায় যে, ঈশ্বর আপন আদলে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, এই তত্ত্বের বদলে বলা উচিত, মানুষই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে তার নিজের মনের ভেতরকার ছবির সঙ্গে মিলিয়ে।...'[৪] তৃতীয়, অর্থাৎ সম্পদপ্রিয় ও সুখান্বেষী ঈশ্বরভক্তদেরও তিনি মোটের ওপর এই গোত্রেই ফেলেন। তফাত এই, ভগবানের কাছে এরা শুধু আশ্রয়ই নয়,

প্রশ্রয়ও চায়। এদের কাছে ঈশ্বর = বিশ্বপিতঃ, যে-পিতার কাছে অসংকোচে যেকোনো আব্দার জানানো যেতে পারে। সেসব আব্দারের সঙ্গে বাস্তব-সম্ভাব্যতার কোনো সম্পর্ক নেই। 'স্বর্গস্থ পিতঃ' পৃথিবীস্থ পিতারই অনেক বড়ো আকারের ছাঁচ বই আর কিছু নয়। যেহেতু সেটি আমাদের মনের নির্জ্ঞান প্রবণতারই এক প্রক্ষেপ মাত্র, তাই তা বাস্তবে কী সম্ভব আর কী-অসম্ভব তার মুখাপেক্ষী নয়। ফলে স্বর্গস্থ এই পিতঃ নানা রকম পরস্পর-বিরোধী গুণে ভূষিত, যেমন তিনি একই সঙ্গে "পরম কারুণিক" এবং "সর্বশক্তিমান"।[৫] এই পিতার কাছে চাইলেই যা খুশি জিনিস পাওয়া যায়, কেননা সর্বশক্তিমানের দেবার ক্ষমতা অসীম; অন্য দিকে পরম কারুণিক তিনি এতই স্নেহপ্রবণ যে আব্দার না-মেটালে তাঁর নিজেরই মন ভরে না: 'অসীম ধন তো আছে তোমার তাহে সাধ না মেটে। নিতে চাও তা আমার হাতে কণায় কণায় বেঁটে।'

চতুর্থ বিভাগ, অর্থাৎ প্রজ্ঞাসন্ধানী যারা অন্বেষণের মারফত ঈশ্বরে গিয়ে পৌঁছয়, তাদের সম্বন্ধে গিরীন্দ্রশেখরের বিশ্লেষণ আরও অভিনব। তাঁর মতে নিখাদ বৈজ্ঞানিক কৌতূহল চরিতার্থ করার বাসনা ভগবৎ-অনুসন্ধানের একটি ন্যায্য তাড়না বলে গীতায় স্বীকৃত। বিভিন্ন উপনিষদ থেকে এই ধরনের ঈশ্বর-অনুসন্ধানের নানা উদাহরণ দিয়ে তিনি দেখান যে, এর প্রত্যেকটিই কোনো না কোনো প্রশ্ন তোলে, যথা: আমরা কোথা থেকে এলাম? কেমন করে আমরা জীবন ধারণ করি? মৃত্যুর পর কী হয়? কতগুলি শক্তির ক্রিয়ায় জীবদেহ সজীব থাকে, এবং তার মধ্যে কোনটি মুখ্য? ঘুমের সময় কোন কোন ইন্দ্রিয় জেগে থাকে? স্বপ্নের উৎপত্তি কীভাবে হয়? শরীরের মধ্যে সুখানুভূতির আধার কোনটি? মনকে কে নিয়ন্ত্রণ করে? ইন্দ্রিয়গুলিকে সজীব করে রাখার ভার কার ওপর ন্যস্ত? 'এইসব প্রশ্নের বেশির ভাগই হয় মনস্তত্ত্ব নাহয় শারীরতত্ত্বের আওতায় পড়ছে; অল্প কয়েকটি পড়ছে পদার্থবিদ্যা ও দর্শনের আওতায়। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঋষিরা ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোনো প্রাক্-নিরূপিত ধারণা নিয়ে ভাবনা শুরু করেন নি।... আর পাঁচজন নশ্বর মানুষের মতোই তাঁরা ওইসব সমস্যার ভারে পীড়িত ছিলেন।'[৬] গিরীন্দ্রশেখর এমনও বলেন যে, মনস্তত্ত্বের শিক্ষক হিসেবে তিনি তাঁর ছাত্রদের কাছ থেকে ঠিক এই প্রশ্নগুলিই অনেক সময় পেয়েছেন। এই সব প্রশ্নের মধ্যে 'there is nothing of mysticism.' তবু যে এই সব প্রশ্নের উত্তর শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মের মতো এমন একটি ধোঁয়াটে সত্তার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করল, তার কারণ, গিরীন্দ্রশেখর বলছেন, ওইটাই ছিল সেই প্রাক্-বিজ্ঞান যুগে স্বাভাবিক। কারণ 'ঋষিরা প্রধানত চালিত হতেন তাঁদের মনস্তাত্ত্বিক বোধের দ্বারাই, অর্থাৎ তাঁদের অপরিশোধিত নিজস্ব অভিজ্ঞতা দ্বারা। নিউটন কিংবা আইনস্টাইনের লেখা পাঠ্যবই দেখে ঠিকভুল যাচিয়ে নেবার সুযোগ তাঁদের ছিল

না।'[৭] ইঙ্গিতটা এই যে সে-সুযোগ থাকলে হয়তো ওরকম ধোঁয়াটে ধারণার প্রতি তাঁরা ধাবিত হতেন না।

তিনি কিন্তু এটা সেই প্রজ্ঞাসন্ধানীদের ন্যূনতা বলে আদৌ চিহ্নিত করছেন না। বরং এই কথাই বলছেন যে, তাঁরা অত্যন্ত সাহসভরে নিজেদের 'মনস্তাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞানের' ভিত্তিতেই অবরোহী (ডিডাক্‌টিভ) যুক্তির পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, সেই যুক্তির সিদ্ধান্তগুলি সাধারণ লোকের কাছে অবাস্তব মনে হল কি না হল, তার পরোয়া করেননি।

একেবারে হালে অমর্ত্য সেন গীতা প্রসঙ্গে কতকগুলো নীতিশাস্ত্রীয় প্রশ্নকে নতুন করে খুঁচিয়ে তুলেছেন তাঁর 'তার্কিক ভারতীয়' বইতে। অমর্ত্য লিখেছেন: 'ভগবদ্‌গীতাতে আমরা দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত নৈতিক অবস্থানের সংঘাত দেখতে পাই। একদিকে কৃষ্ণ জোর দিচ্ছেন নির্ধারিত কর্তব্যপালনের ওপর, অন্যদিকে অর্জুন তুলে ধরছেন অশুভ পরিণতিকে এড়ানোর (ও শুভ ফলের জন্ম দেওয়ার) যুক্তিকে।... অর্জুন প্রশ্ন তোলেন, শুধুমাত্র একটি ন্যায়পূর্ণ আদর্শকে তুলে ধরার কর্তব্য সম্পর্কে যত্নবান হয়ে, সেই যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে সৃষ্ট আত্মীয়দের দুঃখ ও হত্যালীলা সম্পর্কে নিস্পৃহ থাকাটা উচিত কিনা।' বিপরীতে, কৃষ্ণ অর্জুনকে 'জোর দিয়ে বলছেন, ফল সম্পর্কে নিস্পৃহ থেকে কর্তব্যে অবিচল থাকতে। কারণ এটি একটি ন্যায্য সংগ্রাম, এবং একজন ক্ষত্রিয় ও সেনাপতি হিসেবে অর্জুন তাঁর দায়িত্ব এড়াতে পারেন না।' সচরাচর ধরে নেওয়া হয়, অর্জুন যে কৃষ্ণের অভিভাবন মেনে নিয়েছিলেন, সেটা উচিত কাজই হয়েছিল। বস্তুত সেটাই গীতার সবচেয়ে বড়ো মাহাত্ম্য বলে সাধারণভাবে কীর্তিত। কিন্তু অমর্ত্য প্রশ্ন তোলেন: 'প্রকৃতপক্ষে, লড়াই ও বিরাট ধ্বংসলীলার পর যে ভয়াবহ জনশূন্যতা মহাভারতের শেষ দিকে, বিশেষত গাঙ্গেয় উপত্যকা এলাকাটিকে গ্রাস করেছিল, তাকে তো যুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জুনের সুগভীর দ্বিধার যথার্থতা হিসেবেও দেখা যেতে পারে। অর্জুন যে বিপরীত যুক্তিটি দিয়েছিলেন, সেটি বাস্তবিকই খণ্ডিত হয়নি।'[৮] অর্থাৎ বড়ো প্রেক্ষিতে দেখলে কৃষ্ণ নয়, অর্জুনের যুক্তিই জয়ী!

রাজশেখরের গীতাভাষ্য

বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ক্ষেত্রচারী বাঙালিদের সংশয়বাদী গীতা-বিশ্লেষণের এই ধারাবাহিকতার প্রেক্ষিতে রাজশেখর বসুর গীতাভাষ্য নিয়ে একটু আলোচনা করলে মন্দ হয় না। রাজশেখর মোটের ওপর সংশয়বাদী ঘরানারই লোক। তিনি যে বাঁধা গতে গীতা ব্যাখ্যা করবেন না, সেটা ধরেই নেওয়া যেতে পারে। সুনীতিকুমারের

ভাষায়, রাজশেখর রামায়ণ ও মহাভারতকে 'বিশেষ কোনও আস্থাভেদের রঙিন কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখতে চেষ্টা করেন নি। এই নির্বর্ণ স্বচ্ছ দৃষ্টির মূল্য এ যুগের মানুষ-মাত্র স্বীকার করবেন...।'[৯] বাস্তবিক, তাঁর অনূদিত মহাভারতের ভূমিকায় রাজশেখর 'গীতাধর্মব্যাখ্যাতা' কৃষ্ণ সম্বন্ধে যেসব মন্তব্য করেছেন, তা থেকে এ কথাই ঠিক বলে মনে হয়: 'মাঝে মাঝে তাঁর [কৃষ্ণের] যে বিকার দেখা যায় তা ধর্মসংস্থাপক পুরুষোত্তমের পক্ষে নিতান্ত অশোভন, যেমন ঘটোৎকচ বধের পর তাঁর উদ্দাম নৃত্য এবং দ্রোণবধের উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যাভাষণের উপদেশ।' তিনি এও দেখিয়েছেন যে, 'কৃষ্ণপুত্র শাম্ব দুর্যোধনের জামাতা; দুর্যোধন তাঁর বৈবাহিককে ঈশ্বর মনে করতেন না।'[১০] এমনকি বিশ্বরূপ দেখিয়েও কৃষ্ণ দুর্যোধনের মনে সে-বিশ্বাস জাগাতে পারেননি। তবু, রাজশেখরের দৃষ্টি সত্যিই কতটা 'নির্বর্ণ' ছিল, সে বিষয়ে আমাদের কিছু সংশয় জেগেছে (অবশ্য 'নির্বর্ণ' দৃষ্টি বলে আদপেই কোনো কিছু হয় কি না, সে প্রশ্নটা আপাতত মুলতুবি রাখছি)।

তাঁর গীতার অনুবাদটি ১৯৪৮ সালের আগে রচিত হয়েছিল, ঠিক কোন সালে জানতে পারিনি (জানবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেছি বললে অবশ্য মিথ্যে বলা হবে)। হরপ্রসাদ মিত্র সম্পাদিত 'রাজশেখর গ্রন্থাবলী' প্রথম খণ্ডে (এম সি সরকার, 'জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ', ১৯৮০) গীতার অনুবাদটি সন্নিবিষ্ট আছে, কিন্তু সম্পাদক মহাশয় এর রচনা-কালটি উল্লেখ করেননি। তবে তাঁর লেখা ভূমিকার একটি পরোক্ষ মন্তব্য থেকে এর রচনাকাল সম্বন্ধে কিছুটা অনুমান করতে পারছি। হরপ্রসাদ জানিয়েছেন, 'সহোদর গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'ভগবদ্‌গীতা' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা ১৩৫৫, অর্থাৎ ইংরেজি ১৯৪৮ সালে এবং 'গিরীন্দ্রশেখর রাজশেখরের অনুবাদ থেকে অনেক সাহায্য পান।'[১১] সুতরাং রাজশেখর অনুবাদটি অন্তত ১৯৪৮ সালের আগে করেছিলেন, কিন্তু জীবদ্দশায় সেটি প্রকাশ করেননি। বস্তুত তাঁর অনুবাদের পাণ্ডুলিপির ওপর স্পষ্ট ভাষায় লেখা ছিল, প্রকাশের জন্য নয়।

জীবনযাপনের পথপ্রদর্শক

রাজশেখর বসু গীতাকে প্রধানত ব্যবহারিক জীবনের পথ-প্রদর্শক বলেই গুরুত্ব দিয়েছেন। এর দার্শনিক গুরুত্ব তাঁর কাছে তুলনামূলকভাবে কম। ভূমিকায় লিখেছেন:

> গীতাতে দার্শনিক তত্ত্ব বিস্তর আছে, তথাপি এতে মুখ্যত *ব্যবহারিক বিদ্যাই* কথিত হয়েছে। [গীতাকারের] প্রধান উদ্দেশ্য— ঐ সকল তত্ত্ব অনুসারে *জীবনযাত্রার পদ্ধতি* নির্ধারণ।

হিন্দুধর্মের কোনো ক্রীড না থাকলেও এককভাবে কোনো একটি গ্রন্থকে যদি তার কাছাকাছি মর্যাদা দেওয়া যায়, সেটি নিঃসন্দেহে গীতা। আধুনিক হিন্দুদের ইহকাল-পরকালের সঙ্গে গীতাকে জড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস খুবই ব্যাপক। রাজশেখর সে প্রয়াসের বিরোধী। তবে কি গীতা তাঁর কাছে নিছক এথিক্স, শুধুই পরিকল্পিত নীতিশাস্ত্র? না, তাও নয়।—

> গীতা কেবল নীতিশাস্ত্র বা ethics নয়। নীতিশাস্ত্র বলে— এই কাজ ভাল, এই কাজ মন্দ, বড় জোর বলে— এইজন্য ভাল, ওইজন্য মন্দ। কিন্তু গীতাকার অধিকন্তু বলেন— *এইরূপে জীবন নিরূপিত কর*, তবেই যা শ্রেয় তাতে মন বসবে, যা হেয় তাতে বিরাগ জন্মাবে।[১১]

তাঁর বক্তব্য, গীতায় কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, তা তো বলাই হয়েছে, উপরন্তু কার্যক্ষেত্রে কীভাবে জীবন নির্বাহ করলে ভাল হবে, সে ব্যাপারেও পালনযোগ্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু জীবন নির্বাহ করার পদ্ধতির কথা বললেই প্রশ্ন উঠবে: কার জীবন? শূদ্রের না ব্রাহ্মণের, বৈশ্যের না ক্ষত্রিয়ের? সবার জীবন তো এক খাতে বইবে না, কারো কারো মধ্যে তো খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। রাজশেখর এই সামাজিক উচ্চাবচতার ব্যাপারটা নিয়ে সচেতন ছিলেন। নইলে এ কথা কেন বলবেন যে 'গীতা সর্বসাধারণের জন্য রচিত হয়নি'?[১২] আত্মপক্ষ সমর্থনে গীতার একটি বিখ্যাত শ্লোক উদ্ধৃত করে তিনি বলছেন—

> এই গীতোক্ত ধর্ম তোমার কদাচ তপস্যাহীনকে বক্তব্য নয়, অভক্তকে নয়, অশ্রবেণচ্ছুকে নয়, যে আমাকে [= কৃষ্ণকে] অসূয়া করে তাকেও নয়। কাম্য কর্মে আসক্ত বিষয়সেবী অজ্ঞ-লোকের বুদ্ধিভেদ করতে গীতাকার নিষেধ করেছেন।[১৩]

তাঁর মনে এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই যে, গীতার শিক্ষা সমাজের সর্বজনের জন্যে নয়, বাছাই করা কিছু লোকের জন্য:

> গীতার উপদেশ— জ্ঞানী ব্যক্তি নিজ আচরণ দ্বারা সামাজিক আদর্শ রক্ষা করবেন, যাতে জনসাধারণ একটা সুনির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ সুগম মার্গ অনুসরণ করতে পারে।[১৪]

সমাজে একদল জ্ঞানী ব্যক্তি আছেন। তাঁরা নিজ আচরণ দ্বারা একটা আদর্শ রক্ষা করবেন। আর সেই আদর্শ নির্বিবাদে মেনে চলবেন সমাজের বাকি অংশ— জনসাধারণ। শুধু মেনে চলবেন নয়, সেই চলার মার্গটি নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ, এ দিক ও দিক হওয়ার জো নেই। সে পথ সুগম করে তোলাই জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের কাজ। যে-পথ দেখানো হবে তা থেকে বিচলনের, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ থাকবে না। হয়তো বিচলন শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং গীতা খুব সচেতনভাবেই

সমাজ-পরিচালকদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে রচিত, এই হল রাজশেখরের কথার তাৎপর্য।

শুধু স্বার্থ রক্ষাই নয়, কেউ সে-স্বার্থ বিঘ্নিত করলে তাকে নিরস্ত করার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য নিহিত ছিল গীতার মধ্যে—

> বিষযাসক্ত অজ্ঞলোকেব বুদ্ধিভেদ কবলে *কুতার্কিক সমাজদ্রোহীব* উদ্ভব হবে এই আশঙ্কা গীতাকারের ছিল।[১৬]

কোন্ সমাজদ্রোহ সুতর্ক-ভিত্তিক, আর কোনটা কুতর্ক-ভিত্তিক, সে বিচার কে করবে, এ প্রশ্ন অবশ্য রাজশেখর তোলেননি (এ প্রশ্ন না-তোলাটা অবশ্যই এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক, সে প্রসঙ্গে একটু পরেই আসছি)। কিন্তু সাধারণভাবে আমরা জানি, যেকোনো সমাজেই যেসব তর্ক সমাজপ্রভুদের কর্তৃত্ব নিয়ে, অথবা সমাজের স্থিতাবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, সেইগুলোই কুতর্ক বলে বিবেচিত হয়। তিনি ধরেই নিয়েছেন, সেইসব কুতর্ককে কীভাবে নিরস্ত করতে হবে, তার পথনির্দেশনাই গীতার মর্মবস্তু। কোনোরকম সমাজদ্রোহকে প্রশ্রয় না দেওয়ার দর্শনই গীতার দর্শন। নীতিশাস্ত্র বলতে এখানে পরিষ্কারভাবেই সেই নীতিশাস্ত্র বোঝানো হচ্ছে, যা সমাজ-শাসকদের অনুকূল। সমাজ বলতে এখানে সমাজ-পরিচালকদের গোষ্ঠীকেই বোঝানো হচ্ছে, যেমন প্রাচীন গ্রীসে গণতন্ত্র বলতে দাস-মালিকদেব গণতন্ত্র বোঝানো হত। সমাজের সকল মানুষের মঙ্গল-অমঙ্গল আদৌ তার বিবেচ্য নয়, তার বিবেচ্য হল সমাজের 'শান্তি', অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে বৈষম্যভিত্তিক ভারসাম্য।

কিন্তু তাই যদি হবে, তা হলে গীতার বাংলা অনুবাদ করে তার বাণী সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ কি অভিপ্রেত? এইখানে রাজশেখরের দোটানা ধরা পড়ে যায়। প্রথমত তিনি স্বীকার করেন:

> বর্তমান কালে [অন্তত ১৯৪৮ সালে] গীতা সম্বন্ধে এই সতর্কতা অবলম্বন করা অসম্ভব।[১৭]

তার অর্থ হল, সেই সতর্কতা পূর্বকালে অবলম্বন করা সম্ভব ছিল এবং সেটাই করা উচিত ছিল। গীতার প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল সমাজের পরিচালক মহলেই। কারণ, গীতার বহু যুক্তিই শাঁখের করাত, তা দুদিকেই কাটে। যারা পরিচালিত, তারা যদি গীতার যুক্তিতে বলীয়ান হয়ে পরিচালকদের মারতে আরম্ভ করে, এবং বলে যে আত্মা তো মরে না, সুতরাং তোমাদের মারলে কোনো অন্যায় নেই, তা হলে সেটা গীতাকারের মতে ঠিক নয়। যুক্তি যা কিছু সব এক পক্ষেই থাকুক, এই তাঁর বাসনা। তাই ওই 'সতর্কতা'। কিন্তু গণতান্ত্রিক যুগে, যখন স্বাধীন চিন্তার সর্বজনীন অধিকার ব্যাপকভাবে স্বীকৃত, অন্তত মুখে স্বীকৃত, তখন সেই সতর্কতা আর তো অবলম্বন করা সম্ভব নয়। রাজশেখর তাই বাধ্য হয়েই মেনে নেন যে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সকলেই

ইচ্ছে করলেই আজ গীতা পড়তে পারে। কিন্তু তাই বলে তিনি যে স্বাধীন চিন্তার সর্বজনীন অধিকারের মস্ত প্রবক্তা তা মনে করার কোনো কারণ নেই। কারণ উদ্ধৃত অংশটির ঠিক পরের কটি শব্দ এইরকম:

> কিন্তু একথা স্বীকার করতে হবে যে, আপামর জনগণকে গীতা মুখস্থ করিয়ে কোনও লাভ নেই।[১৮]

কেন লাভ নেই? কারণ, জনসাধারণ ওর মর্ম উদ্ধার করতে পারবে না। ওখানে যেসব মূল্যবোধ ও উপদেশ ব্যক্ত হয়েছে, তা সম্যক বুঝতে পারবে না। বোঝবার খুব প্রয়োজন আছে বলেও তিনি মনে করেন না।

এইখানে তাঁর চিন্তার দোদুল্যমানতা। এক দিকে তিনি বলছেন, গীতা শুধু ভালোমন্দ-নির্দেশক নীতিশাস্ত্রই নয়, সেই নীতিকে জীবনে সদর্থকভাবে প্রয়োগ করার উপায়-নির্দেশকও বটে; অন্য দিকে বলছেন, সেই পথ জনগণকে শিখিয়ে কোনো লাভ নেই! তার অর্থ কি তা হলে এই দাঁড়াল না যে, সমাজের ভালোমন্দ, নিজের ভালোমন্দ নিয়ে মাথা ঘামানো আপামর জনগণের কাজ নয়, তাদের কাজ কেবল নির্বিচারে জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথা মেনে চলা? জ্ঞানী ব্যক্তিরা ভুল করলে তা নিয়ে প্রশ্ন করা বারণ, কেননা তা হলেই সেটা কুতর্ক এবং সমাজদ্রোহ বলে গণ্য হবে। এখানে গণতান্ত্রিক সমাজের একটি একেবারে বনিয়াদি ভাবনার বিরোধিতা করছেন রাজশেখর।

ব্যাপারটাকে তিনি সমর্থন করছেন এই যুক্তিতে যে—

> চিকিৎসকের ব্যবহৃত ঔষধের গুণাগুণ বুঝে নিয়ে তারপর ঔষধ সেবন করা সকল রোগীর সাধ্য নয়। চিকিৎসকের উপর বিশ্বাস, শ্রদ্ধা বা ভক্তির বশেই সাধারণ রোগী ঔষধ সেবন করে। ব্যবস্থার কারণ যে বুঝতে চায় তারও শ্রদ্ধা ও 'অনসূয়া' আবশ্যক, নতুবা বোঝবার সামর্থ্যই আসবে না।[১৯]

ওষুধের দোষগুণ বোঝা সকল রোগীর *সাধ্য* কি না, সেটা পরের প্রশ্ন। আগের কথা হল, রোগীর সে *অধিকার* আছে কি না। আধুনিক মেডিক্যাল এথিক্স ও মানবাধিকার বলছে, সকল রোগীর সেই অধিকার আছে। ঔষধের বা চিকিৎসার গুণাগুণ— বিশেষ করে অগুণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করাটা 'সাধারণ', অর্থাৎ অবিশেষজ্ঞ রোগীর অধিকার বলে গণ্য। উন্নত বুর্জোয়া দেশের চিকিৎসকরা ভালো করেই জানেন যে, ওষুধের বা চিকিৎসার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে রোগীকে সম্যক অবহিত করাটা আজ চিকিৎসকের কর্তব্য বলে মান্য। বরং 'ভক্তিশ্রদ্ধা'-বশত চিকিৎসকের কাছে জানতে না-চাওয়াটাই আজ মূঢ়তা বলে গণ্য। এমনকী বহু

ক্ষেত্রে চিকিৎসা বেছে নেওয়ার অধিকারও রোগীর রয়েছে। সাধারণ বা অবিশেষজ্ঞ মানুষের মূঢ়তা সম্বন্ধে এলিটিস্ট অবজ্ঞা অভিজাততান্ত্রিক সমাজের প্রবক্তার মুখেই মানায়, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজে তা অচল।

এমন নয় যে অকাট্য বৈজ্ঞানিক সত্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা সম্বন্ধে নিরঙ্কুশ শ্রদ্ধাই রাজশেখরকে ওই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছে। কেননা গীতাকারের কেজো বিচক্ষণতার উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন:

> তৎকালপ্রচলিত বৈদিক ক্রিয়াকলাপের উপর গীতাকারের শ্রদ্ধা নেই, কিন্তু নিম্ন অধিকারীর পক্ষে এসকল কর্ম তিনি হিতকর বলেই মনে করেন। শ্রেষ্ঠ সাধকের পক্ষেও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান বর্জনীয় বলা হয়নি, কারণ তাতে *ইতর সাধারণের আদর্শ-বিপর্যয়ের সম্ভাবনা।*"

তার মানে, ইতর সাধারণের আদর্শ-বিপর্যয় রুখবার জন্য গীতাকার স্বয়ং নিজের বিশ্বাস-বিরুদ্ধ কথা প্রচার করছেন। সত্যের আপসহীন অনুসন্ধান বা অনুসরণ তাঁর লক্ষ্য নয়, স্থিতাবস্থা বজায় রাখার কৌশল অবলম্বনই তাঁর অভিষ্ট। কথাটি ভালো করে বোঝা দরকার। সমাজের মাথারা যে সব অনুষ্ঠান পালন করে, সেগুলো যে মিথ্যা, প্রতারণামূলক, সে কথাটা ইতর সাধারণ একবার বুঝতে পারলে তারা প্রথমত ওই সব অনুষ্ঠানাদি পালন করবে না, দ্বিতীয়ত সমাজপ্রভুদের অভ্রান্ত বলে মানবে না, তৃতীয়ত নিজেদের মানবিক অধিকার দাবি করে বসে সমাজের স্থিতিশীলতাকে বিঘ্নিত করবে। সুতরাং গীতাকারের কাছে সত্য-মিথ্যার আলাদা কোনো তাৎপর্য নেই, কোন কথাটা সমাজ-পরিচালকদের স্বার্থ-সহায়ক, সেটুকুই বিচার্য। গীতার সঙ্কীর্ণ, কেজো উপযোগিতাকে এইভাবে অনুমোদন দিয়ে রাজশেখর কার্যত ওই জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থের দার্শনিক মর্যাদা অনেকখানিই কেড়ে নিলেন। অমর্ত্য সেনের মতো তিনি কিন্তু গীতার এই ভূমিকার সমালোচনা করছেন না, বরং ওই ভূমিকাটিকেই কাম্য বলে সমর্থন করছেন।

দ্বৈত মান

এইখানেই খটকা লাগে। বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির অন্যতম শ্রদ্ধেয় প্রবক্তা রাজশেখরের কাছ থেকে এটা যেন আমরা আশা করি না। কেননা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর ক্ষেত্রে তিনি এক নৈর্ব্যক্তিক অলঙ্ঘনীয়তার কথা বলেছেন: 'বিজ্ঞানও স্বীকার করে— এই জগৎ নিয়তির রাজ্য, সমস্ত ঘটনা কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত অখণ্ডনীয়রূপে নিয়ন্ত্রিত।' এমনকী আদি অর্থে অদৃষ্ট আর নিয়তির পার্থক্য কী, তার অনবদ্য ব্যাখ্যা দেন:

> নিয়তির অর্থ— সমস্ত ঘটনার অখণ্ডনীয় সম্বন্ধ বা আনুপূর্ব।... কতকগুলি জাগতিক ব্যাপার আমাদের বোধ্য বা সাধ্য, কিন্তু অধিকাংশই অবোধ্য বা অসাধ্য।

> প্রথমোক্ত বিষয়গুলি আমাদের 'দৃষ্ট' অর্থাৎ নির্ণেয়, শেষোক্ত বিষয়গুলি 'অদৃষ্ট' অর্থাৎ অনির্ণেয়। যাহা দৃষ্ট, তাহাতে আমাদের কিছু হাত আছে, যাহা অদৃষ্ট তাহাতে মোটেই হাত নাই।[২১]

প্রাকৃতিক নিয়মাবলি অনুধাবনের মানদণ্ড তাঁর কাছে একটাই, অনেক নয়। কিন্তু সমাজের ক্ষেত্রে তিনি একেবারে বিপরীত অবস্থান বেছে নিচ্ছেন। স্বীকার করছেন, এক এক অংশের জন্য এক একরকম নিয়ম প্রযোজ্য। গুণভিত্তিক বর্ণবিভাগ থেকে জাতিভিত্তিক বর্ণবিভাগ ও কর্মবিভাগ হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করে তিনি স্পষ্টই বোঝান, গীতায় যে অর্থে স্বধর্মের কথা বলা হয়েছে, তার দিন ফুরিয়েছে, আধুনিক যুগে তা অর্থহীন।

> কোনো এক কালে ভারতবর্ষে গুণকর্ম অনুসারে বর্ণবিভাগ হত, কিন্তু পরে বর্ণ, বৃত্তি ও ধর্ম জাতিগত হয়ে যায়। . সমাজের অধিকাংশ লোকই বর্ণগত ধর্মপালন করত। গীতায় স্বধর্ম শব্দের স্পষ্ট অর্থ— স্বীয় বর্ণের নির্দিষ্ট ধর্ম।[২২]

একালের কোনো আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত মনের পক্ষেই এই সঙ্কীর্ণতাকে নৈতিকতা-সম্মত বলে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। রাজশেখরও এই প্রশ্নে বেশ বিচলিত। তিনি 'গীতাযুগের সামাজিক অবস্থা'র বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে ওই ঘটনাটিকে বিচার করতে বলেন। অর্থাৎ তিনি মেনে নেন, ওই ধারণা যুগোত্তীর্ণ নয়, কেবল ওই বিশেষ যুগের পটভূমিতেই বিচার্য:

> গীতাযুগের সামাজিক অবস্থা কল্পনা করলে এই অর্থ সংকীর্ণ বোধ হবে না। তখনকার শিক্ষার ধারা বর্ণ বা বংশগত ছিল; যে লোক যে বর্ণে জন্মাত সেই বর্ণের নির্দিষ্ট আচরণই তার পক্ষে সুসাধ্য এবং স্বভাবের অনুকূল হত।[২৩]

তিনি কিন্তু মানেন যে

> বর্তমান কালে বর্ণগত ধর্ম লোপ পেয়েছে, সেজন্য 'স্বধর্মের' প্রাচীন অর্থ ধরলে গীতার অর্থ নিরর্থক হয়। এখনকার সমাজে বর্ণগত কর্মভেদ নেই, গুণকর্ম অনুসারেও বর্ণভেদ নেই। ধর্ম পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু নূতন ধর্মশাস্ত্র লিখিত হয়নি। এখন নিজের শিক্ষা, প্রতিবেশ, এবং স্বভাব বা রুচির অনুকূল ধর্মই স্বধর্ম।[২৪]

তাই যদি হয়, অর্থাৎ এ যুগে শ্রেণি ও বর্ণ নির্বিশেষে ব্যক্তিমানুষের যদি আপন আপন শিক্ষা, প্রতিবেশ, স্বভাব এবং রুচির অনুকূল কাজ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা থাকে, সে-স্বাধীনতা যদি সমাজ-স্বীকৃত হয়, তাহলে ইতর সাধারণের আদর্শ-বিপর্যয়ের এবং কুতর্কভিত্তিক সমাজদ্রোহের আশঙ্কা দূর করার উপযোগী শাস্ত্র হিসেবে গীতার গুণকীর্তনের কোনো যুক্তি থাকে কি?

আধুনিক মানুষের কাছে গীতার অন্য অনেক অনুপযোগিতার কথা তিনি পরিষ্কারভাবেই বলেন—

> গীতায় বহু প্রসঙ্গ আছে যা অনেক আধুনিক পাঠকের ধারণার বিরোধী। জন্মান্তরবাদ, দেশ থেকে উৎক্রান্ত সূক্ষ্মশরীর (১৫।৮), দেবযান, পিতৃযান (৯।২৫) প্রভৃতি, শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব, এমনকি তাঁর ঐতিহাসিকত্ব অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য হতে পারে।[১১]

গীতা সম্বন্ধে রাজশেখরের উপলব্ধির জায়গাগুলি পরপর সাজালে এইরকম দাঁড়ায়: গীতা ১) সর্বসাধারণের উদ্দেশে রচিত নয়, বিশেষ এক শ্রেণির মানুষের জন্য রচিত। 'আপামর জনগণকে গীতা মুখস্থ করিয়ে কোনও লাভ নেই।' ২) এর উদ্দেশ্য হল ইতর সাধারণের আদর্শ-বিপর্যয়ের এবং কুতর্কভিত্তিক সমাজদ্রোহের আশঙ্কা নিরস্ত করার পথ দেখানো। মানুষ নিজের মতো ভাবতে শিখুক, এটা গীতাকারের কাম্য নয়। ৩) স্বধর্ম, যা গীতায় ব্যাখ্যাত ধারণাগুলির মধ্যে প্রধান, তা ওই বিশেষ যুগের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থময় হলেও, আধুনিক পরিবেশে তা অর্থ হারিয়েছে, কেননা এখন ব্যক্তিমানুষের নিজের শিক্ষা, প্রতিবেশ, স্বভাব ও রুচির অনুকূল ধর্মই স্বধর্ম। ৪) সেই অর্থে গীতা যুগোত্তীর্ণ নয়, তার মহিমা তার নিজ কালের উপযোগিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ৫) সমাজের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে তা অত্যন্ত উপযোগী ছিল। সেই স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য নিজ বিশ্বাসবিরোধী কূটকৌশল, যে-ধারণা তাঁর নিজের মতেই মিথ্যা, তা প্রচার করতে গীতাকারের বিবেক দষ্ট হয়নি। অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠা গীতার প্রধান গুণ নয়। কোসাম্বি-কথিত সুবিধাবাদই তার চরিত্রলক্ষণ। এখানে রাজশেখর যেন রবীন্দ্রনাথের সেই ব্যাখ্যাই মেনে নিয়েছেন: :'গীতার মধ্যে কোনো একটা বিশেষ সময়ের বিশেষ প্রয়োজনের সুর আছে, তাই ওর নিত্য অংশের সঙ্গে ক্ষণিক অংশ জড়িয়ে গিয়ে কিছু যেন বিরোধ বাধিয়ে দিয়েছে।' মুশকিল হচ্ছে, তিনি সেটাকে রবীন্দ্রনাথের মতো গীতার অপকর্ষ বা ন্যূনতা বলে ব্যাখ্যা করছেন না, বরং সেটাকেই ওর কাম্য বৈশিষ্ট্য বলে অনুমোদন করছেন। ৬) গীতায় ব্যক্ত জন্মান্তরবাদ, সূক্ষ্মশরীর, দেবযান, পিতৃযান প্রভৃতি ধারণা বেশ কিছু লোকের কাছে বিজ্ঞান-বিরোধী বলে অগ্রহণীয়। রাজশেখরও তাদেরই মধ্যে পড়েন বলে অনুমান করা যেতে পারে। ৭) গীতায় যে-নীতিশাস্ত্রের কথা বলা হয়েছে তা সর্বজনীন মানবতা-আদর্শের বিরোধী, যেহেতু তা সমাজের এক এক গোষ্ঠীর মানুষের প্রতি এক এক রকম মানদণ্ড প্রয়োগ করাটাকে ন্যায্য মনে করে। কিন্তু এটা তাঁর মতে প্রয়োজনীয় জিনিস।

লক্ষণীয়, অক্ষয় দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, অমর্ত্য সেন এঁরা প্রত্যেকেই যে-নৈতিক সুবিধাবাদকে গীতার প্রধান দুর্বলতা বলে চিহ্নিত করেছেন, রাজশেখর সে প্রসঙ্গটা

নিয়ে আদৌ ভাবিত নন। হৃত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য এত বিপুল পরিমাণ নরহত্যাকে নৈতিক দিক থেকে সমর্থন করা যায় কি না, সেই প্রশ্নটা তিনি সরাসরি তোলেননি। বরং ঘুরপথে যেভাবে প্রসঙ্গটা তুলেছেন তাতে দেখা যায়, ওই ভয়ঙ্কর নরহত্যায় তাঁর অনুমোদনই ছিল:

> গীতায় শান্ত সহিষ্ণু মৃদু অহিংস হবার বহু উপদেশ আছে, কিন্তু ক্লীবের তুল্য পীড়ন সইতেও নিষেধ আছে। দুষ্ট শত্রুব বিরুদ্ধে অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাই গীতার উপলক্ষ্য। 'তস্মাৎ যুদ্ধায় যুজ্যস্ব'— এই বাক্য বহু স্থলে গীতাধর্ম বিবৃতির সহিত জড়িত আছে। বিশ্বরূপ বর্ণনায় ব্রহ্মের ভয়াবহ সংহারমূর্তিই প্রকটিত হয়েছে। গীতাধর্ম শৌর্যবীর্যাদি পুরুষোচিত গুণের এবং সমাজরক্ষার্থ নিষ্ঠুরতারও পরিপন্থী নয়।[২৬]

সমাজরক্ষার্থ? যে-সমাজে সাধারণ মানুষের কাজ হল পরিচালকদের কথা বিনা প্রশ্নে মেনে চলা, সেই সমাজরক্ষার্থ নিষ্ঠুরতার প্রয়োগ অনুমোদন করছেন রাজশেখর! এই নিষ্ঠুরতার ফল গোটা সমাজের পক্ষে কী ভয়াবহ হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করেছেন অমর্ত্য সেন। গীতার এই অ-নৈতিক সুবিধাবাদে ব্যাহত হয়েই রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন: 'সম্মুখে একটি সাময়িক প্রয়োজন অত্যন্ত উৎকটভাবে থাকাতে ব্যাখ্যাটির মধ্যে খুব উচ্চভাবের সঙ্গেও তর্কচাতুরি খানিকটা না মিশে পারেনি।' কিন্তু রাজশেখর এ প্রসঙ্গে নির্বিকার।

তাই আধুনিক বিজ্ঞান-অবহিত মানুষের চোখে গীতার নানারকম ছিদ্র আবিষ্কার করার পরেও তাঁর মন্তব্য:

> কিন্তু সমস্ত অস্পষ্ট ও বিসংবাদী বিষয় বাদ দিলেও যা থাকে তা অতুলনীয়। বহু পূর্বে বহু প্রাচীন সংস্কারের মধ্যে রচিত হলেও গীতায় *সর্বকালের উপযোগী শ্রেষ্ঠ* সাধনপদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।[২৭]

কী সেই শ্রেষ্ঠ সাধনপদ্ধতি যা বহু পূর্বে বহু প্রাচীন সংস্কারের মধ্যে রচিত হলেও রাজশেখরের মতে আধুনিক যুগেও মূল্য হারায়নি? প্রথমত, চরম মোক্ষলাভের (সেটা কী, তা তিনি ব্যাখ্যা করেননি) পথে যেসব 'সোপানের' কথা বলা হয়েছে, 'তার কোনও পঙ্ক্তিতে উঠতে পারলেও মানুষ কৃতার্থ হতে পারে— এও গীতার বক্তব্য।... সাধারণ লোকের গীতাপাঠের এও সার্থকতা।'[২৮] সেই 'সাধারণ লোক', যাদের 'গীতা মুখস্থ করিয়ে কোনও লাভ নেই' বলে তিনি মনে করেন! সর্বসাধারণের আত্মোন্নতির পথ বন্ধ করে দিয়ে এলিট অংশের আত্মোন্নতিতে নিযুক্ত সমাজকে নিশ্চয়ই সমদর্শী বলা যাবে না। বস্তুত সমদর্শী সমাজ গীতাকারের কাম্য তো নয়ই, কিন্তু— এইটাই দুঃখের কথা— রাজশেখরেরও কাম্য নয়। তাঁর মতে, গীতাকারের 'আদর্শ রাজর্ষি জনক। যিনি উপযুক্ত অধিকারী, তিনি সমাজে থেকে নিজ স্বভাব

অনুযায়ী সমাজধর্ম পালন করেও এই সাধনা করতে পারেন।'[৩২] আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এর বিরুদ্ধে যা যা বলবার থাকতে পারে, সে সবই রাজশেখরের জানা। তিনি সেগুলোর ন্যায্যতা পুরোপুরি অস্বীকার করেন না। তা সত্ত্বেও তাঁকে বলতে হয়, 'গীতায় সর্বকালের উপযোগী শ্রেষ্ঠ সাধনপদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।' কোথাও কোনো একটা মানসিক অন্ধবিন্দু তাঁর ছিল, যা তাঁর মতো যুক্তিসন্ধ মানুষকেও অভিভূত করে ফেলত। সেই বদ্ধ ধারণার বাধ্যবাধকতার বশেই তিনি এই ধরনের আত্মখণ্ডন করেছেন। জীবৎকালে এটি প্রকাশ করেননি কি এইসব কারণেই?

উপসংহার

এ কথা ঠিক যে, গীতাভাষ্যের মধ্যে রাজশেখরের স্বভাবসুলভ সংশয়বাদী বৈজ্ঞানিক যুক্তিমত্তারও অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। তিনি যে চলতি পথের পথিক নন, তা পরিষ্কার। কিন্তু যখনই সমাজগঠনের কথা, সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন অংশের মানুষের অধিকারের কথা উঠেছে, তখনই বেরিয়ে পড়েছে তাঁর অভিজাততান্ত্রিক রূপ।

হয়তো বিজ্ঞানকেও রাজশেখর অভিজাততান্ত্রিক অবস্থান থেকে গ্রহণ করেছিলেন। জনসাধারণ বিজ্ঞানের ফল ভোগ করবে ঠিকই, এমনকী দৈনন্দিন জীবনে কিছুটা বিজ্ঞানমনস্কও হবে, কিন্তু বিজ্ঞান *চর্চার* অধিকার শুধু অভিজাতদেরই থাকবে। এ এক ধরনের আধুনিক ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, যাকে আধুনিক পরিভাষায় বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বুদ্ধিতন্ত্র বলতে পারি। কার্ল পপারের মধ্যেও এই জিনিসটাই দেখতে পাই। তিনিও বিজ্ঞানকে— প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে— খুব শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, এমনকী বিজ্ঞান-বিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়াইও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিটা ছিল ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক। তিনি মেনে নিয়েছিলেন যে পৃথিবীতে দারিদ্র্য, বঞ্চনা, বৈষম্য ও শোষণ থাকবেই। তারই মধ্যে কিছু লোক যদি আশ মিটিয়ে লিখতে পড়তে পারে, তো সেই অনেক। 'পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশ এবং উত্তর আমেরিকার সমাজ মেধাবী মানুষকে সেই সুযোগ দেয়, তাই তাঁর মতে সেই সমাজব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ। তিনি চান এক নব ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, যেখানে তাঁর মতো পণ্ডিতেরা বিনা ব্যাঘাতে, সসম্মানে বিদ্যাচর্চা করতে পারবেন, বিনিময়ে শাসকদের জোগাবেন টিকে-থাকার যুক্তি।'[৩৩] জনসাধারণের কাজ হবে তাঁদের মতো 'জ্ঞানীদের' বলে দেওয়া পথ অনুসরণ করা। রাজশেখর বসুও কি সেই অভিজাততান্ত্রিক নব-ব্রাহ্মণ্যবাদেরই পথিক?

('জলার্ক' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের পরিবর্ধিত রূপ)

ভগৎ সিংহ: 'লড়াকু নিরীশ্বরবাদী'

ভগৎ সিংহের (১৯০৭-১৯৩১) ফাঁসি হয়েছিল ২৩ মার্চ, ১৯৩১। জীবিতকালেই তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অবিশ্বাস্য। রাজনৈতিক দিক থেকে তাঁর বিপরীত মেরুর বাসিন্দা জওহরলাল নেহরুকে পর্যন্ত ১৯৩৬ সালে স্বীকার করতে হয়েছিল যে, সশস্ত্র বিপ্লববাদীরা 'গত ত্রিশ বছর ধরিয়া কোনো না কোনো আকারে ভারতবর্ষে আছে কিন্তু বাংলাদেশে প্রথম সূচনার কথা ছাড়িয়া দিলে আর কেহ ভগৎ সিংহের শতাংশের এক অংশও জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই।'[১]

ব্রিটিশ যুগের সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের মরণপণ আদর্শনিষ্ঠার অসীম মহত্ত্বকে কোনোভাবেই খাটো করার স্পর্ধা না দেখিয়েও একটা কথা বলা যেতেই পারে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এঁরা জনগণের ওপর নির্ভর করতে পারেননি, এবং মতাদর্শগত দিক থেকেও এঁদের সামনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো দিশা ছিল না। তাঁদের দৃষ্টি প্রায়শই ধর্মীয় ভাবাকুলতায় আবিল হয়ে উঠে বহুধর্মী ভারতের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভেদ আনার পথ প্রশস্ত করেছিল। দু-একটি পরিচিত উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ১৯০২

সালে স্থাপিত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 'অনুশীলন সমিতি'র একটা নিয়ম ছিল: 'হিন্দু নয় কিংবা যার ভিতরে হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্বেষ এমন কোনো ব্যক্তিকে সমিতিতে ভর্তি করা হবে না।' অনুশীলন সমিতির একটি অনুশাসন ছিল: "মুসলিম বর্জন"। তাতে বলা হয়েছিল: 'আমরা যতটা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারছি তা থেকে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় এই জন্মেছে যে এক বা দুই বৎসরের ভিতরে সমগ্র মুসলিম জাতি হিন্দুদের বশীভূত হয়ে যাবে। কিন্তু তারপরে যদি হিন্দুরা তাদের দৃঢ়তা ও জাতীয় গৌরব পরিত্যাগ করে এবং মুসলমানদের সঙ্গে গলায় গলায় ভাব করে তাদের বন্ধুত্ব যাচনা করার মতো অধঃপাতে যায় তাতে মুসলমানদের বাড় বেড়ে যাবে...।' উদারতা দেখিয়ে তাঁরা অবশ্য এ কথাও বলেছিলেন যে, 'কিন্তু কোনো অবস্থাতেই জাতি হিসেবে মুসলমানদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব দেখানো ও লেনদেনে অবিচার করা উচিত হবে না।'[১]

ব্রিটিশ ভারতের বিপ্লবাত্মক রাজনীতির এই ধর্ম-কলুষিত পরিপ্রেক্ষিতে ভগৎ সিংহকে তাই নানা দিক থেকে দলছুট মনে হয়। শুধু এজন্যে নয় যে তিনি খুব দ্ব্যর্থহীনভাবে নিরীশ্বরতার চর্চা করেছিলেন, সমস্ত রকম ধর্মের সীমাবদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন; বরং এই জন্যে যে সেই নিরীশ্বর বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি ভারতবর্ষের তৎকালীন ব্যবহারিক রাজনীতির সঙ্গে মেলাতে চেয়েছিলেন, জনগণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চেয়েছিলেন, কিছুটা পেরেওছিলেন। তার জন্য সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর বিস্তর মতান্তর, এবং কিছু মনান্তরও হয়েছিল। অথচ তিনি ছিলেন না যাকে বলে প্রগাঢ় বুদ্ধিজীবী বা দার্শনিক, তাঁর ছিল না বিপুল অবসর। সাধারণ পড়াশোনা, পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক পরিবেশ এবং সক্রিয় বিপ্লবসাধনার মধ্যে থেকেই, মাত্র চব্বিশ বছর আয়ুঃসীমার মধ্যে তিনি এই অনন্য স্বচ্ছতা অর্জন করেছিলেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩০ সালে জেলে বসে লেখা *Why I am an Atheist* তাঁর এক অমূল্য দলিল। 'কেন আমি নাস্তিক' (প্রথম প্রকাশ ১৯৮০) নামে এই পুস্তিকাটির এক অসুখপাঠ্য বাংলা অনুবাদ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি বহুকাল ধরে প্রকাশ করে আসছেন। কে অনুবাদক, সেই তথ্যটি সেখানে অনুল্লেখিত। যাই হোক, আমরা এই আলোচনায় ওই অনুবাদটিকে অনুসরণ করব না, প্রয়োজন মতো অনুবাদ করে নেব।

আরেকটি কথা। ভগৎ সিংহের রাজনৈতিক জীবন এখানে আমাদের প্রধান আলোচ্য নয়, যদিও সে আলোচনা আজকের দিনে নতুন করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলে মনে করি। এখানে মূলত দেখতে চাইব গভীর ধর্মমনস্ক এক শিখ সন্তান কী যন্ত্রণাকর প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিরীশ্বর হয়ে উঠলেন এবং তার জন্য নিজের সঙ্গে ও আপনজনদের সঙ্গে কী ধরনের সংগ্রাম তাঁকে করতে হয়েছিল।

কেন আমি আস্তিক নই

পুস্তিকার শুরুতেই ভগৎ তাঁর কমরেডদের, এমনকী নেতাদের সঙ্গে তাত্ত্বিক ও দার্শনিক বিরোধের প্রসঙ্গ তোলেন।

> এক নতুন সমস্যা মাথা চাড়া দিয়েছে। সর্বশক্তিমান, সর্ববিরাজমান এবং সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমার অবিশ্বাসের মূলে কি কাজ করছে আমার আত্মাভিমান? কখনও কল্পনা করতে পারিনি যে এমন এক প্রশ্নের মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু কোনো কোনো বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে—আশা করি তাঁদের 'বন্ধু' ভেবে আমি বেশি দাবি করে ফেলছি না— আমি এই ইঙ্গিত পেয়েছি যে আমার কিছু কিছু বন্ধু আমার সঙ্গে সামান্য দু চার কথা বলে এই সিদ্ধান্তে আসতে চাইছেন যে আমার পক্ষে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করাটা বড্ড বাড়াবাড়ি, আর এই বাড়াবাড়ির মূলে কাজ করছে আমার আত্মাভিমান।

তেইশ বছর বয়সী ভগৎ অবশ্য স্বীকার করেন যে তিনি 'একজন মানুষ' এবং মনুষ্যজনোচিত 'দুর্বলতা' তাঁর মধ্যে থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

> আত্মাভিমান সত্যিই আমার স্বভাবের মধ্যে আছে। কমরেডরা অনেকেই আমাকে স্বৈরাচারী বলতেন। এমনকি আমার বন্ধু বটুকেশ্বর দত্তও কখনও কখনও তাই বলেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাকে তো নিষ্ঠুরও বলা হয়েছে। কোনো কোনো বন্ধু অভিযোগ করেন— সে অভিযোগ যথেষ্ট গুরুতর— যে আমি অজান্তেই আমার মতামত অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিজের প্রস্তাবে সম্মতি আদায় করে নিই। এ অভিযোগ কিছুটা সত্যি, তা স্বীকার করব। এটাকে অহংমন্যতা বলা যেতে পারে।

এইভাবে নিজের মানবিক দুর্বলতার কথা স্বীকার করে নিয়ে তিনি বলছেন

> আমার মধ্যে আত্মাভিমান আছে। এই কারণে আছে যে আমরা যেটা বিশ্বাস করি তা জনগণের মধ্যে প্রচলিত অন্যান্য মতের বিপ্রতীপ। কিন্তু সে আত্মাভিমান তো ব্যক্তিগত নয়। বড়োজোর তাকে ন্যায্য গর্ব বলা যেতে পারে, কিন্তু তা আত্মাভিমান কখনোই নয়। আত্মাভিমান, কিংবা আরো পরিষ্কার করে বললে, 'অহংকার' বলতে বোঝায় নিজের সম্বন্ধে অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত গর্ব। ঐ ধরনের কোনো অস্বাভাবিক গর্বই আমাকে নিরীশ্বরবাদের দিকে টেনে নিয়ে গেছে, নাকি ঐ বিষয়ে অত্যন্ত সযত্ন অধ্যয়ন ও গভীর ভাবনাচিন্তার পরই আমি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছি, সেই প্রশ্নটা নিয়েই এখানে আলোচনা করতে চাই।

এইখানে একটু থেমে ভগৎ সিংহের পারিবারিক ও রাজনৈতিক পটভূমি নিয়ে দু-এক কথা বলে নেওয়া সঙ্গত।

পারিবারিক ও রাজনৈতিক পটভূমি

সশস্ত্র বিপ্লববাদের ধারা প্রথম থেকেই পাঞ্জাবে কিছুটা স্বতন্ত্র পথ ধরে বিকাশ লাভ করেছিল। 'ইহা ছিল পাঞ্জাবের চরমপন্থী নায়কদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কেবল পাঞ্জাব আর বোম্বাইয়ের চরমপন্থীরাই শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামের দিকে মুখ ফিরাইতে এবং উহার সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন...।'[৩] লালা লাজপৎ রায়, অজিত সিংহ প্রমুখ নেতারা গোড়া থেকেই শ্রমিক কৃষকদের সঙ্গে একাত্মতা গড়ে তোলার ওপর মনোনিবেশ করেছিলেন। বিশেষ করে অজিত সিংহ— যিনি ছিলেন ভগৎ-এর কাকা। ১৯০৭ সালে অজিত সিংহ 'হিন্দু ভাইসব, মুসলমান ভাইসব, জাঠ ভাইসব (যাঁরা প্রধানত কৃষিজীবী), শ্রমিক ভাইসব, সিপাহী ভাইসব'কে সশস্ত্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইয়ে শামিল হওয়ার জন্য আহ্বান করেছিলেন।[৪] এর সঙ্গে ১৯০২ সালের অনুশীলন সমিতির মনোভাবের তুলনা করলেই তফাতটা ধরা পড়ে যায়। শুধু অজিত সিংহই নন, ভগতের গোটা পরিবারই ছিল সংগ্রামী। তাঁরা বাবা কিযান সিংহ কৃষকদের মধ্যে-সমাজ-সংস্কারের কাজ করেছেন লালা লাজপৎ রায়ের সঙ্গে। পরে চলে এসেছিলেন প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে।

এহেন এক পরিবারে ঘরে-বাইরে বিপ্লবী ঝঞ্ঝার মধ্যে ১৯০৭ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর (মতান্তরে ৫ অক্টোবর) লায়ালপুরে বঙ্গা গ্রামে ভগৎ-এর জন্ম। একেবারে দুধের বয়স থেকেই সে দেখেছে বাবা-কাকা জেলে নির্বাসিত, মা-কাকিমার চোখে জল, মনে গর্ব। কাকিমা হরনাম কাউর, অজিত সিংহের স্ত্রী, ভগৎকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালা হত্যাকাণ্ডের সময় ভগতের বয়স বারো। অমৃতসর থেকে 'সেই রক্তরঞ্জিত মৃত্তিকার কিছুটা সঞ্চয় করে বোতলে পুরে' নিয়ে এসেছিল সেই বালক— 'যেন না ভুলি, কখনো না ভুলি।'

১৯২২ সালে চৌরিচৌরার ঘটনার পর অনেকেরই মতো কিশোর ভগৎও গান্ধি-নেতৃত্ব সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। ১৯২৪-এ বাড়িছাড়া হয়ে যোগাযোগ করেন বিপ্লববাদী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় পুরুষ শচীন্দ্রনাথ সান্যালের (১৮৯৩-১৯৪৫) সঙ্গে এবং সেই সূত্রে কানপুরে যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৯৫-১৯৩৬) সঙ্গে। যোগেশচন্দ্র আত্মজীবনীতে লিখেছেন: 'তখন তার বয়স মাত্র সতেরো, কিন্তু সেই বয়সেই সারা মুখে দাড়ি। বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, সব সময়েই কৌতূহল।... রাশিয়ার বিপ্লবের সাফল্য ও সাম্যবাদও আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল।' ক্রমে বটুকেশ্বর দত্ত (১৯০৮-১৯৩৬), চন্দ্রশেখর আজাদ প্রমুখ বিপ্লবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন ভগৎ। ১৯২৪-এর শেষে গঠিত হল হিন্দুস্তান রিপাব্লিকান

অ্যাসোসিয়েশন। ভগৎ তার প্রচারকাজে নামলেন। ইশতেহার, পুস্তিকা লেখা, গোপনে ছাপা ও বিলি করা তাঁর দায়িত্ব। কলকাতায় সে ভার নিয়েছেন যতীন্দ্রনাথ দাস (১৯০৪-১৯২৯)। ১৯২৫ সালে কাকোরি স্টেশনের কাছে ট্রেন থামিয়ে সরকারি টাকা লুঠ করলেন বিপ্লবীরা। কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন। ফাঁসি হল রামপ্রসাদ বিসমিল, রাজেন লাহিড়ী, আসাফাকউল্লা, রোশন সিংহের। অন্যদেরও কঠিন কারাদণ্ড হল। 'এই সময় শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ও যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জিকে জেল থেকে মুক্ত করার একটা চেষ্টা করা হয়। যোগেশ চ্যাটার্জিকে ট্রেনের মধ্য থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার এই প্রচেষ্টায় চন্দ্রশেখর আজাদ, বিজয়কুমার সিংহ, বটুকেশ্বর দত্ত, রাজগুরু ও শিব বর্মার সঙ্গে ভগৎ সিংহও কানপুরে যান। কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। তাঁরা শোনেন যে, আগের ট্রেনেই তাঁকে লক্ষ্ণৌতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ব্যর্থতা ভগৎ সিংহের বুকে এতই বাজে যে তিনি কেঁদে ফেলেন।'[৭] হিন্দুস্তান রিপাব্লিকান অ্যাসোসিয়েশন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

১৯২৬-এ সেই আন্দোলনকে চেতিয়ে তুলবার জন্য আপ্রাণ প্রয়াসে রত হলেন অনেকে। বাংলায় যতীন দাসের 'তরুণ সমিতি', আর তারই আদলে পাঞ্জাবে ভগৎ সিংহের 'নওজোয়ান সভা'। ১৯২৮ সালে হিন্দুস্তান রিপাব্লিকান অ্যাসোসিয়েশনকে নতুন করে গড়ে নেওয়ার জন্য চলল আলোচনা। বিজয়কুমার সিংহ আর ভগৎ হলেন তার আহ্বায়ক। ততদিনে ভাবনার মধ্যে অন্য দিশা এসে গেছে। সঙ্ঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাল রেখে তাই নামেও এল পরিবর্তন: হিন্দুস্তান রিপাব্লিকান অ্যাসোসিয়েশনের বদলে হিন্দুস্তান রিপাব্লিকান *সোশালিস্ট* অ্যাসোসিয়েশন। তারই পাশাপাশি গঠিত হল সশস্ত্র বাহিনী: হিন্দুস্তান রিপাব্লিকান সোশালিস্ট আর্মি। সর্বাধিনায়ক চন্দ্রশেখর আজাদ।

অন্যান্য বিপ্লবী গোষ্ঠীর সঙ্গে, বিশেষ করে বাংলার বিপ্লববাদী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে এই হিন্দুস্তান রিপাব্লিকান সোশালিস্ট আর্মির লক্ষণীয় পার্থক্য সম্বন্ধে সুমিত সরকার লিখেছেন, এঁরা নূতন ধ্যানধারণার প্রতি উন্মুখ ছিলেন, বিশেষ করে ভগৎ সিংহ। আগের পর্বের বিপ্লববাদীদের প্রবল হিন্দুধর্ম-আসক্তির বিপরীতে ভগৎ সিংহের এই 'লড়াকু নিরীশ্বরবাদ' খুবই উল্লেখযোগ্য বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।[৮]

১৯২৮ সালে লাহোরে ভগৎ-এর নেতৃত্বে সাইমন কমিশন-এর বিরুদ্ধে 'নওজোয়ান সভা'র বিরাট মিছিল বেরোল। মিছিলের পুরোভাগে লালা লাজপৎ রায়। ব্রিটিশ অফিসার সন্ডার্স-এর লাঠিতে আহত হয়ে ১৭ নভেম্বর মৃত্যু হল লালাজির। শোকে অপমানে ক্ষোভে বিমূঢ় দেশবাসী। ১০ ডিসেম্বর এইচ এস আর এ-র বৈঠকে এই আক্রমণের বদ্‌লা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হল। ১৭ ডিসেম্বর ভগৎ ও রাজগুরুর গুলিতে নিহত হল সন্ডার্স। বৈপ্লবিক উল্লাসের বান ডেকে গেল সারা

> আমার এইসব বন্ধুর মতে দিল্লীর বোমার মামলা আর লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালীন আমি যে-অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছি, তারই ফলে সম্ভবত আমার মাথা গরম হয়ে গেছে। বেশ, দেখা যাক এই অভিযোগের কোনো সত্য ভিত্তি আছে কিনা।

হঠাৎ করে মাথা গরম হয়ে গিয়ে তিনি ঈশ্বরবিশ্বাস ত্যাগ করেন, এই কথা সম্পূর্ণ মিথ্যে বলে জানান তিনি। কৈশোরের ঈশ্বরবিশ্বাস কীভাবে যৌবনের অনীশ্বরবাদে পরিণত হল তার পর্ববিভক্ত ইতিহাস বিবৃত করেন।

> আমি যে নিরীশ্বর হয়েছি তা কিন্তু খুব সম্প্রতি নয়। আমার এই বন্ধুরা হয়তো জানেনও না যে, আমি যখন এক অখ্যাত অজ্ঞাত যুবক মাত্র, তখন থেকেই আমি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয়ে উঠি। একজন কলেজ-ছাত্রের পক্ষে নিশ্চয়ই কোনোরকম অস্বাভাবিক গর্ব বশত নিরীশ্বরবাদী হওয়া সম্ভব নয়। কোনো কোনো অধ্যাপক আমাকে পছন্দ কবলেও আমি কখনও খুব খাটিয়ে পড়ুয়া ছাত্র ছিলাম না। আত্মাভিমানের মতো কোনো মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রশ্নই আমাব ক্ষেত্রে ওঠেনি। ববং আমি ছিলাম খুবই মুখচোরা প্রকৃতির ছেলে। ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাব বেশ দুশ্চিন্তাই ছিল। সেসময়ে অবশ্য আমি খুব নিখাদ নিবীশ্ববপন্থী ছিলাম না।

ভগতের ওপর কী ধরনের ধর্মীয় প্রভাব পড়েছিল তা বুঝতে গেলে আর্য সমাজ সম্বন্ধে দু-একটি কথা জানা প্রয়োজন। দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩) স্থাপিত আর্য সমাজের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সুমিত সরকার লিখেছেন: 'দয়ানন্দের বার্তা সম্ভবত তার দ্ব্যর্থকতার কারণেই এত বেশি সাফল্য অর্জন করতে পেরেছিল। একদিকে তা নানাবিধ প্রচলিত হিন্দু আচার-আচরণের তীব্র সমালোচনা করত (মূর্তিপূজা ও বহু-ঈশ্বরবাদ, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ এবং বিদেশযাত্রার ওপর নিষেধাজ্ঞা, ব্রাহ্মণ প্রাধান্য, নিছক জন্মসূত্রে নির্ধারিত জাতিভেদ)। আবার, একই সঙ্গে অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রচার করত যে খ্রিস্টধর্ম, ইসলাম বা শিখধর্ম প্রমুখ সমস্ত ধর্মের তুলনাতেই বেদের চির-অভ্রান্ততার ওপর স্থাপিত শুদ্ধিকৃত হিন্দুধর্ম শ্রেষ্ঠ।'[১১] এহেন এক মতবাদে বিশ্বাসী পিতামহের কাছে মানুষ হয়েছিল শিশু ভগৎ।

> আমার ঠাকুরদা, যাঁর প্রভাবে আমি বড়ো হয়েছিলাম, তিনি তো কট্টর আর্যসমাজী। একজন আর্যসমাজী আর যাই হোন, নিরীশ্বরবাদী তো নন।

১৮৯৩ সালে মাংসাহার ও ইংরেজি-শিক্ষার প্রশ্নে আর্যসমাজ কট্টরপন্থী ও উদারপন্থী দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। কট্টরপন্থীরা স্থাপন করেন গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থা। আর হংস রাজ এবং লালা লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে উদারপন্থী গোষ্ঠীটি

স্থাপন করেন 'দয়ানন্দ অ্যাংগ্লো-বেদিক' (সংক্ষেপে ডি এ ভি) বিদ্যালয়-মালা। প্রাথমিক শিক্ষার পর লাহোরের ডি এ ভি স্কুলে ভর্তি হন ভগৎ।—

> সেখানে পাক্কা একটি বছর বোর্ডিংয়ে কাটাই। সেখানে সকালে বিকেলে প্রার্থনা তো করতামই, উপবন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতাম। এর পর আমি আবার বাবার সঙ্গে থাকতে লাগলাম। তিনি সে সময় পুরোপুরি ধার্মিক ছিলেন। তবে কট্টরপন্থী ধার্মিকদের সাপেক্ষে তিনি উদারপন্থীই ছিলেন। তাঁরই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমি দেশেব জন্য প্রাণ সমর্পণ করার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হই। কিন্তু তিনি আদৌ নিরীশ্বরবাদী নন। তিনি গভীরভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী। তিনি আমাকে প্রতিদিন প্রার্থনা করার জন্য উৎসাহ দিতেন। তো, এইভাবে আমি বড়ো হয়ে উঠি।

সুতরাং তাঁর নিরীশ্বর হয়ে ওঠার পেছনে পারিবারিক কোনো প্রভাব ছিল না। এবার দেখা যাক, রাজনীতির জীবনে কী ঘটল—

> অসহযোগ আন্দোলনেব সময় আমি ন্যাশনাল কলেজে পড়তাম। সেই সময়েই আমি প্রথম খোলা মনে সব রকম ধর্মীয় সমস্যা নিয়ে, এমনকি ঈশ্ববকে নিয়ে ভাবতে, আলোচনা ও সমালোচনা করতে আবম্ভ কবি। তখনও কিন্তু আমি গভীবভাবে ঈশ্ববিশ্বাসী। ততদিনে আমি আ-কাটা লম্বা চুল বাখতে শুরু করেছি, অথচ শিখ ধর্মেব, বা কোনো ধর্মেবই, পৌবাণিক কাহিনী আব তত্ত্বগুলোকে কিছুতে সত্য বলে মানতে পাবিনি। এদিকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে তখনও আমার পূর্ণ বিশ্বাস।

চৌরিচৌরার ঘটনার পর আরো অনেকেরই মতো গান্ধি-নেতৃত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি বিপ্লবী দলে যোগ দিলেন। সেখানে নিরীশ্বরবাদ নিয়ে তাঁর কী অভিজ্ঞতা হল?—

> প্রথম যে-নেতার সংস্পর্শে আমি এলাম, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় না থাকলেও তিনি সে অস্তিত্ব অস্বীকার করার মতো সাহসী ছিলেন না। আমার নিরন্তর প্রশ্নের উত্তরে তিনি কেবলই বলতেন, 'যখন তোমার মন চাইবে, তখন প্রার্থনা কোরো।'

এই প্রথম নেতা কে, তা বলেননি ভগৎ, কিন্তু মনে হয় ইনি জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার। কেননা লাহোরের ন্যাশনাল কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক এই জাতীয়তাবাদী, নির্ভীকচিত্ত মানুষটিই ভগতের জীবনে রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু। ইনিই ভগৎকে নিয়ে যান বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যালের কাছে।

কাকোরি মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত 'কমরেড' শচীন্দ্রনাথ সান্যাল তাঁর 'দ্বিতীয় নেতা।' এঁর সম্পর্কে ভগৎ লিখছেন:

> তিনি ছিলেন গভীরভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী।... 'বন্দী জীবন' তাঁর একমাত্র ও বিখ্যাত বই। এতে পাতায় পাতায় ঈশ্বরের মহত্ত্ব প্রবলভাবে কীর্তিত হয়েছে। এই অপূর্ব বইটির দ্বিতীয় অংশের শেষ পৃষ্ঠায় রয়েছে বৈদান্তিক আধ্যাত্মিক রহস্যবাদ। খুব সচেতনভাবেই তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশে ভক্তি নিবেদন করেছেন।

শুধু শচীন্দ্রনাথই নন, কাকোরি মামলার বিখ্যাত শহিদরা প্রায় সকলেই গভীরভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন। ভগৎ এক এক করে লিখছেন:

> কাকোরির বিখ্যাত চার শহিদের প্রত্যেকেই তাঁদের শেষ দিনগুলি প্রার্থনা করে কাটিয়েছেন। রামপ্রসাদ বিসমিল ছিলেন কট্টর আর্যসমাজী। রাজেন লাহিড়ী সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজম নিয়ে অত পড়াশোনা করলে কী হবে, উপনিষদ আর গীতার মন্ত্র আবৃত্তির আকূতি সামলাতে পারতেন না।

একমাত্র একজনের কথা তিনি বলেছেন

> যিনি কখনো প্রার্থনা করতেন না। তিনি বলতেন, 'মানুষের দুর্বলতা থেকেই, জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থেকেই আধ্যাত্মিক দর্শনের জন্ম।' এখন তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে জেল খাটছেন। কিন্তু এমনকি তিনিও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করার সাহস দেখাতে পারেন নি।

কে এই বিপ্লবী, তা অবশ্য জানাননি ভগৎ। এই সময় থেকে তাঁর চিন্তাজগতে এক নতুন পর্বের সূচনা ঘটল। কাকোরি বিপর্যয়ের পর পার্টিকে নতুন করে গড়ার ভার পড়ল ভগতের ওপর। চারদিকে তখন শুধু হতাশা। নিজেদের কমরেডরাই, এমনকি নেতারাও তাঁর বিপুল উৎসাহ নিয়ে ব্যঙ্গ করতেন। এতদিনকার রোম্যান্টিক বিপ্লববাদী ভগৎ সিংহ বুঝলেন, বিপ্লব কোনো ভোজসভা নয়, সূক্ষ্ম সূচিশিল্পও নয়, 'বিপ্লব বলতে আমরা বুঝি এমন একটি সমাজব্যবস্থা যা ভঙ্গুর হবে না, যেখানে শোষিত জনগণের প্রভুত্ব স্বীকৃত হবে।'[১২] তার জন্য সবার আগে দরকার হয় বাস্তবতাকে বোঝা, চিন্তায় নমনীয়তা আনা। আর তার জন্য দরকার অধ্যয়ন।—

> আমার মনের আনাচে কানাচে তখন একটাই শব্দ অনুরণিত হতে লাগল— "অধ্যয়ন"। প্রতিপক্ষের যুক্তিকে তুলোধোনা করতে হলে অধ্যয়ন করে নিজেকে তৈরি করতে হবে। নিজের বিশ্বাসকে যুক্তিযুক্ত বলে প্রতিষ্ঠা করতে হলে অধ্যয়নের অস্ত্রে নিজেকে সজ্জিত করতে হবে। আমি পড়তে আরম্ভ করলাম।

রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রক্রিয়াপদ্ধতি, সহিংস পন্থা আর অহিংস গণ-আন্দোলনের সম্পর্ক, এ সব বিষয়ে তাঁর রোম্যান্টিক ধারণা কেটে গিয়ে আস্তে আস্তে বাস্তবের সঙ্গে নিবিড় যোগ তৈরি হল। আর সেই একই প্রক্রিয়ায় তাঁর মনে কঠিন দার্শনিক প্রশ্ন জাগল ঈশ্বরবাদ নিয়ে। কীভাবে তার মোকাবিলা করলেন তিনি?—

> যেহেতু তখন বাস্তব কর্মক্ষেত্রে বিশেষ কিছু করাব ছিল না, তাই আমি বিশ্ববিপ্লবের বিভিন্ন ভাবধারা নিয়ে পড়াশোনা কবার সুযোগ পেলাম। পড়লাম নৈরাজ্যবাদী নেতা বাকুনিন-এর বচনা। কমিউনিজমের জনক মার্ক্সেব লেখা পড়লাম। আব পডলাম লেনিন, ট্রটস্কি ও অন্যান্যদের লেখা, যাঁরা নিজের দেশে সফলভাবে বিপ্লব ঘটিয়েছেন। এঁরা সকলেই নিরীশ্বরবাদী। বাকুনিন-এর 'ঈশ্বর ও রাষ্ট্র' খানিকটা খাপছাড়া হলেও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। এরপর আমার হাতে এল নিরালম্ব স্বামীর [= যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]লেখা 'কমন সেন্স' নামক একটি বই। এ কেবল এক ধরনেব রহস্যবাদী নিরীশ্বরবাদ।

একদিকে রাজনৈতিক বিপ্লব, আর তারই সঙ্গে নিরীশ্বরবাদের দার্শনিক ভিত্তিসন্ধানের জন্য তখন পথ হাতড়াচ্ছেন তিনি।

> ১৯২৬-এর শেষাশেষি আমাব মনে স্থির প্রত্যয় জাগল যে বিশ্বজগতের স্রষ্টা, বিধাতা এবং নিয়ন্তা কোনো সর্বশক্তিমান চরম সত্তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। আমি এই অবিশ্বাসেব কথা সবাইকে বলতে লাগলাম। বন্ধুদেব সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম। আমি হয়ে উঠলাম একজন সুপবিচিত নিবীশ্বরবাদী।

১৯২৭ সালের মে মাসে ভগৎ লাহোরে গ্রেফতার হলেন। জেলে সি আই ডি-র ইংরেজ কর্তারা অতি মধুরভাষে তাঁকে রাজসাক্ষী হয়ে আরাম আয়েস করার এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে মন হালকা করার পরামর্শ দিলেন। প্রথম প্রস্তাবটা তিনি হেসেই উড়িয়ে দিলেন। দ্বিতীয়টা নিয়ে তাঁর মনে হল, নিজেকে যাচাই করে নেওয়ার এটাই তো পথ।—

> আমি একজন নিরীশ্বরবাদী। জীবনের শান্তিময় উপভোগের দিনগুলিতে নিজেকে নিরীশ্বরবাদী বলে জাহির করাটা সহজ। কিন্তু এই কঠিন দিনে কি আমি আমার ঐসব নীতি আঁকড়ে থাকতে পারব? এই নিয়ে প্রভূত ভাবনাচিন্তার পর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা, তাঁর কাছে প্রার্থনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। না, আমি আদৌ প্রার্থনা করিনি। ওটাই ছিল আসল পরীক্ষা। ঐ পরীক্ষায় আমি সফল হয়েছিলাম। কতকগুলি নীতিকে বিসর্জন দিয়ে নিজের জীবন রক্ষা করবার আকাঙ্ক্ষা আমার মনে এক মুহূর্তের জন্যও জাগেনি। কাজেই আমি একজন একনিষ্ঠ অবিশ্বাসীই রয়ে গেলাম। ঐ পরীক্ষায় পাশ করাটা খুব সহজ কাজ ছিল না।

ঈশ্বরের নাম নিয়ে, গীতা পাঠ করে অনেক বিপ্লবী মনোবল অটুট রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু ভগৎ সিংহ সেই বিপ্লবী যিনি ঈশ্বরের নাম না নিয়েই মনোবল অটুট রেখেছিলেন। অর্থাৎ তিনি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে

মনোবল অটুট রাখার সঙ্গে ঈশ্বরবিশ্বাসের কোনো সম্পর্ক নেই, মানুষ তার আদর্শের জোরেই মনোবল অটুট রাখতে পারে। জীবনমৃত্যু তাঁর পায়ের ভৃত্য বটে, কিন্তু চিত্ত মোটেই 'ভাবনাহীন' নয়। বরং এ ব্যাপারে তাঁর ভাবনা অত্যন্ত স্পষ্ট, সংযত, বাস্তবসম্মত ও যুক্তিসিদ্ধ। লিখছেন তিনি—

> বিচারের রায় কী হবে সে তো সবাই জানে। আর এক সপ্তাহের মধ্যেই রায় বেরোবে। একটা আদর্শের জন্য আমি প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছি, কেবল এইটুকু ছাড়া আর আমার কী সান্ত্বনা আছে? ঈশ্বরভক্ত একজন হিন্দু পরজন্মে রাজা হয়ে জন্মাবার আশায় মরতে পারে। একজন মুসলমান কিংবা একজন খ্রিস্টান তার ত্যাগ ও দুঃখদুর্দশার বিনিময়ে বেহেস্তে গিয়ে হরেকরকম ফূর্তি আর ভোগবিলাসের স্বপ্ন দেখতে পারে। কিন্তু আমি কীসের আশায় প্রাণ দিচ্ছি? আমি তো জানি, যে-মুহূর্তে আমার গলায় ফাঁসির দড়িটা চেপে বসবে আর পায়ের তলা থেকে পাটাতনটা সরে যাবে, তখনই আসবে চরম ক্ষণ। আমি, কিংবা অধিবিদ্যক দর্শনের ভাষায় যাকে বলে আমার আত্মা, সেইখানেই শেষ হয়ে যাব। কিছুই বাকি থাকবে না।

নৈতিক দিক থেকে একজন নিরীশ্বরবাদী যে একজন ঈশ্বরবাদীর চেয়ে কত শ্রেষ্ঠ, তার নিখাদ যুক্তিসম্মত, অথচ হৃদয়স্পর্শী বিবৃতি দেন ভগৎ—

> কোনোরকম স্বার্থের তাড়না, কিংবা ইহলোকে বা পরলোকে কোনোরকম পুরস্কারের প্রত্যাশা না রেখে, সম্পূর্ণ নিষ্কাম মনে আমি দেশের স্বাধীনতার জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করেছি। কারণ এ ছাড়া আর কিছু আমার পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। এই মনোভাব নিয়ে যেদিন অনেক নরনারী এগিয়ে আসবে, যারা মানুষের সেবা আর নিপীড়িত মানবের মুক্তির জন্য নিজেদের উৎসর্গ করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না, সেই দিন মুক্তিযুগের সূচনা ঘটবে।

এইবার, এতক্ষণ পরে ফেটে বেরোয় তাঁর ক্ষোভ।—

> এই সমুচ্চ আদর্শ নিয়ে গর্বকে কি আত্মাভিমান বলে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হবে? কার সাহস আছে ঐ ঘৃণ্য শব্দটা উচ্চারণ করার? আমি বলব, হয় সে নির্বোধ, না হয় সে শয়তান।

নিরীশ্বরতার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

কেন ভগৎ নিরীশ্বরবাদী, কেন তিনি পৃথিবীর যাবতীয় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরোধী, তার তাত্ত্বিক কারণগুলি এবার একে একে বর্ণনা করেন তিনি। প্রথমত, ঈশ্বর নামক কল্পনাটির পেছনে ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের অজ্ঞতা।

> প্রত্যক্ষ প্রমাণের নিদারুণ ঘাটতি ছিল তাঁদের। কাজেই তাঁরা প্রত্যেকেই যে যার খুশি মতো সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করেছিলেন। সেই কারণেই আমরা দেখতে পাই, বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে মূলগত স্তরে ব্যাপক প্রভেদ রয়েছে, যেগুলি কখনও কখনও অত্যন্ত বৈরিতামূলক ও সংঘর্ষমূলক রূপ ধারণ করে। প্রভেদ কেবল যে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যেই আছে তা নয়, উভয় গোলার্ধেরই বিভিন্ন মতের মধ্যে প্রচুর বিরোধ রয়েছে। প্রাচ্য ধর্মমতগুলির মধ্যে মুসলিম ধর্মের সঙ্গে হিন্দু ধর্মবিশ্বাস একেবারেই খাপ খায় না। কেবল ভারতের কথাই যদি ধরি, বৌদ্ধ আর জৈন ধর্ম অনেকাংশেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের চেয়ে আলাদা। এদিকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে আবার আর্যসমাজীদের সঙ্গে সনাতন ধর্মের বিরোধ রয়েছে। প্রাচীন চিন্তাবিদদের মধ্যে চার্বাক আবার একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারার প্রবক্তা। তিনি প্রাচীন কালেব ঈশ্বরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। এইসব মতের প্রত্যেকটিই মূল প্রশ্নে পরস্পরের চেয়ে আলাদা, অথচ প্রত্যেকেই বলেন তিনি অভ্রান্ত।

এখান থেকে ভগৎ এই যুক্তি দেন যে, প্রাচীনকালের জ্ঞানীগুণীদের মতকে যদি বিনা বিচারে শাশ্বত ও অভ্রান্ত বলে গণ্য করা হয়, তা হলে অজ্ঞতা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। সে ক্ষেত্রে মানুষের অগ্রগতির ধারা থেমে যাবে। তাঁর আক্ষেপ, মানসিক জড়তাবশত আমরা ঠিক সেই সর্বনাশা কাজটিই করে চলি। অপর দিকে—

> যে-মানুষ প্রগতিপন্থী, তাঁকে অবশ্যই প্রাচীন বিশ্বাসের প্রত্যেকটি ধারাকে সমালোচনা ও অবিশ্বাস করতে হবে, সেগুলোকে চ্যালেন্জ জানাতে হবে। প্রচলিত বিশ্বাসের প্রত্যেকটি ধারাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যুক্তির আলোকে বিচার করতে হবে। গভীরভাবে যুক্তিবিচার করার পর যদি কেউ কোনো তত্ত্ব বা দর্শনে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্ত হন, সেটা নিশ্চয়ই স্বাগত। তাঁর যুক্তিবিচার ত্রুটিযুক্ত বা ভুল হতে পারে, বিপথগামী হতে পারে, এমনকি কখনও কখনও হেত্বাভাস-দুষ্টও হতে পারে। কিন্তু যুক্তিবিচার যেহেতু তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা, তাই তিনি সে ভুল শুধরে নিতে পারেন। কিন্তু নিছক বিশ্বাস, অন্ধবিশ্বাস অতি মারাত্মক: তা বুদ্ধিকে ভোঁতা করে দেয়, মানুষকে প্রতিক্রিয়াশীল করে তোলে।

প্রাচীন দর্শন ও ধর্মচিন্তার কোনো কোনো অঙ্গ হয়তো নতুন যুগের দর্শনের কাজে লাগতে পারে, এ কথা মানেন তিনি। সেই সঙ্গে স্বীকার করেন, প্রাচীনের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে থেকে ঠিক কোন জিনিসগুলি নতুন ইমারত তৈরির কাজে লাগতে পারে, সে বিষয়ে যথেষ্ট অধ্যয়ন করার সুযোগ তিনি পাননি। মনে রাখতে হবে, এই কথাগুলি বলছেন একজন তেইশ বছরের যুবক, যিনি জেনে গেছেন, আর কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর ফাঁসির রায় বেরোতে চলেছে।

একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও আমাদের মনে পড়ে যায় অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০-১৮৮৬) কথা। তিনি পুরনো দর্শনের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে থেকে আস্ত ইটগুলো খুঁজে বার করে নতুন ইমারত গড়ার কাজ শুরু করেছিলেন।

চেঙ্গিজ় খাঁ বা নীরোর উদাহরণ দিয়ে ঈশ্বরবাদীদের উদ্দেশে ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন ছুড়ে দেন ভগৎ, সেগুলো খুব নতুন নয়, অন্তত যাঁরা বিদ্যাসাগর বা অক্ষয় দত্তের লেখা পড়েছেন তাঁদের কাছে। বরং নৈতিকতা বা শুভ-অশুভের প্রশ্নে হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিস্টপন্থীদের উত্তর কত রকমের হতে পারে, সে বিষয়ে তাঁর আলোচনাটি কৌতূহলজনক। তাঁর প্রশ্ন, চেঙ্গিজ় খাঁ বা নীরোর মতো নিষ্ঠুর মানুষকে সর্বশক্তিমান ও মঙ্গলময় ঈশ্বর আদৌ সৃষ্টি করেছিলেন কেন?—

> মজা দেখবার জন্যে? তাহলে তাঁর সঙ্গে নীরোর তফাৎ কোথায়?

মুসলমান ও খ্রিস্টানদের উদ্দেশে তিনি বলছেন—

> ঐ প্রশ্নের কী উত্তর দেবেন আপনারা? আপনারা তো পূর্বজন্মে বিশ্বাস করেন না। হিন্দুদের মতো আপনারা তো এ যুক্তি দিতে পারেন না যে, আগের জন্মে পাপ করেছিল বলেই এ জন্মে এইসব নিরীহ লোকগুলো কষ্ট পাচ্ছে। আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন: কেন সর্বশক্তিমানকে ছ-দিন পরিশ্রম করে কথার সাহায্যে বিশ্ব সৃষ্টি করতে হল, কেন প্রতিদিন বলতে হল যে সব ঠিক আছে? আজকে তাঁকে ডেকে পাঠান। অতীতের ইতিহাস দেখান তাঁকে। বর্তমান সম্বন্ধে অবহিত করুন। দেখা যাক, এবার তিনি 'সব ঠিক আছে' বলতে পারেন কিনা।

হিন্দুদের কর্মফল তত্ত্ব আর পুনর্জন্মবাদের উল্লেখ করে তিনি বলেন, মানুষ যখন পাপ বা অপরাধ করে, ঠিক সেই সময় তাকে নিবৃত্ত করেন না কেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর? তিনি তো ইচ্ছে করলেই সেটা করতে পারেন, তিনি তো সর্বশক্তিমান। সেটা না করে একজন্মে পাপকার্য করিয়ে পরের জন্মে সাজা দেওয়াটা কী ধরনের নৈতিকতা? কেনই বা তিনি পুঁজিপতিদের মনে শোষণ-বিরোধী ভাব জাগান না? কেন গোটা সমাজকে পুঁজিতন্ত্রের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার প্রেরণা জাগান না? উত্তর একটাই: তিনি সর্বশক্তিমান নন। অর্থাৎ ঈশ্বর একটা তৈরি-করা ধারণা, যার সাহায্যে সমাজের বিশেষাধিকারভোগীরা নিজেদের শাসন কায়েমি করে রাখে, শাসিতদের মনকে অধিকার করে রাখে। সেই সঙ্গে তিনি স্বীকার করেন যে, 'দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে' ঈশ্বরের ধারণাটি মানুষকে সান্ত্বনা ও শান্তি দেয়।

'কেন আমি নাস্তিক'-এর শেষ অনুচ্ছেদটি মর্মস্পর্শী।—

> এক বন্ধু আমাকে প্রার্থনা করতে বলেন। আমি বললাম, আমি যে নিরীশ্বরবাদী। তখন তিনি বললেন, 'দেখো, শেষ দিনগুলোতে তোমার মনে ঠিক ঈশ্বরবিশ্বাস জেগে উঠবে।' আমি বলেছিলাম, 'আজ্ঞে না। বিশ্বাস জেগে উঠবে না। উঠলে সেটা হবে আমার অধঃপতন আর মনোবিকারের পরিচয়। স্বার্থ-চালিত কোনো

> উদ্দেশ্যে আমি কখনোই প্রার্থনা করব না।' পাঠকরা, বন্ধুরা, এর নাম কি আত্মাভিমান? যদি তাই হয় তাহলে আমি একে সমর্থন করি।

ভগৎ মৃত্যুর আগে প্রার্থনা করেন নি।

উপসংহার

২৩ মার্চ, ১৯৩১, সন্ধে সাতটা। সেল থেকে বেরিয়ে এলেন ভগৎ সিংহ, শুকদেব আর রাজগুরু। স্লোগান দিলেন— ইনকিলাব জ়িন্দাবাদ। জেলের সমস্ত কয়েদি সমস্বরে প্রত্যুত্তর দিল: ইনকিলাব জ়িন্দাবাদ। ফাঁসির আগে মুখ ঢাকবার জন্য মুখোশ দেওয়া হল ভগৎকে। মুখোশটা ফেলে দিলেন তিনি। শিরদাঁড়া সোজা রেখে নিজের হাতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরে নিলেন। সকলে মাথা নিচু করল লজ্জায়।

সে রাত্রেই চুপিসাড়ে তিন বিপ্লবীর মরদেহ শতদ্রুর পাড়ে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে ফেলে সাম্রাজ্যবাদীরা। তাঁদের অর্ধদগ্ধ দেহ ভাসিয়ে দেয় শতদ্রুর জলে। কাছাকাছি গ্রামের মানুষ জানতে পেরে সকলকে খবর দেয়।

এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে

অল্প বয়সে একটি বিখ্যাত দার্শনিক বচনে মোক্ষম ধাক্কা খেয়েছিলাম: Freedom is the recognition of necessity.
ইংরেজি এতই কম জানি যে এখানে নেসেসিটি শব্দের বিশেষ অর্থ বুঝতে নাটাঝামটা খেয়ে গিয়েছিলাম। তারপর মুশকিল-আসান একজন পণ্ডিত ব্যাখ্যা করে দিলেন: এখানে নেসেসিটি শব্দের অর্থ অবশ্যম্ভাবিতা। অর্থাৎ যা পূর্বকারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং অবশ্যম্ভাবী। যাঁরা ভালো সংস্কৃত জানেন তাঁরা অনেকে অবশ্যম্ভব বলে এর বাংলা করেন।

তা হলে ওই উক্তির অর্থ কী দাঁড়াল? কার্য-কারণ সম্পর্ক অনুযায়ী যা অবশ্যম্ভাবী, অর্থাৎ কী করলে কী ঘটবে তা ঠিকঠাক বুঝতে পারার নামই হল স্বাধীনতা। খুব সরল হল কি? পণ্ডিত মানুষটি তখন আরও সরল করে বুঝিয়েছিলেন: ধরো তুমি রাস্তা পার হচ্ছ। প্রচুর গাড়িঘোড়া। কিছুতেই পার হতে পারছ না, ঘাড়ের উপর গাড়ি এসে পড়ছে, আর একটু হলেই চাপা পড়ছিলে। তার মানে তুমি স্বাধীন নও, তোমার রাস্তা পার হওয়ার ইচ্ছা অ-চরিতার্থ থেকে যাচ্ছে, তুমি যা চাইছ, কার্যক্ষেত্রে তার বিপরীত ফল

পাওয়া যাচ্ছে। এমন সময় দেখলে ট্রাফিক সিগন্যাল লাল হয়ে গেল, গাড়িঘোড়া দাঁড়িয়ে পড়ল। তখন তুমি জেব্রা ক্রসিং দিয়ে দিব্যি অনায়াসে রাস্তা পেরিয়ে গেলে। অর্থাৎ রাস্তা পার হওয়ার নিয়ম তুমি আগে জানতে না, যেমন তেমনভাবে পার হওয়ার চেষ্টা করছিলে, তাই তোমার চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছিল, এমনকী তুমি প্রাণও হারাতে পারতে। তুমি অন্যের, অর্থাৎ গাড়িচালকদের ইচ্ছার ক্রীড়নক হয়েছিলে। কিন্তু ধরা যাক, তুমি জানো যে প্রতি তিন মিনিট অন্তর সিগন্যাল লাল হয়ে যাবে, সব গাড়ি তখন অবশ্যই থেমে যাবে। তখন তুমি তোমার ইচ্ছা চরিতার্থ করার ব্যাপারে স্বাধীন, কেননা রাস্তা পেরোনোর নিয়মটা তোমার জানা হয়ে গেছে, তুমি সেটাকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পারছ।

ট্রাফিক সিগনালের নিয়মটা অবশ্য মানুষই ঠিক করে। দেশে দেশে, কালে কালে, জমানায় জমানায় সে নিয়ম আলাদা হতে পারে, হয়ও। কিন্তু প্রকৃতির মিয়ম তো মানুষ ঠিক করেনি। প্রকৃতি চলে তার নিজস্ব অমোঘ নিয়মে। তার বিধিগুলো বদলায় না, তারা অখণ্ডনীয়। তাই প্রকৃতির নিয়মমতে কোন কারণে কোন কার্য ঘটে, সেটা যত বেশি করে জানা যাবে, ততই মানুষ স্বাধীনতার দিকে এগোবে। ততই সে স্বাধীনভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সঠিক প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে কার্যক্ষেত্রে বাঞ্ছিত ফল লাভ করবে। প্রকৃতির সেই নিয়মগুলো বিজ্ঞান জানায়। মানুষেব স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে তাই বিজ্ঞানের সম্পর্ক এত নিবিড়।

রাজশেখর বসু: নিয়তির 'অপবৈজ্ঞানিক' ব্যাখ্যা

কিন্তু যা পূর্বকারণ-নিয়ন্ত্রিত এবং অবশ্যম্ভাবী, তাকেই তো নিয়তি বলে। অদৃষ্ট কথাটাও তো একই অর্থে চালু। সৌরভ গাঙ্গুলির চান্স পাওয়া না-পাওয়া, ঐশ্বর্য রাইয়ের বিয়ে হওয়া না-হওয়া, সবই তো আমাদের মতে অদৃষ্ট, নিয়তি। সবই তো গ্রহতারকার চক্রান্তে পূর্বনির্ধারিত। তা হলে এর মধ্যে বিজ্ঞান আসছে কোত্থেকে?

নিজস্ব অননুকরণীয় ঢঙে রাজশেখর বসু এই সমস্যার ওপর আলো ফেলেছিলেন ১৯২৯ সালে। প্রকৃতির বিধিগুলি যে অখণ্ডনীয়, সেই কথা ব্যাখ্যা করার পর তিনি বলেছেন:

> অদৃষ্ট বা নিয়তিবাদ... পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের অবদান নহে, নিতান্তই ভারতীয় বস্তু। আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত ইহাব বিবাদ নাই, কিন্তু সাধাবণ লোকে যে অদৃষ্টবাদের আশ্রয় লয় তাহা অপবিজ্ঞান মাত্র।[১]

এই শেষ বাক্যটি বেশ ভাবায়, অদৃষ্টবাদ বা নিয়তিবাদের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের বিবাদ নেই, এ কথা প্রথম পাঠে রীতিমত চমকে দেয়। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখা মাত্র

পরিষ্কার হয়ে যায়, পূর্বোক্ত 'নেসেসিটি' আর 'নিয়তিবাদ বা অদৃষ্টবাদ' আসলে একই জিনিস— কিন্তু আদি অর্থে, প্রচলিত অর্থে নয়। বসু মহাশয়ের ব্যাখ্যা:

> বিজ্ঞানও স্বীকার করে— এই জগৎ নিয়তির রাজ্য, সমস্ত ঘটনা কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত অখণ্ডনীয় রূপে নিয়ন্ত্রিত। অভিজ্ঞ ব্যক্তি কোনও বিষয়ের ভবিষ্যদুক্তি করিতে পারেন, যথা অমুক দিন চন্দ্রগ্রহণ হইবে, অমুক লোকের শীঘ্র জেল হইবে। প্রকৃতির নিয়ম বা নিয়তির কিয়দংশ তাঁহার জানা আছে বলিয়াই পারেন।

প্রাকৃতিক নিয়মের এই অখণ্ডনীয়তাকেই, তার অবশ্যম্ভাবিতাকেই বলে নিয়তি: 'নিয়তির অর্থ— সমস্ত ঘটনার অখণ্ডনীয় সম্বন্ধ বা আনুপূর্ব।' অদৃষ্ট কিন্তু আলাদা জিনিস: 'অদৃষ্টের অর্থ— অনির্ণেয় ও অসাধ্য ঘটনাসমূহ।' এই শব্দ দুটি লোকব্যবহারে কীভাবে একেবারে বিপরীতে পরিণত হয়েছে তার উদাহরণ দেন রাজশেখর:

> জীবনযাত্রা যখন নিরুদ্‌বেগে চলিয়া যায় তখন কারণ জানিবার ঔৎসুক্য থাকে না। কিন্তু যদি একটা বিপদ ঘটে, কিংবা যদি কোন পরিচিত হঠাৎ বড়লোক হয়, তখনই মনে কষ্টকর প্রশ্ন আসে— কেন এমন হইল। বিজ্ঞলোক ব্যাখ্যা করেন— বাপু, কেন হইল সেটা বুঝিলে না। সমস্তই অদৃষ্ট, কপাল, ভাগ্য, নিয়তি। অমুক লোকটি মরিল কেন, ইহার উত্তরে যদি বলা হয়— কলেরা, সর্পাঘাত, অনেক বয়স— তবে একটা কারণ বুঝা যায়। কিন্তু ইহা বলা বৃথা— মরণের অনির্ণেয়তা, বা অনিবার্যতাই মরিবার কারণ। অথচ 'অদৃষ্ট' বলিলে ইহাই বলা হয়। ইহাও বলা বৃথা— অমুক লোকটি ঘটনা পরম্পরার ফলে মরিয়াছে। অথচ 'নিয়তি' বলিলে ইহাই বলা হয়।[২]

কারা এইসব 'বিজ্ঞলোক'? খোঁজ নিলে হয়তো দেখা যাবে, তারাই যারা স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চায়; তারাই যাদের কোনো জাগতিক স্বার্থ এই স্থিতাবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। গরিব-গুর্বোদের কাছে, আমার-আপনার কাছেও, তাদের সাক্ষাৎ পরিচয় হয়তো শুধুই পুরোহিত কিংবা গণৎকার রূপে। কিন্তু তাঁরা তো সেই বহুতল জাগতিক স্বার্থ-সৌধের নেহাত দারোয়ান মাত্র; সেই সৌধের ভিত গড়া থাকে অনেক নিচে, চূড়া থাকে অনেক উঁচুতে। কোনো না কোনোভাবে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক শোষণের সঙ্গে সেই স্বার্থ জড়িত। সেই স্বার্থই ওইসব বিজ্ঞলোকের মারফত সাধারণ মানুষের বাস্তব সমস্যাগুলোকে কেন্দ্র করে তাদের মনে অজস্র ভয়, আতঙ্ক আর বিকৃত ধারণা রোপণ করে চলে। আর সেই উর্বর মাটিতে চলে অর্থনৈতিক শোষণের প্রায় নিরঙ্কুশ এক প্রক্রিয়া।

জ্যোতিষের সঙ্গে রত্নব্যবসায়ের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক তার সবচেয়ে সুপরিচিত উদাহরণ। অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও আরও অনেকের অক্লান্ত পরিশ্রমে সেই

সম্পর্কের কিছুটা আজ জনসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে জ্যোতিষ এবং রত্নব্যবসায়ের সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ, তার একটা নির্লজ্জ প্রমাণ মিলেছিল কিছুকাল আগে প্রচারিত অমিতাভ্ বচ্চনের একটি বিজ্ঞাপনে। তাতে দেখানো এবং বলা হল, এমন বিপুল জাগতিক সাফল্য অর্জন করার পরও শ্রীবচ্চন মূল্যবোধ হারাননি, 'ভারতীয়' সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা হারাননি। তার প্রমাণস্বরূপ দেখানো এবং বলা হল, মন্দিরে পূজাদানের পর চন্দনচর্চিত বচ্চন বিশাল এক গোমেদ রত্ন ধারণ করছেন, সস্ত্রীক। সুখী পরিবারের মেদহীন আদর্শ! 'ভারতীয়' ইমেজ, স্টার ইমেজ, হিন্দু ধর্ম, বিপুল পরিমাণ নানা রঙের টাকার 'সাফল্য', হিন্দি সিনেমার 'মহত্ত্ব', কঠিন রোগ থেকে মুক্ত সুস্থ শরীর, জ্যোতিষ আর রত্ন-ব্যবসায়— কতগুলো বড়ো বড়ো পাখি যে এক ঢিলে মারা পড়ল। কোটি কোটি অমিতাভ্ ফ্যান আহ্লাদে আটখানা হল।

কিছুকাল আগে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে সরকারি পয়সায় রাজস্থানের মন্দিরগুলোতে ১০১.২৬ কোটি টাকার পুজোপাঠ, যাগযজ্ঞ করিয়েছেন খরা-বন্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে। কোন মন্দিরের গর্ভে কত টাকা গেছে তার হিসেবটা এইরকম: নাথদোয়ারা (৩২ কোটি), খাটু শ্যামজি (২০), শ্রীত্রিপুরাসুন্দরী (৫), শ্রীগোগাজি গোগামেদি (১), শ্রীদ্বারকাধীশ (০.৯৪), সিদ্ধি বিনায়কজি (৯.৪৭)। ধর্মপ্রাণা বসুন্ধরা যেখানেই যান, মন্দির দর্শন করেন। যেমন, জনজাতি-প্রধান বাঁসওয়ারা জেলায় তিন বছরেরও কম সময়ে তিনি আঠেরো বার শ্রীত্রিপুরাসুন্দরী দুর্গামন্দির দর্শন করেছেন এবং পূজা ও যজ্ঞের আয়োজন করেছেন— বলা বাহুল্য, সরকারি পয়সায়। তাঁর যাতায়াত সুগম করার জন্য বিপুল অর্থব্যয়ে রাস্তার সৌন্দর্যসাধন করা হয়েছে, হেলিপ্যাড তৈরি হয়েছে, সুদৃশ্য ফোয়ারা বসানো হয়েছে। মজার এবং দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে, এই ধর্ম-রাজনীতি-কুসংস্কার যজ্ঞের আনুষঙ্গিক 'সুফল' ভোগ করছে যারা, তারা কিন্তু দু হাত তুলে এটাকে সমর্থন করবে। যেমন, প্রসাদ-বিক্রেতারা, ফুল-বিক্রেতারা। এমনকী সদ্য-স্থাপিত একটি ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা। এরা কিন্তু সাধারণ লোক, অনেকেই গরিব লোক। এরাই দুদিন পর পুজো করবে আর বলবে, সবই তো মা ত্রিপুরেশ্বরীর কৃপা। এরকমই অবশ্য হয়। বেশ্যাখানার সামনের চাটওয়ালা আর মদওয়ালারাও বলে, বেশ্যাখানার দৌলতেই তো করে খাচ্ছি।

রাজস্থানের ব্যাপারটা এতটাই মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে যে ভারত সরকারের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর-জেনারেল পর্যন্ত প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে ধর্মপরায়ণা বসুন্ধরার কাছে এর কৈফিয়ত চেয়েছেন। তিনি এই কৈফিয়ত দিয়েছেন যে যা হওয়ার তা তো হয়েই গিয়েছে, এখন ওই মন্দিরগুলোকে 'ধর্মীয় পর্যটন-কেন্দ্র' হিসেবে ব্যবহার করা হোক! হয়তো তাই হবে। অর্থাৎ বসুন্ধরা গাছের খেয়েছেন, এবার তলারও খাবেন।

এঁরাই হলেন রাজশেখর-কথিত ওইসব 'বিজ্ঞলোক'। এঁদেরই স্বার্থ পরিস্রাবিত হয়ে প্রকৃতির অখণ্ডনীয় নিয়মাবলিকে বিকৃত অর্থে নিয়তি বলে, অদৃষ্ট বলে প্রচার করে চলেছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, 'নিয়তিকে কে আটকাতে পারে' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলার পরমুহূর্তেই এঁরা সেই অমোঘ, অনিবার্য, পূর্বনিয়ন্ত্রিত নিয়তিকে বদলাবার জন্য মানুষকে রত্ন ধারণ করার কিংবা যাগযজ্ঞ করার প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন দেন! নিয়তিবাদ বা অদৃষ্টবাদের এই বিকৃত ধারণাকে রাজশেখর সুচিন্তিতভাবেই অপবিজ্ঞান বলে চিহ্নিত করেছেন। অপবিজ্ঞানের কারবারি এইসব বিজ্ঞলোকের দাপটেই—

> 'অদৃষ্ট' ও 'নিয়তি' শব্দ সাধারণের নিকট প্রকৃত অর্থ হারাইয়াছে এবং বিধাতার আসন পাইয়া সুখদুঃখের নিগূঢ় কারণ রূপে গণ্য হইতেছে।

নিয়তি আর অদৃষ্ট— এই দুটো আলাদা ধারণার প্রয়োজন হয়েছিল কেন, সে বিষয়েও তাঁর ব্যাখ্যা অত্যন্ত প্রাঞ্জল:

> কিসে কি হয় মানুষ অনেকটা জানে এবং সেই জ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা প্রয়োজন সাধন করে। কতকগুলি জাগতিক ব্যাপাব আমাদেব বোধ্য বা সাধ্য, কিন্তু অধিকাংশ অবোধ্য বা অসাধ্য। প্রথমোক্ত বিষযগুলি আমাদের 'দৃষ্ট' অর্থাৎ নির্ণেয়, শেষোক্ত বিষযগুলি 'অদৃষ্ট' অর্থাৎ অনির্ণেয। যাহা দৃষ্ট, তাহাতে আমাদের কিছু হাত আছে, যাহা অদৃষ্ট তাহাতে মোটেই হাত নাই।[১১]

সূর্যের অভ্যন্তরের তাপ-নিউক্লীয় বিক্রিয়ার ওপর আমাদের হাত নেই, তাই সেটা অদৃষ্ট; কিন্তু ইরাকের তৈলক্ষেত্রগুলোর ওপর আমাদের হাত আছে, তাই সেটা 'দৃষ্ট'।

অপবিজ্ঞান ও কুসংস্কার

অদৃষ্টবাদ আর নিয়তিবাদের এই বিকৃত ব্যাখ্যার অপমিশ্রণ আমাদের জীবনকে কীভাবে বিড়ম্বিত করে তুলেছে তার ভয়াবহ সব নিদর্শন আমরা প্রতিনিয়তই পেয়ে থাকি। বড়ো অর্থে এগুলোকে মানুষের স্বাধীনতাহীনতা বলেই গণ্য করা যেতে পারে। এই স্বাধীনতাহীনতার অনেক উদাহরণই আমাদের জানা। তার মধ্যে দেড়শো বছর আগেকার একটি চমকপ্রদ এবং মর্মান্তিক উদাহরণ দিই। বিখ্যাত ব্রাহ্ম স্বদেশি নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র (১৮৫২-১৯৩৬) জন্মেছিলেন ময়মনসিংহের বাঘিল গ্রামের সচ্ছল, শিক্ষিত এক তালুকদার পরিবারে। তাঁর বাল্যকালের স্মৃতিচারণ:

> কোথা হইতে কুসংস্কারের এক ঢেউ আসিল, বাড়ির স্ত্রীলোকেরা সর্বাগ্রে মনে করিলেন যে-ঘরে সন্তানের জন্ম হয় সে ঘর অশুচি হইয়া যায়। তাই... অন্তঃপুরের মধ্যে একখানি চালা প্রস্তুত হইত, তাহাতে একটি মাত্র দরজা থাকিত, তাহার মেঝে ও আঙ্গিনার মেঝে সমতল হইত।... দিনরাত সে ঘরে আগুন জ্বালাইয়া রাখা হইত। ধোঁওয়া বাহির হইবার কোন পথ ছিল না।

গ্রামেব মাইঠাল ও মুসলমানেরা ধাত্রীর কাজ করিত। তাহারা ধাত্রীব কাজ কিছুই জানিত না, কিন্তু গ্রামস্থ লোকেদের তাহাদের প্রতি খুব বিশ্বাস ছিল। তাহারা স্বভাবতই অপরিষ্কার; তাহাদেব গায়ে ময়লা জমিয়া থাকিত। সূতিকাগারে যাইবাব সময় সর্বাপেক্ষা মলিন বস্ত্র পরিয়া ঘরে ঢুকিত। বাঁশেব অপরিষ্কার চাঁচড় দিয়া নাড়ী কাটিত। বাড়ির যত ময়লা ছেঁড়া কাঁথা, বালিস ও চাটাই প্রসূতির শয্যার জন্য রাখিয়া দেওয়া হইত।'

এই সমস্ত তথাকথিত ধাত্রীদের অপরিচ্ছন্নতাই যেন এদের প্রতি 'গ্রামস্থ লোকেদের' বিশ্বাসকে আরও বাড়িয়ে তুলত। এই ভয়ানক কাণ্ডটির পিছনে কাজ করত কোনো বা কতিপয় বিজ্ঞজন প্রচারিত একটা বিশ্বাস— 'যে-ঘরে সন্তানের জন্ম হয় সে ঘর অশুচি হইয়া যায়।' মানুষের জন্ম নাকি একটা চরম অপবিত্র কাণ্ড। এই অন্ধবিশ্বাস প্রসূত কার্যের ফল কী হয়েছিল? কৃষ্ণকুমার লিখছেন:

এই অবস্থায় কয়েক বৎসবেব মধ্যে আমার তিনটি ভাই-ভগিনীর সূতিকাগারে মৃত্যু হয। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহাদের রঙ নীলবর্ণ হইয়াছিল, তাহাদের অঙ্গ বাঁকিয়া গিয়াছিল। ধাত্রী বলিয়াছিল তাহাদিগকে ভূতে পাইয়াছে!

উল্লিখিত কুসংস্কারের 'ঢেউ' কোন বিজ্ঞ-উৎস থেকে এসেছিল, কৃষ্ণকুমার তা লেখেননি। কিন্তু এটুকু তো ঠিক যে শিক্ষিত, সম্পন্ন, হিন্দু কায়স্থ পরিবারের এই সদস্যরা আর যাই হোক, দারিদ্রের জন্যে নিরুপায় হয়ে এই পথ অবলম্বন করেননি; স্বেচ্ছায়, মঙ্গলকর বিবেচনা করেই তাঁরা ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এমনই তীব্র ওই কুসংস্কারের তেজ। অপর দিকে এটাও নিশ্চিত যে, গ্রামের ওই মাইঠাল ও মুসলমানেরা নিছক দারিদ্রের চাপেই এই কাজ করত। এ ছাড়া জীবিকা অর্জনের আর কোনো উপায় তাদের সামনে ছিল না। তার মানে কিছু মানুষের অসীম দারিদ্র আর কিছু মানুষের অপবৈজ্ঞানিক অন্ধবিশ্বাস মিলে একটা নোংরা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বিপজ্জনক পদ্ধতিকে চালু রেখেছিল। এই চিত্র মনকে ভারী করে তোলে।

অন্য একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। বিশ শতকের চল্লিশের দশকের আগে ঠান্ডা লেগে নিউমোনিয়া হয়ে প্রচুর লোকের মৃত্যু হত। নানারকম টোটকায় কাজ না হলে, মাজারের জলপড়া, কালীবাড়ির চন্নামেত্তর, সব কিছুরই ডাক পড়ত। কিন্তু ফল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হত মৃত্যু। তার মানে, কারণ আর কার্যের মধ্যে সঙ্গতি ছিল না, কোন কারণে কী ঘটছে তা জানা ছিল না। তার পর যখন নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে লেবরেটরিতে এবং বাস্তবে পরীক্ষা করে দেখা গেল, নিউমোককাস নামক ঘাতক-ব্যাসিলাসটি পেনিসিলিনে বধ্য; যখন এও জানা গেল, ঠিক কোন মাত্রায় সেবন করলে পেনিসিলিন নিউমোককাস-বধে পারঙ্গম হয়ে ওঠে; তখন কিন্তু

নিউমোনিয়া রোগের চিকিৎসার কার্য-কারণ পরিষ্কার হয়ে গেল। তখন মানুষ আর অসহায় রইল না, জলপড়া কিংবা চন্নামেত্তরের ওপর ভরসা না করে পেনিসিলিন ইন্‌জেক্‌শন নিল। তখন সে নিউমোনিয়ার সাপেক্ষে স্বাধীন হল।

প্রথম অবস্থাটিকে, জলপড়া-চন্নামেত্তরের দশাটিকে আমরা বলছি কুসংস্কার; দ্বিতীয়টিকে, অর্থাৎ পেনিসিলিন প্রয়োগের দশাটিকে বলছি স্বাধীনতা। কুসংস্কার মানে হল কার্য-কারণ না বুঝে বা ভুল বুঝে, অবশ্যম্ভাবিতার নিয়ম না বুঝে অন্ধভাবে কাজ করা, অন্যের ক্রীড়নক হওয়া। স্বাধীনতা মানে হল কার্য-কারণের নিয়ম বুঝে, অবশ্যম্ভাবিতার নিয়ম বুঝে সেই অনুযায়ী নিজের ইচ্ছেয় কাজ করা।

রশিদ ভাইয়ের মৃত্যু ও হামিদা বিবির আরোগ্য

এবার আর এক ধাপ এগোই। ধরা যাক বিশ শতকের আশির দশকের কথা। প্রচণ্ড ঠান্ডা লেগে নার্সিং হোমে ভর্তি হলেন রশিদভাই। ঠিক ডোজে পেনিসিলিন দেওয়া হল তাঁকে। কিন্তু বাঁচানো গেল না। পেনিসিলিন ব্যর্থ হল। তরুণ একজন ডাক্তার বললেন, আজকাল আর পেনিসিলিন তেমন কাজ করে না, ওর বদলে অন্য কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দিলে কাজ হত।

ঘটনাটা কী ঘটল? রশিদভাইয়ের দেহের নিউমোককাসকে কেন মারতে পারল না পেনিসিলিন? কার্য-কারণ সম্পর্কের ব্যত্যয় ঘটল কি? বিজ্ঞান কি ভুল প্রমাণিত হল? তদন্ত করে দেখা গেল এর আগে রশিদভাইয়ের একবার গলায় খুব ব্যথা হয়েছিল, পাড়ার বিউটি মেডিকেল মার্ট-এর তপনদার পরামর্শে তিনি দুদিন পেনিসিলিন ট্যাবলেট খেয়েছিলেন। ব্যস, গলা ব্যথা খতম। আর খাননি ওষুধ। এবার যখন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলেন, ততদিনে নিউমোককাস্‌রা পেনিসিলিনকে চিনে ফেলেছে, সে দেহে ঢোকা মাত্রই গেরিলা কায়দায় তাকে কাবু করবার মালমশলা তৈরি করে রেখেছে। এটাও ওই একই প্রাকৃতিক নিয়ম মেনেই ঘটেছে। মানুষ যেমন প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবিতার নিয়ম মেনে নিউমোককাস মারার জন্য পেনিসিলিন বানিয়েছে, তেমনি নিউমোককাসও ওই নিয়ম মেনেই পেনিসিলিনের হাত থেকে বাঁচবার প্রস্তুতি নিয়েছে। এই লড়াইয়ে নিউমোককাস জিতে গেছে, পেনিসিলিন হেরে গেছে। রশিদভাই জানতেন না, অল্প পরিমাণে পেনিসিলিন ট্যাবলেট খেয়ে, অর্থাৎ পুরো ডোজটা না খেয়ে তিনি আসলে নিউমোককাসদের পেনিসিলিন-নিরোধী টিকা বানাতে সাহায্য করেছিলেন। এও এক ধরনের অপবিজ্ঞান, যার ধারক ও বাহক বিউটি মেডিকেল মার্টের তপনদার মতো লোকেরা। এও এক ধরনের কুসংস্কার, নতুন কুসংস্কার। এও কার্য-কারণ সম্পর্ক না বুঝেই ট্যাবলেট গেলে। গলার ব্যথায়, ফ্যারিন্‌জাইটিস-এ পেনিসিলিন কাজ করেছে বলে

কোমরের ব্যথাতেও পেনিসিলিন খেতে চায় (এটা আমার একেবারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা)। সুতরাং রশিদভাইয়ের মৃত্যুতে কার্য-কারণ সম্পর্কের ব্যত্যয় ঘটেনি, রশিদভাইই আসলে লেখাপড়া-জানা মানুষ হয়েও কুসংস্কারের বশবর্তী হয়েছিলেন— যেমন তেমন ডোজে অ্যান্টিবায়োটিক খেলে সেটা যে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায়, সেই নিয়ম হয় তিনি জানতেন না, না হয় তাকে অস্বীকার করেছিলেন।

এটা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু পাশের বাড়ির নিরক্ষর হামিদা বিবি যে দিব্যি বেঁচে ফিরলেন, তার কী ব্যাখ্যা? তাঁরও তো যায় যায় অবস্থা হয়েছিল, কিন্তু বিলিতি ওষুধ না খেয়ে জ্বর, বুকে ব্যথা আর কাশির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে পীর সাহেবের মাজার থেকে জলপড়া, মাদুলি নিয়ে এসেছিলেন। তিনি প্রচণ্ড ভুগলেন বটে, কিন্তু প্রাণে বেঁচে গেলেন। 'আংরেজি দাওয়াই'-এর বদলে মন্ত্রঃপূত জলপড়ায় কাজ হওয়ায় মৌলবি সাহেবের সে কী আনন্দ! আধুনিক নিয়তিওয়ালারাও আনন্দে হাততালি দিল। রাখে আল্লা মারে কে। কিন্তু ওঁরা জানেন না, শরীরের সাদা রক্তকোষগুলোর কাজই হল বহিরাগত শত্রু নিধন করা। শত্রু যদি কম জাঁদরেল হয়, আর সাদা রক্তকোষগুলো যদি যথেষ্ট তাগড়াই থাকে, তা হলে শরীরের নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থাই অসুখ সারাতে পারে। অধিকাংশ অসুখ তো সেইভাবেই সারে। প্রকৃতি সেইভাবেই বানিয়েছে আমাদের। হামিদা বিবির ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল, তাঁর শরীরের সাদা রক্তকোষগুলো যথেষ্ট তাগড়াই ছিল। তার মানে, এখানেও অবশ্যম্ভাবিতার নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী যা ঘটার তাই ঘটেছে। কেবল আধুনিক অদৃষ্টবাদীদের মতো যারা ধান্দাবাজ, কিংবা ওই মৌলবির মতো যারা প্রকৃতির নিয়মের ক্রিয়া সম্বন্ধে অজ্ঞ, অথবা দুটোই, তারাই কেবল বলবে যে এতদ্বারা বিজ্ঞান পরাজিত হইল।

মাদার টেরিজার অলৌকিক রোগ নিরাময় কৃতিত্ব নিয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি,[৮] তা নিয়ে এখানে আর বাক্যব্যয় করব না। শুধু মাদারের সঙ্গে কায়েমি স্বার্থের লোকেদের দহরম মহরমের কথাটা মনে করিয়ে দেব।

উপসংহার

বেশ ছড়িয়ে-যাওয়া আলোচনাটাকে এবার গুটিয়ে নেওয়া দরকার। কী দেখলাম আমরা এতক্ষণ? প্রথমত, প্রকৃতির পূর্বকারণ-নিয়ন্ত্রিত অবশ্যম্ভাবিতার নিয়মকে মেনে কাজ করতে পারলে তবেই মানুষ স্বয়ংবশ হয়, স্বাধীন হয়। অন্যথায়, সে হয়ে থাকে পরাধীন, অন্যের হাতের ক্রীড়নক। দ্বিতীয়ত, সেই অবশ্যম্ভাবিতার নিয়মগুলোকে খুঁজে বার করাই হল বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক কাজ। তৃতীয়ত, এই বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভাবনাটাকেই আমাদের দেশে একসময় নিয়তি বলা হত। কিন্তু কিছু

অপবিজ্ঞানীদের অপকর্মে সেই সুস্থ ভাবনাটা ক্রমে ঠিক তার বিপরীত অর্থ পরিগ্রহ করেছে। চতুর্থত, এই বিকৃতি আপনাআপনি ঘটে না, এর পেছনে স্থিতাবস্থার পূজারিদের কায়েমি স্বার্থ জড়িয়ে থাকে। পঞ্চমত, এই বিকৃত ভাবনার বশবর্তী হয়ে শিক্ষিত, এবং অন্য দিক থেকে আলোকপ্রাপ্ত অনেক ব্যক্তিও পার্ট-টাইম কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেন ও নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। ষষ্ঠত, আধুনিক বিজ্ঞানকেই বহু ক্ষেত্রে কুসংস্কার সৃষ্টির কাজে লাগানো হচ্ছে। সেখানেও অজ্ঞতা আর স্বার্থান্বেষণ হাত-ধরাধরি করে চলছে।

সুতরাং এই বলে শেষ করতে পারি যে, শুধু বিজ্ঞান চর্চা করে বা বিজ্ঞানের প্রসার ঘটিয়ে কুসংস্কারের মূল কোনোদিনই উচ্ছেদ করা যাবে না। যতদিন না স্থিতাবস্থার পূজারি কায়েমি শয়তানদের স্বার্থের সঙ্গে কুসংস্কার-ব্যবসার যোগসূত্রটাকে ছিন্ন করা যাচ্ছে, যতক্ষণ না মানুষের সার্বিক স্বাধীনতা লাভের প্রক্রিয়ার সঙ্গে এ প্রয়াসকে যুক্ত করা যাচ্ছে, ততদিন এর হাত থেকে মুক্তি নেই।

নির্ঘণ্ট

আর ও গা ঙ চি ল

প্র ব ন্ধ

এতদিন ডাকে না-ফেলা চিঠি অশোক মিত্র ২০
অন্ধের স্পর্শের মতো শঙ্খ ঘোষ ২০
নির্বাচিত ধ্রুবপদ-১ সম্পাদনা সুধীর চক্রবর্তী ৫০০
The Rights and Wrongs of it: The Right to Information
Ed Bhabesh Das & Rajiv K Bhattacharyya 700/
তথ্যের অধিকার সম্পাদনা ভবেশ দাশ ৩০০
সম্প্রচারের ভাষা ও ভঙ্গি সম্পাদনা ভবেশ দাশ ৪০০
সংস্কৃতি, কী আছে তোমার পেটিকায় হাসান আজিজুল হক ১০০
কলিযুগ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী ২৫০
বাংলা শিশুসাহিত্যের ছোটো মেয়েরা শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৫
আদরের উপবাস রবীন্দ্রনাথ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫০
টাড পাহাড়ের পদাবলি মিহির সেনগুপ্ত ১৫০
শূদ্র জাগরণ গৌতম রায় ১০০
সিপাহি বিদ্রোহের ইংরেজ কবিয়াল গৌতম রায় ২০
চলমান যৌনকর্মী (১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড) সুবোধ দাস ২০০
অনন্তের অ্যানাটমি স্বাতী ভট্টাচার্য ২০০
বিবি থেকে বেগম বাঙালি মুসলমান নারীর
ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আকিমুন রহমান ১৭০
নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ এক বিতর্কিত সম্পর্কের উন্মোচন দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত ১৫০

অ ভি ধা ন

অভি-ধানাই-পানাই হিমানীশ গোস্বামী ১৫০
আহাম্মকের অভিধান গুস্তাভ ফ্লবের, অনুবাদ চিন্ময় গুহ ১২৫
চলিত ইসলামি শব্দকোষ মিলন দত্ত ১৭৫

উ প ন্যা স

মৌসুমি সমুদ্রের উপকূল অভিজিৎ সেন ২০০
জন্মের মাটি শান্তা সেন ১৫০
আঠারো কাঠার বাড়ি আকিমুন রহমান ২০০
রক্ত পুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি আকিমুন রহমান ২০০
ছায়া পুতুলের খেলা রবিশংকর বল ১৭৫

গ ল্প

আশমানি কথা উচ্ছেদের ৫ কহন রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৫
ও কমরেড এক যুগ তেরো গল্প শৈলেন সরকার ১০০
তাহাদের কথা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজ ও
জীবনের গল্প সম্পাদনা মিলন দত্ত ১০০

স্মৃ তি চি ত্র ণ

জীবন যেখানে যৌবন শানু লাহিড়ী ১৫০
দয়াময়ীর কথা সুনন্দা সিকদার ১২৫
তুই নিষিদ্ধ, তুই কথা কইস না তসলিমা নাসরিন ১৫০
উৎস থেকে মোহনা পারুল বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৫
আমরা তো এখন ইন্ডিয়ায় অধীর বিশ্বাস ৭৫
পুণা-গঙ্গার কাছাকাছি
দেশহারা মানুষের বেদনাদীর্ণ পিছু ফিরে দেখা অধীর বিশ্বাস ৭৫
গৈ-গেরামের পাঁচালি আনসারউদ্দিন ১৫০
ঘটিপুরুষ বিশ্বজিৎ রায় ১০০

ক বি তা

Departure: The last poems of Shakti Chattopadhyay
Translated by Shankarlal Bhattacharya 120/-
শো-কেসের ফুলবাবু প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় ৬০
আমার অন্তুই কথা সুজিত সরকার ৬০
কেবিনম্যানের চিঠি মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় ৬০
চারণকন্যা রণজিৎ চক্রবর্তী ৬০
নষ্ট স্বপ্ন কমলেন্দু সরকার (সুব্রত চৌধুরীর পেন্টিংসহ) ১০০